দ্বিতীয় অধ্যায়
কালকূট নামে রচিত উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন লেখক আত্মানুসন্ধান বলতে কী বলতে চেয়েছেন? কীসের খোঁজে তাঁর পথ চলা? প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যেই তিনি বার বার ঘুরে ফিরে কিছু একই কথা বলেছেন, কী সেই কথা? কালকূট ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা সর্বমোট চল্লিশটি যেখানে আমরা তাঁর স্বনামে লেখা উপন্যাসগুলি থেকে এক ভিন্ন গদ্যশৈলী এবং পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। এক ভ্রমণ পিয়াসী লেখক যিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে বাইরের এক তীব্র হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে কোনরকমের তত্ত্ব-তথ্য-জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে কিসের এই খোঁজ। 'কালকূটের চোখে সমরেশ' এই গ্রন্থ থেকেই আমরা জানতে পারি শৈশব থেকেই ছোট সুরথনাথের মধ্যে ছিল বাইরের প্রকৃতির দিকে টান। পারিবারিক শাসনের ভ্রূকুটিকে যথাসম্ভব উপেক্ষা করে মাঝে মধ্যেই চলতো তাঁর মুক্তির বিচরণ। শৈশবে এক বৈষ্ণব বাবাজীর নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানোর গল্প তাঁকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যেতো ঘরের বাইরে। প্রাণের ব্যাকুলতায় সেই সুদূরের আহ্বান সেই ছোট থেকেই। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতিথি' গল্পের তারাপদের মতো তাঁরও দু'চোখ ভরা ছিল শুধু রূপের তৃষ্ণা, দু-চোখ ভরা অথৈ বুড়িগঙ্গার রূপ। নিষিদ্ধ অভিযানে কী এক অচিন আনন্দ বুড়িগঙ্গার বুকে ভেসে যেতে কিম্বা কখনো দূর-সুদূরের হাটে বাজারে হারিয়ে যেতে। তবে সেই অরূপের নাম কী। বিভিন্ন লেখার শুরুতেই তিনি তাঁর বেরিয়ে পড়ার কারণ স্বরূপ জানান, চেনা পরিসরে গণ্ডিবদ্ধ জীবনের ভেতর থেকে যখন মনটা হাঁসফাঁস করে ওঠে তখন একটু মুক্তির নিঃশ্বাস পেতেই তাঁর এই ভ্রমণ। জীবনের যত দুঃখ, দৈন্য গ্লানি থেকে প্রাণের ব্যাকুলতাকে, শান্তি দিতেই যেন তাঁর বেরিয়ে পড়া। আমরা দেখতে পাই সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই অস্থিরতার জন্য অনেক সময় তাঁর পরিবারের কাছ থেকেও তিনি অবহেলা বা অযত্ন পেয়েছেন। লেখাপড়ার থেকে তাঁর গান-বাজনা-আঁকা-থিয়েটারের প্রতি মনোযোগ ছিল বেশি, তাই বাবা মোহিনীমোহন

ও বড়দা মন্মথনাথ তাঁর ওপর ক্ষুন্ন ছিলেন। ফলে পরবর্তী কালে নৈহাটিতে সমরেশ থিয়েটার করার সময় ম্যালেরিয়া ও জণ্ডিসে আক্রান্ত হলে, লেখাপড়া না করা ভাইয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বড়দা তখন সমরেশের দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নি। ফলে এই দিক দিয়ে দেখলে তাঁর মনে কোথাও একটা বিরুদ্ধ অভিমানের জায়গা তৈরি হয়। এরপর দেখা যায় খুব কম বয়সে তাঁর থেকে বয়সে বড় এক যুবতীকে বিয়ে করার জন্য সংসার ও পরিবার থেকে বেরিয়ে একেবারে আলাদা ভাবে সংসার পাততে হয়। যেখান থেকে শুরু হয় তাঁর জীবন সংগ্রাম। জীবনে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন না, কখনো দারিদ্রের কারণে পোলট্রি ফার্মের ডিম বিক্রি করছেন কখনো কোয়ার্টারে মেম সাহেবদের পোর্ট্রেট এঁকে পয়সা রোজগার করছেন। তবু আতপুরের বস্তিতে জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছিল। এই সময় ১৯৪২ সালে সমরেশ পরিচিত হলেন জগদ্দলের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সত্য প্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে। সত্য মাস্টারের প্রেরণায় তিনি যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তিনি ছিলেন পার্টির সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি পেয়েছিলেন পার্টির সদস্য পদ। ১৯৪২-এর শুরুতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি। এই সময় কমিউনিস্ট আদর্শের কথা সত্য মাস্টারই বুঝিয়েছিলেন, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সত্য মাস্টার ছিলেন আতপুর জগদ্দলের শ্রমিক প্রধান অঞ্চলের শ্রমিক নেতা। তাঁর প্রেরণায় সমরেশও শ্রমিক ফ্রন্টের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। যে পার্টি সেলে তিনি নিযুক্ত ছিলেন সেখানে ছিল বাঙালি, অবাঙালি নির্বিশেষে নারী-পুরুষ কর্মী। তাঁর স্ত্রী গৌরীও এই পার্টি সেলের সদস্য ছিলেন। দেখা যায় এই পার্টির সঙ্গে সংযোগ, পার্টির পোস্টার লিখে দেওয়া, সেই সূত্রে একটু সম্মানজনক পরিচিতি আর লেখালেখির জন্যও বুদ্ধিজীবী মহলে একটু একটু নামডাক তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মানসিক শান্তি দিচ্ছিল। নানান কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে ক্ষোভ বা হতাশা ছিল তা যেন ভিত পেয়ে নরম হচ্ছিল। কিন্তু আবার যেন তাঁর জীবনে নেমে এলো প্রতিকূল বিপর্যয়ের ঢেউ। সাতচল্লিশের পটভূমিকায় দেশে নেমে আসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। তার আগে ১৯৪৬-এ দেশের উত্তপ্ত এবং জটিল পরিস্থিতিতে লেখেন 'আদাব'। যা থেকে সাহিত্যের পাঠক মহলে সমরেশ বসু নামক এক শক্তিশালী লেখকের সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির নকশা ঘরে বসে প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' লেখেন। তিনি সবেমাত্র সাহিত্যের আসরের দরজায় দূর থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন এবং নিজেকে তৈরি করছিলেন নানা

বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তিনি ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করলেও তাঁর পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিটি ছিল জুট ফ্রন্টে। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিবর্তন এসেছে। পি.সি. যোশীর জায়গায় এসেছেন রনদিভে। রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে। আগেকার জন দরদী নেতাদের সরিয়ে নূতন জঙ্গী নেতারা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস না করলেও তাঁকে পার্টির নির্দেশে ধর্মঘট মানতে কারখানার সামনে হাতে বোমা নিয়ে যেতে হয়। আসলে সেই সময় পার্টির মধ্যে গড়ে উঠছিল পার্টির শত্রু। তেমনি এক ধূর্ত নেতার চক্রান্তে প্রাণ যায় জনদরদী নেতা সত্য দাশগপ্তের। ধীরে ধীরে সমরেশ পার্টি লাইন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীও তাঁর কথা মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে ঘরে এবং বাইরে এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৯ সালে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। পার্টির নেতাদের ষড়যন্ত্রে তাঁকে জেলে যেতে হয়। লক আপে আরো নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পার্টির আসল চেহারা বেরিয়ে আসছিল। তাই ধীরে ধীরে পার্টির সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ে তাঁর মতভেদ দেখা দেয়। জেলে বসেই তিনি উপলব্ধি করেন কী কারণে সত্য মাস্টারের হত্যা। জেলে তাঁকেও পার্টির নানা সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই সমস্ত কিছু জেনে শুনে একজন সচেতন প্রতিভাধর ব্যক্তির যন্ত্রণা যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। দারিদ্র-পীড়িত সংসারে সবচেয়ে নিকট স্ত্রী গৌরী দেবীর তাঁর প্রতি অবিশ্বাসও কোথাও একটা কষ্টের সৃষ্টি করে। কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী হয়েও পার্টির নেতাদের আচরণে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তা তাঁর যন্ত্রণার মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তখনো পার্টির লাইন মেনে, পার্টির শিক্ষার গুণে উপন্যাস ছোটগল্পে তিনি প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা লিখছেন। উত্তরঙ্গ, বি.টি. রোডের ধারে এই রকম লেখার নিদর্শন। কিন্তু সমরেশের ভেতরের বিক্ষুব্ধ মন যেন কোথাও শান্তি খুঁজে ফিরছিল। যেখানে প্রতিদিনকার গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সমস্ত কল্পনা প্রবণ শিল্পী সাহিত্যেকের মধ্যে এরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সমরেশের মনের ভিতরেও সেই সত্তা বজায় ছিল। এই সময় ১৯৫৪ সালে সারা ভারত জুড়ে চলছিল কুম্ভমেলার প্রস্তুতি, তাঁরও প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই লক্ষ রূপের আরশিতে নিজেকে দেখবার জন্য মন আনচান করে ওঠে। নিজেকে বৈচিত্র্যের আয়নায় যাচাই করতে চান। নিজের যে সীমাবদ্ধ সত্তা প্রাত্যহিকের প্রতিকূলতায় বিবর্ণ, সংসারে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে

যার চলাচল সংকীর্ণ, কবির সেই অন্তর পুরুষ পরিচিত আবেষ্টনীর বাইরে গিয়ে চিনতে চায়। রোমান্টিক কবিদের এই প্যাটার্ন বেশ পরিচিত। মানসী কাব্যের কবিতা লেখার সময় গাজীপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পরিচিত আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। তবে কালকূটের বাহার তাঁর নামে। অন্তরে তাঁর বিষ। এই বিষের সম্ভাব্য কারণ আগে বলেছি। এই সংসার বিষ তাঁর লড়াকু লেখক সত্তাকে চিরদিন এগিয়ে দিয়েছে; আর তাঁর অভিমানী কবি সত্তাকে অমৃত সন্ধানী করে তুলেছে। 'গাহে অচিন পাখি' শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছেন ছদ্মনামের প্রয়োজন হয়, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করার কারণে। সেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ১৯৫২ সালে 'ভোটদর্পণ'-এ যা তিনি লিখেছেন। কিন্তু এই ছদ্মনামের আড়াল থেকে বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর পর রাজনীতি দিয়ে ঘেরা জগৎ থেকে তিনি সরে যাচ্ছিলেন। পার্টি নামক একটা বদ্ধ জলা থেকে তাঁর যতই মুক্তি ঘটছিল ততই বাইরের বৃহৎ বিশ্বের আস্বাদের আগ্রহ বাড়ছিল। লালনের গানের (আমার ঘরের কাছে আরশীনগর এক পড়শী বসত করে) উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর আরশীনগর হচ্ছে এই জগৎ ও জগৎজন আর পড়শী তাঁর ভিতরের আপন সত্তা। বুকের গরলের জ্বালায় অমৃতের খোঁজ—সে আসলে আপনাকে খুঁজে ফেরা। সেই কারণেই কুম্ভমেলায় যাওয়া। একদিকে যেমন অমৃতের আস্বাদে বুকের গরলের জ্বালা মেটাবার ইচ্ছা অন্যদিকে অচিনের হাতছানি। এই অচিনের হাতছানি তাঁর প্রকৃতির মধ্যে প্রোথিত। এই অচিন আনন্দের সন্ধান তাঁর কৈশোর থেকেই। তাঁর নিজের লেখা থেকে একথা জানা যায়। এই অচেনার আনন্দকে খুঁজে বেড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ। 'অচেনার আনন্দ'—কথাটা তাঁরই। একে বলতে পারি রোমান্টিকদের Sense of wonder। কাছে-দূরে, তুচ্ছে ও মহতে সেই অচিনকে তাঁর খোঁজা। এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় শুরু, সে অচিন দূরের; 'কোথায় পাব তারে' লেখায় সে অচিন কাছের, আমাদেরই পরিচিত বেষ্টনীর মধ্যে তার রূপ বিকাশ। এখানকার মাঠে জলে মানুষে সব কিছুতে এক মহোৎসব যেন আসন্ন। একটা পাগলা হাসি, খুশির ডাক যেন কোথায় এখনো ঠেক খেয়ে আছে। আগে বলেছি অচেনার ডাক তিনি শুনেছেন কৈশোর থেকে সেকথা নিজেই বলেছিলেন 'কোথায় পাব তারে' উপন্যাসের প্রথমে বুড়ি গঙ্গায় নৌকো নিয়ে ভেসে যাবার প্রসঙ্গে। আর একটু এগিয়ে এসে এই উপন্যাসেই লিখলেন—''তার ডাক শুনেছি সেই কোন ভোরে।... যখন তাঁর (মায়ের) কোলের কাছে শুয়ে প্রথম চোখ খুলেছিলাম। সেই থেকেই ডাক

শুনেছি, দৌড় দিয়েছি।"[১] সে জন্যেই বলেছি এ ডাক তাঁর প্রকৃতিতে প্রোথিত। সেই টানে দেশকে দেখবেন বলে প্রয়াগে যাত্রা, কিন্তু গিয়ে দেখলেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের সমাগম ঘটেছে। পশ্চিমের গোরা থেকে নাগা, সন্ন্যাসীর দল। চারিদিকে কী অপূর্ব দৃশ্য নানা ভাষা, নানা রূপ বৈচিত্র্যের বর্ণময় মানুষের ভিড়। সবাই চলেছে অমৃতের টানে, সমস্ত ক্লান্তি ভুলে। চেনা পরিসরে যে মানুষের এক রূপ দেখে তেমন মনে ধরে না, তা অন্য এক অচেনা জায়গায় অন্য রূপে মনকে ছুঁয়ে যায়। কী এক অনির্বচনীয় আনন্দ মনের সমস্ত পাষাণ ভার নামিয়ে দেয়। তিনি জেনেছেন দুঃখ চিরন্তন জেনেও মানুষ সর্বদাই সুখসন্ধানী। তাই দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষ কীভাবে প্রতিনিয়ত অমৃতের সন্ধানে ছুটছে তার পরিচয় অনুসন্ধানই কালকূটের অন্যতম অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। যা আমরা তাঁর প্রথম রচনা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' থেকে শুরু করে শেষ দিকের 'শাম্ব'-এর মধ্যেও খুঁজে পাই। দুঃখময় জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে কালকূট বিচিত্র মানুষের অমৃতকামী প্রত্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কালকূট মনে করেন মানুষ তার নিজের কাছেই অনেকখানি অপরিচিত থাকে। তাই নিজেকে চেনাও একটা আবিষ্কারের বিষয়। বলা চলে মানুষ তার নিজেকে যত বেশি চিনতে পারে তত বেশি চিনতে পারে অন্যকেও। যখন বাইরের অচেনা প্রকৃতিতে মনোময় মানুষ তাঁর সহানুভূতির স্পর্শে আত্ম উন্মোচন করতে থাকে তখন অন্যদিকে তাঁরও যেন আত্ম আবিষ্কারের পালা চলতে থাকে। নিজের ভেতরের জমে থাকা অন্ধকার, অসহায়তাকে ভুলতে থাকেন প্রকৃতি, মেলা, জনপদ ইত্যাদি নানা স্থানের বিচিত্র মানুষের মহানুভবতার কাছে। প্রাণের বিষ থেকে মুক্তির জন্য তিনি মহামানবের বিচিত্র জীবনের মধ্যে নেমে তাদের সুখ-দুঃখ দেখে তাদের প্রবহমান জীবনের গতি বা পরম্পরা থেকে যেন দুঃখ ভোলার বা নিজেকে শান্ত করার রসদ খুঁজে পান। অন্তরের বিষকে অমৃতে পরিণত করতে চান। ভারতের বৈচিত্র্যের ঘাটে ঘাটে নানা রূপের মধ্যে ঘটতে থাকে তাঁর আত্মদর্শন চলতে থাকে নিজেকে খোঁজা ও অন্যকে চেনার প্রতিনিয়ত পালা। সুদূর অলক্ষ্যের সেই হাতছানি তাঁকে সবসময় ব্যাকুল করে। তাই অধরার প্রতি তাঁর ভিতরের অতৃপ্ত মনের আবেগ, উচ্ছ্বাসের কোনদিন শেষ হয়না। এই রূপের সন্ধানই হলো তাঁর আত্মানুসন্ধান।

কালকূটের উপন্যাসগুলির মধ্যে ভ্রমণ সাহিত্যের এক সুস্পষ্ট কাঠামো পাওয়া যায়। যদিও তা ছকে বাঁধা ভ্রমণ উপন্যাসগুলি থেকে ভিন্ন মাত্রার। ভ্রমণ তাঁর কাহিনির শেষ কথা নয়, বরং বিচিত্র মানুষের সন্ধান, তার অন্তর্জগতের রূপটিকে অন্বেষণ তার বাইরের জগতের বাহ্যিক পরিচয়ের ভিতর থেকে অন্তর্মনের উদ্ভাষণ এ সবই কালকূটের লক্ষ্য। যৌবনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রে রিপোর্ট লেখার জন্য এবং বিশেষত চুয়ান্নর শুরুতে চোখের সামনে সমগ্র দেশের মানুষকে একসঙ্গে দেখার বিরল সৌভাগ্য লাভের আশায় সেই যে তিনি কাঁধে ঝোলা নিয়ে প্রয়াগের কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, তারপর আর সেই পথ চলা শেষ হয়নি। বাস্তবতা মন্থনকারী সমরেশের কাছে এ যেন এক অন্য অভিজ্ঞতা। সমগ্র দৃষ্টি জুড়ে ভারত দর্শনের মহিমান্বিত রূপ ফুটে ওঠে।

কালকূটের বিভিন্ন রচনাতে তারই পদচিহ্ন ধরা আছে। শুধুমাত্র চরিত্রাঙ্কনের কারণেই উপন্যাসগুলি মূল্য পেয়েছে এমনটা বলা যায় না। প্রকৃতি পরিবেশের মুগ্ধতায় এবং চলমান জীবনের সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলির মুখরতায় শিল্পীর ব্যক্তিক আশ্বাসের সুগন্ধ রয়েছে উপন্যাসগুলির ছত্রে ছত্রে—যা থেকে আমরা তাঁর অনুসন্ধিৎসু পর্যটক মূর্তিকে অনায়াসে অবিষ্কার করতে পারি। সেই বিচিত্র রূপের নেশা তাঁকে যেন প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় বিশাল সংসারের আরেক রূপের কাছে। ছোট সংসারের প্রাত্যহিকতা যখন বুকের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে তোলে, তখন বিশাল সংসারের বুকে হাত বাড়িয়ে গণ্ডুষ ভরে তৃষ্ণা মেটান। সেই হিসাবে তিনি পথের ডাকে ঘর-বিবাগী বৈরাগী নন, বরং বিশাল জীবনের অঙ্গনে নেমে আরও গভীরভাবে জীবনকে জানা, তার সঙ্গে আর একরকম ভাবে নিজেকেই খুঁজে ফেরা। সব সৃজনশীল মানুষই কোনো না কোনো ভাবে নিজেকে খোঁজেন, সমরেশের খোঁজ বহু মানুষের মধ্যে, বহুরূপের মধ্যে। এ খোঁজ কোনো বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত সচেতন কর্ম নয়, অনুভূতি চালিত জীবনধর্ম বিশেষ। প্রধানত লোক সমাগমের কেন্দ্রগুলিতেই তিনি বহুরূপের সন্ধানে গিয়েছেন আর বহুরূপের ভিতরেই একরূপের অনুভব পেতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে কালকূটকে পদব্রজে বা নৌকাযোগে, বাস বা ট্রেনযোগে কিংবা বিমানযোগে কাটাতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারি সফর যেমন তাঁর ভ্রমণ তালিকায় উঠে এসেছে, তেমনি যে ভারতের পূর্বাঞ্চল-উত্তরাঞ্চল এমনকি এর বাইরে বিভিন্ন স্থানের মেলাও তিনি দেখেছেন।

লোকউৎসবের বহু-জন সমাগমের মধ্যে কালকূট মানবজীবন নিরীক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এখানে কালকূটের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের একটা তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। যথা—

(ক) মেলা ও তীর্থ পরিক্রমা :

বাউলমনের অনুরাগী লেখক কালকূটের রসিক মানুষ সন্ধানের একটা ভালো জায়গা হল মেলা। বিশেষ করে যে সব ঐতিহ্যাশ্রয়ী মেলায় বিভিন্ন বাউল-ফকির-সহজিয়াদের আনাগোনা কালকূট সেখানেই পৌঁছে যান। তাঁর কৌতূহলী মনের বিভিন্ন প্রশ্ন সাধকদের কাছে অতি সন্তর্পণে সমর্পণ করে, ধীরে ধীরে সাধনার গূঢ় রহস্যকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছেন। যা তিনি সহজ ও সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

বহু মানুষের মিলনস্থল হলো মেলা। পৌরাণিক আখ্যান কিম্বা ঐতিহাসিক ভিত্তি বা প্রকৃত কোন সাধককে কেন্দ্র করে যে লোকবিশ্বাস গড়ে ওঠে, তারই জনশ্রুতিতে গড়ে ওঠে মেলা বা তীর্থক্ষেত্র। প্রাচীন মেলাগুলি নানা কিংবদন্তিতে সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষ আত্মিক মুক্তির তাগিদে ঘুরে বেড়ায়। মানুষকে তার অন্তরের প্রেরণাই তীর্থাভিমুখী করে তোলে। বিশ্বাসী মানুষের কাছে তীর্থের মহিমাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লেখক কালকূট বিভিন্ন তীর্থ ও মেলাক্ষেত্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে গ্রন্থিত করেছেন। নাগরিক চেতনার ছায়া পড়তে দেননি এই সমস্ত স্থানে। অত্যন্ত সচেতনভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনচর্চাকে তিনি লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর আগে ঠিক এরকম লেখা পাওয়া যায় না। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে কালকূট এই বিষয়ের পথিকৃৎ। এই সমস্ত গৌণ বা অখ্যাত সম্প্রদায়গুলি এবং তাদের সমবেত মিলন উৎসবগুলি বহুকাল গবেষকদের কাছে নীরস চর্চার বিষয় ছিল, কালকূট প্রথম যাকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কালকূটের বক্তব্য স্পষ্ট যে, তাঁর ভ্রমণ—'মানুষকে জানবার জন্য', নিজেকে জানবার জন্য, দেশকে জানবার জন্য। কালকূটের তীর্থ ও মেলা ভ্রমণ সম্পর্কে আমরা একমত হতে পারি যে, তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার আবেগ কিম্বা তীর্থ মেলা ভ্রমণের হুজুগ কোনটিই কালকূটের তীর্থদর্শনের মূল প্রেরণা নয়। তিনি বোধহয় এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে তিনি খুঁজে পেতে চান কোন অনির্বচনীয় সত্তাকে। 'স্বদেশ-আত্মা' যার নাম। স্বদেশকে

চেনার উদ্দেশ্যেই তাই বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মেলা বা তীর্থ প্রাঙ্গণে তাঁর ভ্রমণ। অতি-তুচ্ছ সাধারণ ব্যক্তিও তাঁর মনযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। যেন সমাজের প্রতিটি স্তরের ভিতর দিয়ে তিনি চিনতে চেয়েছেন তাঁর স্বভূমি, স্বকালকে।

কালকূটের ভ্রমণের প্রায় অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে তীর্থ বা মেলা পরিক্রমা। যেমন—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (প্রয়াগের কুম্ভমেলা, ১৯৫৪), 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষ' (কেন্দুবিল্ব গ্রামের জয়দেব মেলা, ১৯৬০), 'কোথায় পাব তারে' (শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, মলুটি বা মৌলীক্ষার কালীপূজা, নানূর, বক্রেশ্বর, কাটোয়ার অট্টহাস মন্দির, নবদ্বীপের ধূলট উৎসব, বর্ধমানের কুলীনগ্রামের মেলা, নৌগ্রামে জলেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা, কেঁদুলির জয়দেব মেলা, হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলা, ১৯৬৮), 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' (কামরূপ কামাখ্যা, ১৯৭৫), 'ঘরের কাছে আরশিনগর' (কুলীনগ্রাম, মানধর মেলা, ১৯৭৯), 'চলো মন রূপনগরে' (আঁটি শেওড়া, জামালপুরের বুড়োরাজ মেলা, ১৯৮১), 'কোথায় সে জন আছে' (কল্যাণী ঘোষপাড়ার দোলমেলা, ১৯৮৩), 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' (সোনপুরের হরিহরছত্রের মেলা, ১৯৮৭), 'যে খোঁজে আপন ঘরে' (বীরভূমের মন্তলাগ্রামে বুংকেশর ভৈরবের মেলা, কেঁদুলির জয়দেব মেলা, বেলুরিয়া, ১৯৮৭), এবং 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' (হরিদ্বারের কুম্ভ মেলা, ১৯৮৮) নামক উপন্যাসগুলিতে এর বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' (বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার জনক পুরে রাম সীতার, ১৯৭১) মেলা ও মন্দির দেখে কালকূট এই গ্রন্থটি লেখেন।

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে (১৯৫৪) :

কালকূট রচিত 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বাঙলা ১৩৬১ সালের কার্তিক মাসে (ইংরেজি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' থেকে প্রকাশিত হয়। 'দেশ' পত্রিকায় কালকূট ছদ্মনামে এই লেখাটিই প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থটি বিপুল জনসমাদর লাভ করে। বিশেষ উল্লেখ্য যে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নামক এই গ্রন্থটির চিত্রস্বত্ব প্রথমে নেওয়ার কথা ছিল বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিত রায়ের। কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে, বোম্বের পরিচালক বিমল রায় হিন্দী, বাংলা—দুটোরই চিত্রস্বত্ব কালকূটের কাছ থেকে কিনে নেন। প্রকাশকের মুদ্রণ তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতি বছর বইটির দুটি করে সংস্করণ হয়েছে। দ্বিতীয় মুদ্রণে কালকূট মূল রচনার প্রারম্ভে 'বিচিত্র'

নামে একটি সংযোজনী লিখেছিলেন। নানা কারণে 'বিচিত্র' লেখাটি উল্লেখযোগ্য।

> ''অনেক বিচিত্রের মধ্যে মানুষের চেয়ে বিচিত্র তো আর কিছু কোনদিন দেখিনি। সে বিচিত্রের মাঝেই আমার অপরূপের দর্শন ঘটেছে। ভেবেছিলাম, একদিন মানুষ ছাড়িয়ে, অন্য কোনখানে আমার সেই অপরূপের দেখা পাব। ..। যখন কোনো নিঃশব্দ নিরালা মুহূর্তে, বিস্ময়ে বেদনায় আনন্দে লক্ষ করেছি, এক প্রসন্নময়ের আবির্ভাব ঘটেছে আমার চোখের সামনে, তখনই অবাক হয়ে দেখেছি, সে আর কেউ নয়, মানুষ! তাকে ছাড়িয়ে কোনো অপরূপের দর্শন আমার ঘটল না। তাই আমার সব নমস্কার মিলিয়ে এক নমস্কার নিয়ে ফিরেছি বারংবার তারই দরজায়।'' [২]

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট মেলার দুর্ঘটনায় নিহিত মানুষগুলির উদ্দেশ্যে— অনেক আশা নিয়ে যারা গিয়েছিল আর কোনো আশা নিয়ে কোনোদিন ফিরে আসবে না তাদের উদ্দেশ্যে—'

লেখক কালকূট কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন চুয়ান্নর শুরুতে। মাঘ মাসে। কুম্ভমেলা থেকে ফিরে এসে তাঁর মুগ্ধ ও বিস্ময়কর সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃতভাবে লেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি দেশ পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন। সাগরময় ঘোষকে বলেন যদি তাঁর বিষবাহী প্রাণের অমৃত-সন্ধানের কথা 'দেশ' পত্রিকায় একটু বিস্তৃত করে লেখার অনুমতি দেন। 'দেশ' পত্রিকার সর্বেসর্বা কানাইলাল সরকারের সমর্থন নিয়ে লেখা শুরু করেন। এই লেখা থেকেই কালকূট তাঁর নামের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পেয়েছেন। লিখতে থাকেন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নামক বিখ্যাত উপন্যাসটি। এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় পৌঁছে কেল্লার চূড়ো দেখেই লেখক রোমাঞ্চিত, তিনি অনুসন্ধান করলেন কোথায় ছিল বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম? কেমন ছিল ত্রিবেণীসঙ্গমের প্রকৃত রূপ? প্রয়াগের সঙ্গমভূমিতে সারা ভারতের দর্শন পেয়ে রূপশিল্পী কালকূট এককথায় আপ্লুত হয়ে পড়েন। কুম্ভের মেলাপ্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধর্ম, বিচিত্র বেশ, ভাষা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেন দুঃখে, বেদনায়, হাসিতে অশ্রুতে মানুষ সবাই এক। কুম্ভমেলার পুরাণ আর ইতিহাসের স্মৃতির সঙ্গে সারা ভারতের মানুষ তখন নিজেদের

স্বাতন্ত্র্য নিয়েও একাকার। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর অনেক মানুষের অনেক চিঠি লেখক পেয়েছেন। কেউ 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায়, কেউ প্রকাশকের ঠিকানায়। জনে জনে জবাব দেওয়া লেখকের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই দ্বিতীয় মুদ্রণে কালকূট মূল রচনার প্রারম্ভে 'বিচিত্র' নামে এক সংযোজনী লিখেছিলেন। ফলে নানা কারণে 'বিচিত্র' নামক লেখাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে, কোনো এক অখ্যাত গলির বাঁকাচোরা অক্ষরের বিচিত্র প্রশ্নকরা চিঠি থেকে শুরু করে, দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক এবং লক্ষ্ণৌয়ের লেখিকার সনেট, বহু পত্রের জবাবের প্রত্যাশাহীন অভিনন্দনের জন্য লেখক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কালকূটের রচনা সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা, কিছুটা এইরকম— 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' পড়ার পর একজন বৃদ্ধ মানুষ লেখককে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি বৃদ্ধ এবং অন্ধ। তাঁর ভাইপো বইটি পড়ে শুনিয়েছেন। এবং তাকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছেন পত্র। সবচেয়ে যে কথাটি লেখককে নাড়া দেয় 'আমার সব অন্ধত্ব ঘুচে গেল ভাই!' পত্রটি পড়ে লেখকের প্রতিক্রিয়া অন্ধ ব্যক্তিটি যেন তাঁর চেয়েও বেশি চক্ষুষ্মান। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই হলো লেখকের জীবনানুসন্ধানের সবচেয়ে বড় দিক। যে অরূপকে দেখবার জন্য এতো আয়োজন, এত অনুসন্ধান, সে তো নিজের নিজের উপলব্ধির মধ্যেই অবস্থান করছে—এই সত্যটিকেই লেখক শেষপর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন। আর এই আকুলতাটুকু ছিল বলেই না রূপান্ধ মন অবশেষে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। বহুর মাঝে একজনকে আবিষ্কার করেছে। সেই আসল মানুষ, প্রাণের মানুষ।

কালকূট কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন ১৯৫৪-র সূচনায়, তাঁর কথায় 'মাঘ মাসে' অর্থাৎ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। ভ্রমণ কাহিনিটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪। একদিকে তিনি তাঁর টাটকা স্মৃতি অবলম্বনে রচনাটি ক্রমশঃ লিখে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে সমাপ্তি হওয়ার আগেই কুম্ভমেলা থেকে চলে আসার ফলে রচনাটির সমাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। প্রয়াগে পাঁচটি শাহি স্নান ও সাতটি সাধারণ স্নান মিলিয়ে মকর সংক্রান্তিতে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে চলে, কিন্তু সেক্ষেত্রে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনায় মাত্র কয়েকটি স্নানের কথা রয়েছে। তাই তাঁর লেখনীতে কুম্ভমেলার প্রারম্ভটি যেভাবে এসেছে, সমাপ্তি ঠিক ততটা পূর্ণতা পায় নি। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে মেলাকে নিবিড়তা প্রদান তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য তীর্থক্ষেত্র নয়, বরং তীর্থযাত্রী। আর সেদিকেই তাঁর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন অমৃতকুম্ভের সন্ধানে— 'তীর্থ পটে রসচ্ছবি'—তা সে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গেই হোক আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গেই হোক। অন্তরে হলাহল অথচ মনের ভিতর অমৃত পিপাসা নিয়ে লেখক বারে বারে ছুটে যান ঘরের বাইরে। অমৃত আকুতির অবর্ণনীয় ক্রন্দনে কালকূট মেতে ওঠেন মানুষের সঙ্গে মানুষের রঙ্গে। এমনিতরো মানুষগুলির ছবি আঁকার আনন্দই আলাদা। লেখক যে আনন্দে মজেছেন, পাঠককেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। সমরেশ নিজের সাহিত্যে যেমন ভাঙাগড়ার খেলায় মেতেছিলেন, কালকূটের লেখনীকেও তেমনই সক্রিয় করে গড়ে তুলেছিলেন। তবে কালকূটের স্বকীয়তাকে কখনই ভেঙে নতুন করেননি। এই স্বকীয়তার পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় তাঁর 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-র মধ্যে। অমৃতের সন্ধানে বেরিয়ে যাত্রাপথে ক্যানসারাক্রান্ত তীর্থযাত্রীর মৃত্যু দেখে এবং ট্রেনভর্তি পুণ্যার্থীদের পুণ্য সঞ্চয়ের আকুলতা অনুভব করে কালকূটের মনে হয়েছিল সবাই যাওয়ার জন্য পাগলের মত ছট্‌ফট্ করে চলেছে কিন্তু যদি তুমি পড়ে থাক তাহলে অন্যরা তাদের পরমায়ু নিয়ে ছুটে যাবে, এটাই নিয়ম। একটা আধপাগলের মুখে কালকূট শুনেছিলেন যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জল হল, আমাদের দুঃখ আর স্থলটুকু আমাদের সুখ। এর অব্যহিত পরে, কালকূট গভীর জীবনসত্যকে অনুধাবন করে বলেছেন অপার দুঃখকে ভুলে থাকা ছাড়া আর উপায় কী? সামান্য সুখের মুখ দেখলেই আবার আমরা দুঃখ ভুলে যাব। আর একমাত্র এই কারণেই দুঃখ চিরন্তন জেনেও মানুষ সুখসন্ধানী। এই দুঃখের ভেতরে মানুষ কীভাবে অমৃতের সন্ধানে রত, তার পরিচয় অনুসন্ধানেই কালকূটের লেখনী সক্রিয় থেকেছে সব সময়।

সমরেশের কালকূট হলো এক অমৃত সন্ধানী সত্তা। তাঁর যাত্রাও শুরু হয়েছে অমৃত কুম্ভ প্রয়াগ থেকে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম প্রয়াগের কুম্ভমেলায় 'অমৃতকুম্ভ'র কথা বর্তমান। বালিয়া জেলার বাসিন্দা এবং কর্মসূত্রে কলকাতার শহরতলীর কারখানার আঠাশ বছরের কর্মী, ক্যানসারাক্রান্ত মৃতপ্রায় অবস্থায় যে কুম্ভমেলায় যাবার জন্য ট্রেনে উঠেছিল সে কালকূটকে জানিয়েছে—

> ''কেন, তুমি জানো না? ...অসুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে
> দেবতারা তাঁদের অমৃতকুম্ভ প্রয়াগ-সঙ্গমে লুকিয়ে
> রেখেছিলেন? যাত্রি... শুধু শোননি, কেন দুনিয়ার মানুষ

যায় সেখানে? কেন মহাপুরুষ সাধুরা আসেন সেখানে স্নান
করতে? তাঁদের চেহারা দেখ নি, কী সুন্দর! কী তার বাঁধুনি!
কুম্ভযোগে স্নান করলে মানুষ শত বছর পরমায়ু পায়,
রোগমুক্ত হয়।..." [৩]

ধর্মপ্রাণ ভারতীয় চরিত্রের একটি পরিচয় পুণ্যকামী মানুষের বোঝাই ট্রেনের চিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালকূট অনেকের ব্যক্তিমানসের পরিচয়ের মাধ্যমে ধর্মভীরু অখণ্ড ভারতীয় মানসকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। প্রধানত জীবনের মাধুর্য গ্রহণ করতেই যাত্রীদের আগমন ঘটে, লেখকও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই আনন্দ গ্রহণ করেন। কালকূটের দেখার চোখ জনারণ্যে হারিয়ে যায় না কখনো, বরং সেই জনসমুদ্রে ডুব দিয়ে তিনি জনমানসের মণি মুক্তো তুলে আনেন। প্রয়াগের পুণ্য স্থানে প্রথম রাত্রেই কান পেতে শোনেন, অনেকটা নিশি পাওয়া স্বপ্নের ঘোরে, নিরাভরণ ভারত কাঁদতে কাঁদতে বলছে, তার গভীর বিশ্বাসে মাথা নত করে দেওয়া আর্তি—

''বহুত, বহুত পাপ কিয়া ভগবান! হে ঈশ্বর আমার অর্থ
নাও, আমার সোনা নাও, আমার খাওয়া নাও, আমাকে
বিবস্ত্র কর, আমার সব নিয়ে আমাকে মৃত্যু দাও। আমার
এই পাপের প্রাণ আমি তোমার পায়ে দিচ্ছি। গ্রহণ করে
তুমি আমাকে মুক্তি দাও।... হাতে পায়ে খিল ধরে যাবে।
ভাববে মৃত্যুকামনা শুনছি কার? আমি কোথায় এসেছি,
যেখানে মানুষ অসঙ্কোচে প্রকাশ করছে তার পাপ। নিবেদন
করছে প্রাণ।"[৪]

কালকূট বিস্মিত হয়ে পড়েন।

এ যেন শুধু পুণ্যস্নানের পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনা নয়, এতে আছে ত্যাগের স্বীকারোক্তি, আত্মসমর্পণের বোধ। এখানেই লেখক পরিচিত হয়েছেন এক গৃহাবধূত পরিবারের সঙ্গে। যাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব। এক নারীকণ্ঠের গান লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লেখক দেখতে পান গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটি নারী। আলুলায়িত কেশ ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠ জুড়ে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, দেখতে পেলেন আপাদমস্তক আবৃত

এক পুরুষ সেও কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে প্রয়াগস্তোত্র। খানিকক্ষণ পরে আর একটি মেয়ে, একটি বালকের হাত ধরে আবৃত্তিতে যোগ দিল—

''চিরং নিবাসং ন সমীক্ষতে যো
হ্যুদারচিত্তঃ প্রদদাতি চ ক্রমাৎ।
কল্পিতার্থাংশ্চ দদাদি পুংসঃ
স তীর্থ রাজো জয়তি প্রয়াগঃ।''[৫]

ব্রাহ্ম মুহূর্তের এই তন্দ্রাজড়িত চরাচর ব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে সমবেত কণ্ঠের সুর ও ছন্দোময় স্তোত্র বাণী লেখকের চোখের সামনে যেন এক মায়াবী জগতের রূপ তুলে আনে। প্রাচীন ইতিহাসের এই লীলা ভূমি, ধর্মীয় ইতিহাসের এই স্মৃতি ভূমি লেখকের কাছে বিস্ময়ের জগৎকে উদ্ঘাটিত করে। মুগ্ধপ্রাণ লেখককে আচ্ছন্ন করে তোলে। মৌন রাত্রির শেষলগ্নের এই সমবেত সুরলহরীর সঙ্গে যেন সুর মিলিয়েছে নিয়ত প্রবাহিত গঙ্গা। গৃহাবধূত পরিবারের সম্পূর্ণ নিরাবরণ স্নান দেখে লেখকের মনে হয়েছে এই নগ্নতা ঠিক ওই আকাশের মতো উদার। গঙ্গা ও যমুনার মতো লীলায়িত ও দ্বিধামুক্ত এবং অপরূপ।

অনাবৃত দেহে গঙ্গাস্নান পুণ্য লগ্নে, চরাচর ব্যাপী এই মৌন রাত্রির শেষলগ্নের আলো আঁধারিতে ওই নারী ও পুরুষ, যুবতী ও কিশোর আর তাদের মিলিত কণ্ঠের বিচিত্র সুরলহরী লেখকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এই মৌন রাত্রি, আলো আঁধারিতে ওই নারী ও পুরুষ, আর বিচিত্র তাদের মিলিত এই সুরের অঙ্গে সুর মিলিয়েছে নিয়তবাহী গঙ্গা। গৃহাবধূত পরিবারের সম্পূর্ণ নিরাবরণ স্নান দেখে লেখকের মনে হয়েছে এই নগ্নতা আকাশের মতো উদার গঙ্গা ও যমুনার মতো লীলায়িত দ্বিধামুক্ত এবং অপরূপ।

লেখকের মনে হয় হয়তো পথ ভুল করেছেন কিন্তু এ কোন্ যুগে তিনি এসে পরেছেন! ভারতের কোন্ বিগত শতাব্দীতে! বিষের ধোঁয়া নিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ ঘটেছিল। সেই বিষের ফোঁটা কপালে নিয়ে। যখন থেকে দেখতে শিখেছেন, দেখেছেন বিষ ক্ষতে ভরা এই দেশ। নিরন্নর মিছিল, অবিশ্বাস, ভয়, নিষ্ঠুরতা আর হাহাকার। কিন্তু কোন্ যুগের হাত ধরে এ ছবি তাঁর চোখের সামনে এলো! এও কি এই দেশেরই রূপ! ঘুরে ফিরে এ যেন নিজেকেই দেখা। অবধূত নিজেই বলেন তাদের মকরসংক্রান্তির মাঘ ব্রতের কথা যা কল্পবাসীর অবশ্য কর্তব্য বিষয়। নিয়ম অনুযায়ী

মকরসংক্রান্তি থেকে গঙ্গাচরে বাস করতে হয়। থাকতে হয় উপবাস করে। ধর্মের কথা শুনতে হয়। আপন আপন সাধন করতে হয়। আর ব্রাহ্মমুহূর্তে নগ্ন হয়ে গঙ্গা স্নান করলে তবে পরম ব্রহ্ম তুষ্ট হন। আবার এও বলেন যে, তিনি গৃহাবধূত। যখন তিনি ঘরে থাকেন তখন গৃহী আর বাইরে এলে সন্ন্যাসী। সঙ্গে অবধূতানী তারই জেনানা আর সঙ্গের দুই লেড়কা-লেড়কিও তাঁর, ওদের দীক্ষা হয়নি। তাঁর ঘর আছে, ক্ষেতি-বাড়িও আছে। কিন্তু তীর্থ করতে এসে এখানে ভিক্ষামাত্র সার। আর কালকূটের মনে হয় সন্ন্যাসী অবধূত হোক বা গৃহাবধূতই হোক, সে পরম ধার্মিক সদাহাস্যময়, প্রেমিকা স্ত্রীর স্বামী, আদুরে ছেলেমেয়ের বাবা।

খুব ছোট আকারে হলেও কালকূটের বর্ণনায় উঠে আসে ভূতানন্দ এবং তার সঙ্গিনী ভৈরবী চণ্ডিকার কথা। তারা নিজেদের তন্ত্রসাধনার পুরুষ-প্রকৃতি রূপে পরিচয় দেয়। তার সাধনতত্ত্বের কিছু ইঙ্গিতও কালকূটকে ব্যাখ্যা করে বলেন ভূতানন্দ। ভূতানন্দ একজন সাধক না খেতে পাওয়া কোটি মানুষের একজন। তাই কালকূট দেখেন ভূতানন্দের ভৈরবীর ক্ষুধার কান্না আর জীবনের কান্না একই সঙ্গে মিলে মিশে যায়। ভৈরবী তার ভৈরব সম্পর্কে সহজ স্বীকারোক্তি দেয়—

> ''আজ দশ বছর তোমার সঙ্গে রইছি, আমি কি তোমার কেউ নয়?... তোমার বউ না হইতে পারি, বউ-এর চাইতে বড়, আমি তোমার ভৈরবী। তোমার ধম্মে আমি, কম্মে আমি। তোমার সুখে আমি, দুঃখে আমি। কী বলেন গো দাদাবাবু, অ্যাঁ? কী আর কইছি! দুইদিন খাই নাই, শরীলে এট্টু কষ্টও হয়।... সাত পাক ঘুরি নাই ঠিক। ষোল বছরের মেয়া আইজ তিরিশ হইল।... এই চইদ্দ বছরে কত লক্ষ পাক দিছি তা জানেন ভগবান।...''[৬]

সমাজের প্রচলিত জীবনযাপনে মানুষ নিজেকে খুলতে পারে না, মনের কথা বলতে পারে না, পরিচিত আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে গেলে, তারাই আবার অন্য রূপে ধরা পড়ে। অর্থাৎ গতানুগতিক ব্যক্তি পরিচয়ে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের মন, মনের ভেতর যাই থাকুক বাইরের খোলস বা পরিচিতি সে ভাঙতে চায় না। এখানে নিজস্ব আড়ষ্টতা কাজ করে। পরিচয় তৈরী করাকে সমাজ গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু একটু অন্যরকম হলেই গ্রহণ করতে সময় নেয়।

তবে এই গতানুগতিক জীবন থেকে দূরে গেলেই আসল মানুষের মুক্তি ঘটে। লেখকের ভাষায়, অষ্টপ্রহর মানুষের সঙ্গেই আমরা বাস করি, মানুষের কত রূপ দেখি। বিদেশ বিভুঁয়ে সেখানে আরও কত মানুষ, কত তার রূপ। যে প্রতিবেশীকে বছরের পর বছর দেখেও কোনোদিন চোখে পড়ে না, পরিবেশের গুণে তার বিচিত্র রূপ দেখে আমাদের মন ভুলে যায়। হাজার দিন যাকে কাছা কাছি থেকে দেখেও যে মন ভোলে না, সে একদিন সব ভোলে। তাই তো এই মন বারে বারে রূপের দরজায় ফেরে।

''জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরাপতি ভেল।

এত রূপের ফেরে ফিরি কেন আমরা! মন খুঁজি। লক্ষ রূপের আরশিতে আমরা নিজের বৈচিত্র্যকে দেখি।...'' [৭]

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' গ্রন্থে লেখক প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় এমন কিছু মানুষ খুঁজে পেয়েছেন যাদের জীবন কথার টুকরো টুকরো অংশকে প্রয়াগের প্রেক্ষাপটে জুড়ে বিচিত্র মানব জীবনের আখ্যান গড়ে উঠেছে। আমরা দেখবো যে, দুটো মানুষের সম্পর্ক নিয়েই সে সব আখ্যান; সে সম্পর্কের পরিণাম প্রায়ই বিষাদান্ত। কোথাও বা নরনারীর ভালোবাসার রোমান্টিক উত্তাপ কোথাও বা তার অভাবের দিকটি চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন---বলরাম-লক্ষ্মীদাসী, রামজীদাসী-সন্ন্যাসী ও শ্যামা-লেখকের কথা দিয়ে গড়ে উঠেছে এর অনেকাংশ। ডাক্তার পাঁচু গোপাল, হোটেল মালিক এদের কথাও এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা যা নিয়ে মানুষটার বাইরের খোলসের আধারে আবৃত হয়ে আছে; দু-একটি সহানুভূতিপূর্ণ কথার ভিতর দিয়ে যার উন্মোচন ঘটে—আর মানুষের এই অন্তরের পরিচয় আমাদের কাছে বিস্ময়কর মানবজীবনের রূপকে তুলে আনে।

নববিবাহিত নাতি প্রহ্লাদ, নাতবৌ ব্রজকে নিয়ে প্রয়াগে তীর্থ করতে আসা প্রহ্লাদের দিদিমা, নিষ্ঠুর চেহারার ডাক্তার পাঁচবদ্যির নিষেধ উপেক্ষা করে কালকূটকে তাঁদের ক্যাম্পে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা ছিল খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে পাঁচুগোপাল, প্রহ্লাদের দিদিমার মতো তীর্থযাত্রীদের প্রয়াগে থাকার একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। তাই গভীর রাত্রে পাঁচুগোপাল তার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে কালকূটকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি তাঁকে অনুসরণ করে তার গতিবিধির উপর নজর রেখেছিলেন। লেখক যখন তাঁকে এই পিছু নেবার কারণ জিজ্ঞেস

করেন তখন পাঁচবদ্যি বলেন প্রয়াগের এই তীর্থক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে কেউ যদি তাকে নদীতে মেরে ফেলে দেয় কেউ জানতে পারবে না। তিনি তাই তাঁর পিছু নিয়েছিলেন। পাঁচুগোপালকে কালকূট আপ্যায়ন জানিয়ে খাওয়ানোর পর গল্পের ছলে জানতে পারেন তার ট্রাজিক জীবনের করুণতম কাহিনি। কালকূট ধীরে ধীরে এক নিষ্ঠুর মূর্তির ভিতর থেকে একজন অনুভূতিশীল মানুষকে আবিষ্কার করেন। প্রাণগোপাল রায়ের ছেলে পাঁচুগোপালের সুন্দরী স্ত্রী, কন্যা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। তার স্ত্রীর মতোই সুন্দরী মেয়ে শিউলি সতেরো বছর বয়সে, না জানিয়ে চলে যায় একটি ছেলের সঙ্গে। পাঁচুগোপাল পাগলের মতো মেয়েকে খুঁজে ফেরে। কোথাও তার সন্ধান পায়নি। বুকের জ্বালা মেটাতে দশ বছর সাধু হয়ে সে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু ঘরের বাইরে, অসীম সমুদ্র আর বিরাট হিমালয়, কোথাও তার জ্বালার নিরসন হয়নি। আজও সে তাকে খুঁজে চলেছে। কিন্তু আজ তার স্বাভাবিক পরিচয়টাই হারিয়ে গেছে। কালকূটের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, কেন সে একদিন সাধু হয়েছিল, কেন তার এত হাঁকাহাঁকি, কথার খেই হারানো, পাগলামি আর সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখলেই একটা তিক্ত সন্দেহে ও যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠা। তবু মেয়েকে খোঁজার পালা আজও শেষ হয়নি। এজন্যেই তিনি সুন্দরের মধ্যে বিষকে খুঁজে পান। কালকূটের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রয়াগে আসার রাত্রে পাহারা দিতে নয়, পাঁচুগোপাল এসেছিল একটু আশ্রয়ের জন্য। কালকূটের মনে পড়ে যায় শীতার্ত পাঁচুগোপালের কথা—'নো জায়গা, নট কিচ্ছু'। কিন্তু লেখকের প্রহ্লাদদের ক্যাম্প ছেড়ে অন্য আশ্রমের খোঁজে যাবার কথায় হঠাৎ করুণ হয়ে ওঠে পাঁচুগোপালের মুখ। লেখকের মন ও বদলে যায়। মানুষটির সঠিক ধাত বোঝা বড় দায়। এই একরকম, তার পরেই আর একরকম। মানুষটি তাড়াবার জন্য কী না করেছে সেকথা এখন মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। লেখক ভেবেছিলেন, পাঁচুগোপালের অপমানের শোধ নেবেন। কিন্তু তার শোধ বোধ কোনটারই বালাই নেই। সে চলে নিজের হৃদয়াবেগে। হৃদয়াবেগে চলা মানুষের সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি। সে দুঃখ কেউ রোধ করতে পারে না।

বাংলার এক গ্রাম থেকে আঠারো বছর বয়সে চলে আসা, দেশান্তরী রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রয়াগের মেলায় এক মাদ্রাজী বন্ধুর কাছে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কেনা নর্থ ওয়েস্টার্ন রেস্টুরেন্টের মালিক সেজে বসেছেন। বাবা-মাকে অল্প বয়সে হারিয়ে আঠারো বছর পর্যন্ত এক মাসির কাছে বড় হয়ে ওঠা। মাসি মারা গেলে তাঁর জমি-জমা ভাগীদারদের

হাতে সঁপে দিয়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছেন। যে মাসি তাঁকে বেঁধে রেখেছিলেন, সেই মাসিই যখন রইলো না, তখন 'সোনার বাঁধনের' অনুমতি নিয়ে সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, আর তিনি ঘরমুখো হননি। তাঁর ভাষায়—

> ''...বেরিয়ে পড়লুম দিগ্বিজয়ে।...কেন যাচ্ছি, কীসের দিগ্বিজয়, কিছুই জানতুম না। তবু বেরিয়ে পড়লুম। সেইদিনটি ছিল আমার বড় আনন্দের দিন, আর আজ ভাবি, কী ভয়ংকর, কী সর্বনাশের দিন ছিল সেটি! ... আমার এ কোন্ সর্বনেশে ভ্রমণ! শুকনো ঝরা পাতা উড়ছে পথে পথে। উড়ছি পড়ছি, তারপর একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব কার পায়ের চাপে। কী যে চাইলুম, আর কী যে পেলুম! বড় ভয়ংকর নেশা ভাই, ভয়াবহ নেশা।...''[৮]

লেখকের যেন মনে হয় তাঁর একটা তীব্র যন্ত্রণার সুর ঢেউ দিয়ে ফিরছে কানের কাছে। এ যে মাতালের ধিক্কারের কান্না। একদিন যা আকণ্ঠ পানে মাতাল করেছে তাই আজ বিষক্রিয়া শুরু করেছে।

ক্ষণিকের পরিচয়ে রমণীমোহনের ঘরহারানো ক্ষতবিক্ষত মনটিকে যেন সজীব করে তুলেছেন কালকূট। তাই রমণীমোহন কালকূটকে আবারও আসার আমন্ত্রণ জানান।

প্রয়াগ প্রাঙ্গণে যাকে নিয়ে সবাই তটস্থ সেই 'সর্বনাশী' চোরকে ভিক্ষে দিতে গিয়ে কালকূট সবার মধ্যে শুধুমাত্র হিদের মার সমর্থন পেয়েছিলেন। এই 'সর্বনাশী' প্রয়াগের বালুচরে কখনো লাস্যময়ী যাযাবরীর মতো দেখা দেয়, আবার কখনো বা এই ভিখারিনীর পতিসেবার বিস্ময়কর দৃশ্য পাঠককেও সচকিত করে তোলে। বালুচরে সর্বনাশীর ভিখারিণী বাহিনীকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে সবাই বলেছে, সে সর্বনাশী। কিন্তু শুধু সর্বনাশী! সেই সর্বনাশেরই আয়োজন যেন তার চোখে-মুখে বেশে। যে সব হারিয়ে পথে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে সর্বনাশের আগুন তো জ্বালাবেই সে। যার কিছু নেই, সর্বনাশের খেলা তো তাকেই সাজে। তাকে ভিক্ষে দিচ্ছে কেউ কেউ যেচে। কত লুব্ধ চোখের পেছনে, ভিখারিনী হয়েও রাণীর মতো মাথা তুলে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালকূট সমুদ্রগুপ্তের কূপ দেখতে, পাঁচিল ঘেরা বাড়ির অন্ধ সুড়ঙ্গে অজস্র মানুষের ভিড়ের ঠাসাঠাসির মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়েন। কিন্তু সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে ভিনদেশি ভিখারিনী সর্বনাশী কালকূটের টাকার ব্যাগটি চুরি করে নিতে যায়

এবং ধরাও পড়ে। অথচ এই সর্বনাশীকেই লেখক নতুন করে যেন আবিষ্কার করলেন—

> ''মনে করেছিলাম, ওই মেয়ে শুধু সর্বনাশের হাতধরা সঙ্গিনী। মনে করেছিলাম, সেই সর্বনাশে শুধু পাপলীলা। ধ্বংসের উন্মাদনায় মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধায় ও প্রেমহীনতায়, সে শুধু তার যৌবনের অগ্নিকণা ছিটিয়ে যায় মানুষের চোখে। অস্বীকার করবো না, তার ভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কিল হাত থেকে নিজের পয়সার ব্যাগটি বাঁচিয়ে ধিক্কার এসেছিল মনে। ভেবেছিলাম, পঙ্কে ডুবে যাওয়ার জন্য যাতে হাত পড়েছিল, তাকে বুকে মুঠি করে ধরে এ কোন্ পয়সাসর্বস্ব অসহায় মানুষ আমি!''[৯]

পুণ্য প্রয়াগ সঙ্গমে সর্বনাশী তার অসুস্থ স্বামীকে স্নান করাতে নিয়ে এসেছে। যেখানে খনপিসি ও তাঁর সঙ্গী বাহিনীও উপস্থিত কিন্তু পরিবেশ ও স্থানের গুণে তাঁর মুখে বিরক্তির বদলে রয়েছে হাসির ঝিলিক। সর্বনাশীকে পরম আশ্বাসের সুরে বলেন এত কষ্ট করে সঙ্গমে নিয়ে এসেছ, কে নেবে ওর পরমায়ু! তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক, চির-আয়ুষ্মতি হও। এই দৃশ্য লেখককে শুধুমাত্র বিস্মিত করেনি পাশাপাশি আরো কিছু ছিল—লেখকের ভাষায়—

> ''যা ছিল, তা আমার আনন্দ মুখরিত বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও বেদনার নমস্কার। নমস্কার মানুষের জীবনের ও হৃদয়ের কোটি কোটি বৈচিত্র্যকে, অপরূপ বিচিত্রকে।... প্রেমে ও স্নেহে যে সর্বনাশী এমন মূর্তি ধরতে পারে, যে এমনি করে অমৃতে হয় একাকার, তাকে পঙ্ক বলে ফিরে যাব, সে দুঃসাহসও আমার নেই।''[১০]

শুধু খনপিসি নয়, দলের কেউ-ই তাকে চিনল না। সেও চিনল কিনা কে জানে! লেখকের মনে হয় এখন যদি সর্বনাশীর সঙ্গে একবার তাঁর চোখাচোখি হয়, তবে হয়তো তাঁকেও চিনতে পারবে না, কেননা, এখন সে যে গভীরতায় ডুবে আছে সেখানে তার নিজের মেলা। সেখান থেকে যখনি উঠবে ভেসে তখন এই বাইরের মেলা তখন আমরা ও আমির অবস্থান।

প্রয়াগের তীর্থভূমিতে আসা মানুষগুলির ভিতরকার রূপটি এক-একটি ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে ধরা অসাধারণ হয়ে ধরা পড়েছে। এই সব অতি সাধারণ মানুষের জীবনের কোন একটি সত্য এমন অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছে যার মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় ধরা

পড়েছে। সেই পরিচয় যেমন বিস্ময়কর তেমনি তা মানব জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফসল। বহু মানুষের এই সব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সত্য লেখকের সত্যবোধের বৈচিত্র্য সাধক এবং জীবন সত্যের ব্যাপকতার পরিবাহী। আর বহু মানুষের জীবন বোধের ধারণা থেকে লেখকেরও আত্মবোধের উপলব্ধি—বহুকে জানার সঙ্গে নিজেকে জানা। যেমন 'হিদে গয়লার মা'-র চরিত্রটিও তাঁর লেখনীর তুলির টানে পরিস্ফুট হয়েছে। লেখক সর্বনাশীকে ভিক্ষে দেওয়ায় একদিকে খনপিসির দল যেমন ভর্ৎসনা করে, তেমনি এই সামান্য দানকেই গৌরবান্বিত করে তোলে হিদের মা। দান করার বিশেষত্বকে নিয়ে হিদের মার যে উদারমনস্ক চিন্তাভাবনা তা লেখককে মুগ্ধ করে তোলে। হিদের মার মুগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টি, একটু যেন আত্মভোলা, কণ্ঠে কোমলতা নিয়ে বলে যান—

> ''বেশ করেছ। এখানে এসে দেবে না তো, কোথায় দেবে? আর দিয়ে আনন্দ ভোগ করে কজনা?... যে দিতে পারে না, তার চেয়ে দুঃখী এ সংসারে কে আছে বল তো বাবা?..। যে দেয়, সে-ই তো নেয়। সংসারে সবাই আসে দিতে। দিতে আর নিতে। আগে দেও পরে নেও, না-কি বল বাবা, অ্যাঁ? মা ছেলেকে দেয় আবার ছেলের কাছ থেকে মা হাত পেতে নেয়। বসুমতীকে তুমি দেও, মা বসুমতী তোমাকে দেবে ঘর ভরে। বিদ্বানে তো বিদ্যা দেয়। দেওয়ার চেয়ে সুখ কী আছে? ... দেওয়ার সুখ আছে, বড় ঘেন্নাও আছে বাবা। দিয়ে যার মাটিতে পা পড়ে না। দিয়েছি তো মাথা কিনেছি। দ্যাখো, ক-ত্তো দিয়েছি। ওই হলে ঘেন্না। আবার যার আছে, সে দিতে জানে না। দেওয়ার রীতি জানে না। সে বড় অভাগা। আমি তো এই বুঝি। তুমি কী বল বাবা, অ্যাঁ?''[১১]

বলিরেখাবহুল ফর্সা, চোখে মোটা লেন্সের আড়ালে অস্বাভাবিক দুটি আয়ত চোখ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরনে থান, যেন খানিকটা মায়ের মতো মহিলাটি, সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে লেখকের দু-আনার দানকে যেন গৌরবান্বিত করতে এসেছেন। কিন্তু লেখকের মন সঙ্কোচে ভরে ওঠে, আত্মধিক্কারে বলে ওঠে সত্যিই ভিখারিনীকে দু-আনা ভিক্ষে দেওয়া কি এত বড় দেওয়া। এত মস্ত দেওয়া কি দিয়েছেন কখনো। সংসারকে কিছু দেওয়া, সে তো

আসল দেওয়া। সে দেওয়ার কানাকড়ি কি সত্যিই আছে আমাদের কাছে? যার আছে থলি ভরতি, সে দিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু যার শূন্য থলি, ভরবে বলে ফিরছে। কিন্তু পেলেও দিতে পারে ক'জন? পাওয়ার গুমরে মন যে তখন ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকে। কণ্ঠে যার এত কোমলতা, সেই হিদের মা-র বুকের ভিতর অসম্ভব জ্বালা। পুত্রস্নেহ থেকে বঞ্চিত হিদের মা! কলকাতার অফিসে চাকরি করে হিদে কিন্তু ঝি বলেও মার হাতে দুটো পয়সা দেয় না। সে, মা বলে ডাকে না। এটাই হিদের মার আক্ষেপ। সে নাকি বউকাটকী, ছেলে ভোলানী, ঝগড়ুটে, হিংসুটে, লাগানি-ভাঙানি। ঘরে জ্বালা তাই সে ছুটে বাইরে আসে কিন্তু বাইরে আরো বেশি জ্বালা মনে হয়। ঘর-বার সমান হয়ে গেছে কিন্তু কোথাও শান্তির হদিস নেই একটুও।

এত কথার পরে বিশাল মুগ্ধ দৃষ্টি, উন্মুক্ত মুখ, ঘাড় কাত করা সরল অভিব্যক্তি নিয়ে হিদের মা যখন দু-চার আনা পয়সা চায়, লেখকের মন আচমকা বিরক্তিতে কেমন যেন গুটিয়ে আসে। লেখক মনে করেন আমাদের ভদ্রতায়, শিক্ষায়, আলাপনে, ভাবনায়, চিন্তায়, আত্মসন্তুষ্টির যে বেড়া দিয়ে আমাদের জীবনের চারপাশে বেড় দেওয়া তার বাইরে গেলেই আমরা পিছিয়ে আসি। নিজ নিজ গণ্ডিতে আমরা উদার কিন্তু বাইরে অস্বাভাবিক। এরপর হিদের মার কথা অনুযায়ী হিদেকে চিঠি লিখতে গিয়ে লেখক বুঝতে পারেন এই মহিলা কতটা ক্লান্ত ব্যথিত; সে মনের শান্তির জন্য ঠাকুরের দোরে দোরে তার হাহাকার বিলিয়ে চলেছে, কিন্তু সুফল হয়নি। কারণ তাঁর অমৃতকুম্ভ যে একমাত্র হিদের মধ্যেই স্থাপিত। লেখকও আর এঁর প্রতি বিমুখ থাকতে পারেন না। মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ করুণা ও অনুগ্রহের ছোঁয়া লাগে। অতএব প্রহ্লাদের বালিকা স্ত্রী ব্রজবালার উল্লিখিত 'কিপটে বুড়িকে' টাকা না দিয়ে তিনি থাকতে পারলেন না। কিন্তু কালকূট অবাক হলেন তখনই যখন আবিষ্কার করলেন যে একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য হিদে গয়লার মা অবলীলায় তাঁর দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ধন তথা নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিতে দ্বিধাহীন চিত্ত। কিন্তু হিদের মার দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা না থাকলেও, ব্রাহ্মণও যে এমন সংকোচহীন ভাবে ভোজন চালিয়ে যেতে পারে তা লেখককে অবাক করে। তিনি দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন দোকানের বিল মেটানোর জন্য হিদের মা হয়তো তাঁর কাছে টাকা চাইবে! কিন্তু সব ধারণা ভেঙে দিয়ে সঞ্চিত অর্থের বেশি অংশটাই দোকানিকে মিটিয়ে দিয়ে মহানন্দে জনারণ্যে হিদে গয়লার মা হারিয়ে যায়। আর লেখক একাকী দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকেন আত্মসমীক্ষায় মন বলে ওঠে—

''...কী এক আবেগের তোড়ে ভেসে গেল হিদের মা। আমাকে ডাকলে না, ফিরলে না। কোনো এক মহা আনন্দের সব ভোলানো হাওয়া এসে টেনে নিয়ে গেল তাকে। ... আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সব শঙ্কা ভয়, আমার সব অহংকার চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল সে। হিদের মা'র জীবনে যা ভক্তি, যা বিশ্বাস, আমার তা নয়। হয়তো একেই বলে আত্মসম্মোহন। কিন্তু তার এই ভক্তি, বিশ্বাস দিয়েই সে আমার মনের সঙ্কীর্ণতার স্পর্ধাকে ভেঙে দিয়ে গেল। এর অবাস্তবতা, অলৌকিকতা, সব জেনেও তার সব দেওয়ার এ আনন্দের মর্যাদাকে তো অবহেলা করতে পারি নে। যে এমনি করে দিয়ে যায়, তাকে এক টাকা দিয়ে আমি করুণার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বিদ্রূপ নয়, কথা নয়, নিজের আনন্দ ও বেদনা দিয়ে সে আমার আত্মপ্রসাদকে ধিক্কার দিয়ে গেল। সে আমাকে সাধু খাওয়ানো শেখাল না। আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়ের সব দ্বার অসঙ্কোচে উন্মোচনের শিক্ষা দিয়ে গেল। তাই সে অমনি করে দেওয়ার কথা বলেছিল। তাই কিপ্‌টে বুড়ি মিষ্টি গলায় বলেছিল, 'আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?''[১২]

প্রয়াগকে বলা হয় অমৃতকুম্ভ, লেখক সেই অমৃতকুম্ভে এসেছেন কিন্তু তিনি আবিষ্কার করছেন এক একটি মানুষের হৃদয় অমৃতকুম্ভের খনি। এক অমৃতকুম্ভের মেলায় এসে বহু ছোট ছোট অমৃতকুম্ভ আবিষ্কারে তাঁর মন ভরে উঠেছে বিষামৃত আস্বাদনের আনন্দে।

কালকূটের কৌতূহলী দৃষ্টিতে অন্ধ গায়ক সুরদাস স্বল্পক্ষণের জন্যে হলেও উঠে এসেছে। সে কীভাবে নির্ভয়ে একাকী পথ চলেছে তা লেখককে বিস্মিত করে। আরো বিস্মিত হয়ে পড়েন যখন সুরদাস তার নিজের জিজ্ঞাসা, 'রাস্তা তো ঠিক হ্যায়' এর প্রেক্ষিতে বলে ওঠে, 'কোই নহি বতা সক্‌তা কিধর গয়ী সড়ক, কঁহা গয়া রাস্তা। হ্যায় না বাবুজী?' তখন লেখকের মনে হয়, তবে কি সে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করছিল শুধু? রাস্তা তার ঠিক আছে কিনা, এ শুধু জিজ্ঞাসা নিজেকে। এত লোক চমকে ফিরে তাকে বারবার জবাব দিয়েছে, আর সে শুধু এমনি হেসেছে মনে মনে। সুরদাস হিন্দীতে জানায় সে অন্ধ। জন্মান্ধ! মায়ের পেট থেকে

পড়ে এক-ই বুলি শিখেছে সে। রাস্তা ঠিক আছে তো? সারা সংসার যখন চেঁচিয়ে বলে 'সব ঠিক হ্যায়', তখন সে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'সব ঠিক হ্যায়?' দুনিয়ার সব ঠিক আছে? তবে সে কেন সব কিছুর ঠিক পায় না? লেখক মনে করেন সুরদাস অন্ধ। কিন্তু তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি উচ্চারণ প্রকৃত চক্ষুষ্মানদের মতো। তার ওই আত্মভোলা হাসির মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে এক গম্ভীর সচেতন, অভিজ্ঞ, সহৃদয় মানুষ। এক উদাস কৌতুক ও রহস্যের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যেন তার ভাবে-ভোলা মুখে। কথা শুনে কালকূটের মনে হয়, সে তাঁর চেয়ে বেশি দেখছে। লেখক আরো বিস্মিত হন যখন অন্ধ সুরদাস সমুদ্রগুপ্তের কূপের সিঁড়িতে ওঠা-নামা নিয়ে বলে চলে—

> ''বাবুজী, চঢ়কে উচা যো মিলি হাতমে, উতরানে কি বখত রাখো সামালকে। নাহি তো, ও গির যায়েগী, ...মহাপুরুষ লোক উজান চলে আপনা সাধন পথে। কাঁহে? পাপের দরিয়া বয়ে চলেন তিনি পুণ্যের উজানে। মগর বাবুজী দরিয়া বয়ে কি নামে আপ্না সাধন পথে? নিচের পথকে হর্ আদমি ডরতা। পাপ উর মরণের মায়া তো হ্যায় ওহি রাস্তার কিনারে কিনারে। তবে? হুশিয়র সে চড়ো, মগর উতরো জায়দা হুশিয়ারসে। সহজ ভেবে যদি সহজে নামো সজনী, তোমার পা পিছলে কোথায় চলে যাবে, হারিয়ে যাবে কোথায়!''[১৩]

লেখকেরও মনে হয় পদস্খলিত মানুষ যখন নামে, মৃত্যু তখন ওত পেতে থাকে তার জন্যে। মানুষ উঠতে গিয়ে পড়ে না। বরং নামতে গিয়ে পড়ে। কারণ নামবার পথে টান যে বেশি! তাঁর ভাষায়— ''চোখ থাকতে বুঝলাম না। বুঝতে হলো অন্ধের কাছ থেকে। তাকিয়ে দেখি, তার সারা মুখ আলোকময়। আলো তার অন্ধ! রূপ-অন্ধ চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম অন্ধ জীবন সন্ধানীর দিকে।''[১৪] লেখকের মনে হয় অন্ধ যাই বলুক, যে রাস্তার জন্য তার অত জিজ্ঞাসাবাদ তা নিশ্চয়ই ভগবানের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁচেছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন সুরদাসকে, রাস্তা কীসের? ভগবানের? সুরদাস বিনয়ে হাত জোড় করে যেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, সে তো ভগবান কে, তা জানে না। সে জানে দুনিয়া অন্ধকার আর সে সবসময় আলো খুঁজে ফিরছে। হাজারো রাস্তা পড়ে আছে কিন্তু কোন্ রাস্তা ধরবে, সে তো জানে নিজের মন। যব মন ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়

রাস্তা' অন্যদিকে লেখকের মনে হয়, ঘরে ও বাইরে যার অন্ধকার, সর্বত্র যার নিরানন্দ, তার আনন্দ কোথায়? সে কি শুধু এই পথের পরে পথে, পথচলার মধ্যে?

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লেখক যে মানুষগুলির কথা কিছুটা দীর্ঘায়ত বর্ণনা করেছেন, হয়তো বা তাতে কল্পনার কিছুটা মিশ্রণ ঘটেছে? তেমন মানুষের মধ্যে আছে রঘুনন্দন ও রামজীদাসীর কথা যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কালকূট পরিব্রাজক হয়েও পর্যটক নন, আবার পথিক হয়েও তিনি ভ্রান্ত পথিক নন, সেই কারণেই তাঁর লক্ষ ডুবুরি সদৃশ। অপরূপা, রামভক্ত শ্রীরামজীদাসীর গান ও নৃত্যকলার মধ্যে তার ট্রাজিক জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি লেখক তাঁর জীবন সন্ধানী চোখে খুঁজে আনেন। কীভাবে মনিয়াবাঈ রঘুনন্দনের সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং রঘুনন্দকে হারিয়ে মনিয়াবাঈ রামজীদাসী হয়ে উঠল তার কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র লেখক উদ্দীপক বর্ণনা ভঙ্গিতে তুলে ধরেন।

লেখক প্রয়াগের কুম্ভমেলায় লক্ষ করেছেন মানুষের ভক্তির বিচিত্র রূপ, তাদের বিশ্বাস সংস্কার উপলব্ধি। প্রয়াগ প্রাঙ্গণের চারিদিকে গেরুয়াধারী সাধু সন্ন্যাসী তান্ত্রিকদের সমাবেশ, তীর্থযাত্রী সকলের মধ্যেই যেন এক ভাবাবেশের ঘোর আচ্ছন্নতা। তাদের বিশ্বাস, ভগবান কোন বেশে তাদের সামনে থেকে চলে যাবে তারা হয়তো জানবে না। কোতয়ালজী ভেবে লেখক যার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই সাধুর কণ্ঠেও একই ভাব লক্ষ করা যায় সেও দুনিয়াভর তাকে খুঁজছে কিন্তু জীবন কেটে গেল, তবু পাত্তা মিলল না। এখানেই কালকূট জানেন সন্ন্যাসীর প্রেমতত্ত্ব। সন্ন্যাসী হলেন সৎ -এ যিনি ন্যাস প্রাপ্ত বা রক্ষিত। সৎ অর্থে মহান ত্যাগের কথা বলা হয়। ত্যাগের ভেতরে প্রেমান্বোষণ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর প্রেমকথা অত্যন্ত জটিল বিষয়। রামজীদাসীর গানের আসরে এক সন্ন্যাসী প্রেম কথা ব্যাখ্যা করেন। সন্ন্যাসীর প্রেম তার ধ্যানে ও ধর্মে আর কর্মে। তার প্রেম, প্রাণেশ্বরী, প্রেয়সী, 'সন্ন্যাসীনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে! তবে গোপনে।' গৃহী জগতের বাইরে। প্রেম থাকবে না কেন? তবে এই প্রেমে অনেক আড়ম্বর, অনেক আয়োজন। লোকচক্ষুর অন্তরালের বিষয়।

এই প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গুপ্ত সাধন প্রক্রিয়া স্বরূপ 'কুলাচার' এর কথা এসেছে। সন্ন্যাসীজী জানিয়েছেন সেই কুলাচারের গুহ্য ব্যাখ্যা যা জ্যোত্মার্গের সাধনার সঙ্গে যুক্ত। এই জ্যোত্মার্গে যে প্রবেশ করে, তাকে আর একটি ব্রত করতে হয়। তাকে বলে চৈত্রমাসে নবরাত্র ব্রত। সন্ন্যাসীজীর ব্যাখ্যায়—এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী চক্র করে আর লুপ্ত স্থানে মিলিত

হয় আওরতের সঙ্গে। এই মিলন হলো সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি। একে ছাড়া চলবে না। এর মধ্যে আছে যুক্তি, কূট বিষয়। সন্ন্যাসীজীর উক্ত এই জোত্মার্গ এবং সাধন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রচিত হয়েছে রঘুনন্দন-রুকমিণীর প্রেমতত্ত্ব। সন্ন্যাসীর সাধনকথার মধ্যে লেখক অনুভব করেন এক মহাভাবের প্রেমিক প্রেমিকার মিলন। যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পান মানুষ আর সাধকের আত্মার তৃপ্তি। যে মিলনের মধ্যে আচার সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা প্রেমের উজ্জ্বল মহিমাই মুখ্য। তাই রুক্মিণীর মধ্যে রঘুনন্দনকে আবিষ্কার নিজেকেই আরেক রূপে চেনা। এই সন্ধানের উৎসরূপে ব্যক্ত হয়েছে সন্ন্যাসীর গল্প। এই গল্পের নায়িকা রুক্মিণী থেকে মণিয়াবাঈ এবং তার থেকে রামজীদাসী। সন্ন্যাসীর কথা থেকে জানা যায়, যে রামজীদাসী আজ মেলার মাঝে নেচে নেচে ভগবানের সেবা করছে, একদিন তার নাচ দেখার জন্য লাখপতিরা সব ধর্না দিত। সে তখন লক্ষ্মৌয়ের মনিয়াবাঈ। রূপে যার জুড়ি ছিল না দিল্লি লক্ষৌয়ের বাঈজীকুলে। কেউ বলত রুক্মিণী। ঠেট্ হিন্দি ভাষায় নয়, সন্ন্যাসীজী গ্রাম্য ভাষার মধ্যে গ্রাম্য অলংকার দিয়ে মনিয়াবাঈ-এর কথা বলতে গিয়ে কবিতা আবৃত্তির মতো বলে উঠলো— ''বাবুজী জানো, অনেক খেলা ভগবান আমাদের দেখাচ্ছে। মনিয়াবাঈকে দিয়ে ভগবান আমাদের একটা খেলা দেখিয়েছে। মনিয়াবাঈ সোনার পালঙ্কে বসে মহারানীর আদর পেয়েছে, কিন্তু বুকের ভেতর তার আঁকা ছিল রঘুনন্দনের মূর্তি।''[১৫] কিন্তু কে এই রঘুনন্দন? বললো—

> ''সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী শুধু কপীন এঁটে জটা বাঁধবার জন্যে? ... উঁহু বাবুজী, সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের মধ্যে প্রেমাবতার বাসা নিয়েছিল। যে তার কথা শুনেছে, প্রাণ জুড়িয়েছে তার। ... সেই রঘুনন্দনের ছায়া পড়েছিল মনিয়াবাঈয়ের বুকে। পর-ছায়া নয়। রঘুনন্দনের সাচ্চা ছায়া।... মনিয়াবাঈয়ের আর এক নাম ছিল পাগলী বাঈজী। রূপ ছিল তার পাপ। সেই পাপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আলো। সেই আলো যখন জ্বলে উঠতো পাপের ভারে, মনিয়া তখন পাগলী হতো।''[১৬]

রামজীদাসী আর মনিয়াবাঈ। মনিয়াবাঈ আর রঘুনন্দন। সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র রহস্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে লেখক উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। অতীত ভারতের রহস্যদ্বারের সামনে যেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। যেন বিচিত্র এক রহস্যে ছেয়ে গেছে সারা কুম্ভমেলা। তাঁর মন মনিয়াবাঈ আর সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কাহিনি শোনবার জন্য আকুল। অন্যদিকে সন্ন্যাসীর প্রেম

কথাকে একটা পটভূমি দিতে গিয়ে বক্তা বলে চলেছেন সন্ন্যাসীদের সাধন পথের গুপ্তকথা এবং শেষে আরম্ভ করেন—

> ''...বাবুজী, রামজীদাসীর রূপ দেখে মানুষের চোখ ভুলে যায়। পুরুষের চোখ কিনা! কিন্তু পুরুষের রূপ দেখেও যে মানুষের চোখ ভোলে, তার প্রমাণ ছিল রঘুনন্দন। এই এলাহাবাদেই এক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে। মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ। শুধু রূপে নয়, গুণেও। সে চোখ তুলে তাকালে, গায়ে হাত দিলে, সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠত মানুষের। মন্ত্র-তন্ত্র নয়, তার হৃদয়টি ছিল অমনি। তার চরিত্রের গুণে তার কাছে আসত মানুষ।... মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তর্কে হার মেনে রগচটা সন্ন্যাসীরা খালি ত্রিশূল দিয়ে মাটি খোঁচাত। ... এই রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর দেখা হয়েছিল হরিদ্বারে। রঘু তখন জ্যোত্মার্গ সাধন করে নবরাত্র ব্রত উদ্যাপনের আয়োজন করছে।''[১৭]

শুনতে শুনতে লেখকের মনে হয়, যে ভারতবর্ষকে তিনি দেখছেন, এ যেন সে ভারতের কাহিনি নয়, কোনও এক হিন্দুযুগের। সন্ন্যাসী তখন আপন মনের বিচিত্রভাবের দ্বারা বলে চলেছেন প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগের কথা। যখন আশ্রমে মনিয়াবাঈ এল। সন্ন্যাসী বলে চলেছে—

> ''মনে আছে, সে যেদিন এলো, আমাদের আশ্রমের শূন্য বাগানে যেন ফুল ফুটে উঠলো। ... সঙ্গে তার স্বামী। ঝোলা কাঁধে নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ। চৈত্র মাস ... কেদার বদরির যাত্রীরা আসতে আরম্ভ করেছে। ... রুকমিণীর স্বামী মোহান্তর অনুমতি নিয়ে খানা পাকাবার আয়োজন করলো আশ্রমে। তারা এসেছে আরও উত্তর থেকে। যাবে বদরিনারায়ণ দর্শনে। আশ্রমের পেছনেই একটি গুপ্তবাস ছিল। ... সেইখানে নবরাত্র ব্রতের ভিড়। ... নবরাত্র ব্রত বড় গোপন বিষয়। তার আয়োজনও চলছিল গোপনে।... বড় অদ্ভুত মানুষ ছিল রঘুনন্দন।''[১৮]

সন্ন্যাসী দিয়ে চলে রঘুনন্দনের বর্ণনা। এই রঘুনন্দন নবরাত্র ব্রতের উদ্যাপন স্থান গুপ্তাবাস

থেকে বার বার বেরিয়ে এসে মোহান্তর কাছে এসে বসে। তার মুখের হাসি ঠিক সন্ন্যাসীর শোভা পায় না। সে হাসি গৃহী জোয়ান ছেলের। তবে, রঘুনন্দনের মুখে একটা চিন্তার রেশও ছিল। হঠাৎ একদিন রঘুনন্দন এসে বললো সে চক্রে থাকতে পারবে না। মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন, যেন সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ! তার ঢিলেঢালা হাসি খুশি চরিত্রের জন্য সে মোহান্ত হতে পারেনি। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস ও জ্ঞান তার কাছ থেকেই সকলে গ্রহণ করতো। তার চক্রে না বসার সিদ্ধান্তে কোতয়ালজী সন্ন্যাসী ভয়ে বিস্মিত হয়ে যান, কিন্তু রঘুনন্দন বলে—

> ''তা হয় না কোতায়ালজী। হৃদয়ের আগল বন্ধ। ভগবান আমার সেবায় খুশি হবেন না। এমন সময় রুক্মিণী এসে দাঁড়ালো সামনে। .. রঘুনন্দন বললো, নারায়ণো, বেঁচে থাকো। ... রুক্মিণী এলে যেন আশ্রমে ফুল ফুটে উঠতো। তার রূপ, তার কথা ও নির্মল হাসি সকলেরই বড় চোখে লেগেছিল। সে একটু চঞ্চল। ... রঘুনন্দনকে দেখে রুক্মিণী নির্বাক নিথর। চোখে তার আলোর শিখা... রঘুনন্দনের চোখেও দেখলাম তেমনি আলো।''[১৯]

কোতয়ালজীর কথায় আখড়ার কিছু সন্ন্যাসী নবরাত্র ব্রত অংশগ্রহণে খুব উৎসুক। কলিকাল কি-না। সন্ন্যাসী হয়েও সুখের মুখ দেখতে চায় সবাই। কিন্তু মহাজ্ঞানী রঘু রুক্মিণীর প্রতি প্রেমবশত চক্রে একসঙ্গে যোগ দেয়। যার পর থেকে রঘুনন্দনের পরিবর্তন ঘটে যায়। তার মনে জন্ম নেয় এক প্রেমময় সত্তার। তার অন্তর থেকে উৎসারিত হয় এক অনুভূতি। মনে হয় সহজ করে কোনদিন কিছু দেখা হয়নি। যা সহজ তাই তো সুন্দর। কিছু না দেখে না শুনে শুধুমাত্র ছাই মেখে আখড়ায় থাকা। জ্ঞান নিয়ে সর্বক্ষণ বড়াই করা। বুকের রস না হলে সে মাথায় ফুল ফোটে না। মাথার সেই ফুলের নাম হল জ্ঞান। শিকড় তার হৃদয়ে। সে-হৃদয় অন্ধত্ব অবস্থা থেকে যেন চোখ মেলেছে। মন্ত্র কি কেউ শেখায়! সে তো প্রাণের ভিতর থেকে আপনিই উঠে আসে। সেবা এমনটা না হলে সব যে মিথ্যে। রঘুনন্দনের প্রাণের সেই মন্ত্র উচ্চারিত হয়— 'গুরু আমার তুমি, এই প্রকৃতি, গুরু আমার রুক্মিণী, এই সংসার, সংসারের সব আদমি আর আওরত, যা অপরূপ, তাই গুরুর রূপ।' রঘুনন্দনের এই গভীর উপলব্ধি কোতয়ালজী মহাবীরকে বিস্মিত করে দেয়। তার মনে হয় রঘুনন্দনের এই রূপ যেন বাওরা সন্তের হাসি কান্না ভরা বিচিত্র ও অপরূপ। তার মনে হল যেন ঠিকই বলছে রঘুনন্দন। মনে

হলো, ঝুটা এই বিভূতি মাখা, জটা রাখা আর আখড়ায় থাকা, এসব হল চারপাশের নিগড়। এ ভেঙে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এত অল্প সময়ে কী করে রঘুনন্দনের মধ্যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটল। অতি অল্প সময়ের পরিবর্তন রঘুনন্দনের মধ্যে এক বিরাট আর্তির উপস্থিত করলো—

> ''সব দেখবে, তার আগে নিজেকে দেখতে হবে না? মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাং। এ কথা তোমাদের বলেছি মহাবীর ভাই, তাকিয়ে দেখি মনের আঁধার যে বড় ভারী। সে তিমিরে কিছুই চোখে পড়ে না। নমোমাহত্যং। কিন্তু কোন্ সাহসে নমস্কার করবো নিজেকে! খুঁজি দেখি। এতদিন হরিদ্বারে আছি, তার গাছ-পাথরটুকুও দেখি নি কোনোদিন নিরালায় বসে। মানুষকে মনে করেছি, সব ব্যাটা টাকাখোর আর কামুক। ক্ষমা কর ক্ষমা কর। যে নিজেকে চেনে না, সে পরকে দেখবে কেমন করে!''[২০]

এই চিন্তার স্রোত ক্রমে রঘুনন্দন থেকে লেখকের মনে ধাবিত হয়। তাঁর মনে হয় সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কথা যেন সহজিয়া বাউলের গান বা কথার সঙ্গে সাদৃশ্যময়। রঘুনন্দনের সহজ কথা সহজ ভাব লেখকের মনকে নাড়া দেয়। প্রেম সাধনা হল রঘুর অর্জিত জ্ঞান। রুক্মিণীর স্বামী আশ্রম ছেড়ে গেলেও সে থেকে গেছে আশ্রমে। রঘুনন্দনের সঙ্গ-কামনায় পাগলিনী রুক্মিণী চঞ্চল হয়ে লোকলজ্জা তুচ্ছ করে রঘুর কাছে ছুটে যেত। আর মহাপ্রেমিক রঘুনন্দন তার মাথায় হাত রেখে ফিরিয়ে দিত। হঠাৎ একদিন আখড়ার সকলেই শুনল, রঘু গাইছে—

> ''হে ব্রহ্ম ও জ্ঞান, তোমার নাম রুক্মিণী। হে পৃথিবী, তোমার নাম রুক্মিণী। এই হিমাচল ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ সকলেই রুক্মিণী নামে ও রূপে সুন্দরী। হে অবধূত-হংস, তুমি আসলে দেহস্থিত একটি নারী। তোমারও নাম রুক্মিণী। এবার আমি যাব তোমার সন্ধানে। সময় হয়ে গেছে আমার। ডাক পড়েছে।''[২১]

এই সময়ে সকলের সামনে নির্ভয়ে রুক্মিণী এসে ফুল, জল, চন্দন দিল রঘুর পায়। সকলে স্তম্ভিত। মোহান্ত নিয়মভঙ্গের শাস্তি দিতে অন্যান্য আখড়ার মোহান্তদের মতামত চেয়ে পাঠায়। কিন্তু এসবের আর দরকার হলো না। সেই রাত্রেই রঘুনন্দন নিরুদ্দেশ। রুক্মিণীকে ভালোবেসে তার এই যাত্রা আসলে নিজেকে আবিষ্কারের যাত্রা। কিন্তু একা রুক্মিণী আশ্রমে চকিতা

হরিণীর মতো হয়ে রইলো। এরপর স্বামী জোর করে তাকে আশ্রম থেকে নিয়ে যায় কিন্তু সঙ্গের পুরুষদের দ্বারা সে লাঞ্ছিতা হয়ে পালিয়ে গিয়ে একসময় মনিয়াবাঈ রূপধারণ করে। লোকে তাকে বলে 'পাগলী বাঈজী'। সে খুঁজতো তার রঘুনন্দনকে। খুঁজতো তার অন্তরের প্রেমকে। তারপর কয়েক বছর যেতে রামজীদাসীর আবির্ভাব। এখন অষ্টপ্রহর নামকীর্তনই তার কাজ। লোকে বলে, রঘুনন্দনের সঙ্গে নাকি তার দেখা হয়েছিল। সেই থেকে সে এ পথে এসেছে। আবার এও কথিত আছে রামজীদাসীর সরোদ বাজিয়ে লোকটিই নাকি এ পথে নিয়ে এসেছে। কোতয়াল মহাবীর সন্ন্যাসীকে কালকূটের আবার প্রশ্ন, রঘুনন্দনের কী হলো? কোতয়ালজী যেন বার বার রঘুনন্দনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে চলেছেন, তাঁর সমর্থন সবসময় রঘুর পক্ষে থেকেছে। তাঁর উত্তর—

> ''সে যে আমাকে পাখির গান শুনিয়ে গেল, সে যে আমাকে এক পাগল প্রেমের পথ দেখিয়ে গেল, সেই হলো আমার কাল। বাবুজী, আমি আর সন্ন্যাসী নই। ঘরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেছিলাম, পারিনি। সেই সহজ আর অসীমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাবি, সহজ আর অসীম, সে যে বুকের রসে মাথার ফুল ফোটানোর সাধনা। সে যে বড় যন্ত্রণার, বড় ব্যথার, মহা আনন্দের — কোনোটাই যে খুঁজে পাই নে।''[২২]

অবশেষে কোতয়ালজী বিদায় নিতে কালকূটের মনে হল, যেন কোন অতীত অধ্যায়ের পাতা তাঁর সামনে খুলে গিয়েছে। যে রক্তমাংসের উচ্চ-নীচ মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার, এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সে আওতার বাইরে। অধ্যাত্মবাদ না বুঝলেও, রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর প্রেম অনুমান করা যায়। যে প্রেম তাকে ঘরছাড়া করেছিল। আর উদয়াস্ত কলমপেষা মানুষের মন আচমকা একসময় রবীঠাকুরের গানের কলি গুনগুনিয়ে ওঠে—'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। মন উড়েছে উড়ুক না রে, মেলে দিয়ে গানের পাখনা।'

জানি, দিন যাবে না এমনি করে। মনের রঙিন পাখা মেলে থাকবে না দিবানিশি। তবু, জীবনযুদ্ধের মাঝে, এমনি করেই আমরা হৃদয়ের একটি দিক আঁকড়ে ধরে রয়েছি। হাজার দুঃখ যন্ত্রণা বেদনার মধ্যেও ওই বস্তুটি ছাড়তে রাজি নই। আসলে রঘুর সেই সহজ সুন্দরের উপাসনা, সকলের মনে মনে রয়েছে। নইলে মানুষ কেন বাউলের গান শুনে আনমনা হয়ে যায়। কালকূটের ভাষায়—

''বাউল তো আমাদের কাছে সাধক নয়। সে শিল্পী। মনের মানুষের খোঁজে সে ফিরছে। ফেরার আনন্দই তার কাছে বড়। সেই আনন্দে গান গেয়ে উঠছে, তার মনেরই মানুষ, 'আমি কী গান গা'ব যে ভেবে না পাই।' সে কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে আমরাও 'উঠি যে ফুকারি ফুকারি' ... বুঝলাম, বেদাশ্রিত সন্যাসী রঘু বাউল হয়েছিল।"[২৩]

সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কথা যেন বাউলের গান হয়ে উঠেছিল। লেখকের মনে হয় যেন বাউল বলরাম এর ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে।

প্রয়াগ যাত্রার সময় ফিরোজপুর এক্সপ্রেসে লেখকের সহযাত্রী ছিলো জন্মলুলা বলরাম। সে তার পরিচয় দিয়েছিলো 'মা-খেগো বলা' অর্থাৎ কিনা বলরাম। নবদ্বীপের কাছে আমঘাটার লক্ষীদাসীর আখড়ার মূল গায়েন হলো সে। প্রয়াগের হাতছানি তার শারীরিক বাঁধাকে অতিক্রম করে যেন তাকে ডাক দিয়েছে। সে তাই আর ঘরে বসে থাকতে পারে নি, পথে বেরিয়ে পড়েছে। বলে সে গলা ছেড়ে গান ধরে—

''অগো আইসবে বলে
পথের মাঝে জীবন কেটে গেল,
.....
সবুর-মেওয়া রইলো মাথায়,
চইলব এবার যথায় তথায়
.....।।"[২৪]

আর এই বলরাম মানুষের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না। তার বক্তব্য পা দুটো নেই ঠিকই, কিন্তু মানুষ তো! তাই মানুষ ছাড়া থাকতে পারে না। কালকূট যখন তাকে প্রশ্ন করে বৈষ্ণব হয়েও কেন সে বাউল গান করে। তখন তার অকপট স্বীকারোক্তি প্রয়াগে যাবার কথা শোনা ইস্তক মন বাউরা হয়েছে। পথে বেরিয়ে মন যেন পাখনা মেলে দিয়েছে। আসলে বৈরাগ্য এলেই মানুষ বৈরাগী হয়, আমরা সবাই বাউল। রাই-কিশোরী প্রেমে পাগল হয়ে পথে পা দিয়েছিলো সেও তো একই ব্যাপার।

লেখক জানেন পথের এই বলরামেরা এমনিতেই পাগল। তাদের খ্যাপালে আর রক্ষে নেই। কিন্তু, অন্ধসংস্কার বশেই কি বিকলাঙ্গ বলরাম এমনি নিয়ত হেসে গেয়ে মূর্তিমান

আনন্দের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। কুসংস্কারের এক চিমটি বেলুনে ঠাসা জীবন তো এ নয়। না থাকা ও না পাওয়ার বেদনা বলরামের প্রাণে তাড়া দিয়েছে। তাড়া দিয়েছে প্রেমসন্ধানের, ভালোবাসার। বলরাম ভালোবাসে জগৎ সংসারকে। তাই তো সে বলতে পারে— ''... পেরাগের সঙ্গমে কি আর হাঁড়ি ভরা মধু আসে? তা নেই। আছে অমর্ত। অমর্ত-কুম্ভ যে! সে-অমর্ত প্রেম-অমর্ত, ডুবলে পরান শীতল হবে।''[২৫] এমনকি ট্রেনের কামরায় মানুষের ঠাসাঠাসিতে তার কপাল ফেটে গেলেও আনন্দের স্বরে বলতে পারে—

> ''এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল। বাবা! এতক্ষণ এই কামরাটাতে বইসে মনে হচ্ছিল না যে পেরাগে যাচ্ছি। এইবার দেখেন তো, কেমন কলর-বলর গমগম কইরছে। ... বুইঝলেন বাবু, বলে মানুষ নিয়ে কথা। বেঁইচে আছি যদ্দিন, তদ্দিন মানুষ ছাড়া গতি নাই। একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয়! তবে মরণ ঘনাইলে অত কান্না কীসের, অ্যাঁ? ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো! আসুক, আরো আসুক। কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যি। নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ?''[২৬]

বলরামের কথার ফুল ফোটানো বাগানের সুগন্ধ নিতে নিতে লেখকের নীরস শহুরে বস্তুতান্ত্রিক মনকে যেন সে ভাসিয়ে নিয়ে চলে তার নিজের স্রোতে। লেখকের পথের ক্লান্তি, ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, সব ডুবিয়ে দিয়েছে সে। বিকলাঙ্গ বলরাম সমস্ত আড়ম্বর ও আবরণের ভেতর থেকে টেনে বের করে দেয় ভেতরের মনটাকে।

এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে বলরামের আমঘাটার লক্ষ্মীদাসীর সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়েছে। যার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। থানের উপর নামাবলী। পান-দোক্তা-খাওয়া ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়েছে। কালো ও স্থূল চেহারার কিন্তু কালো কালো ডাগর চোখ দুটি এখনও বালিকার মতো কৌতূহলিত ও নম্র। সে লেখককে নন্দগোপাল মাধবাচার্য বাবাজীর আশ্রমে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। এই লক্ষ্মীদাসীই বলরামের মনের মানুষ। শ্যামার কাছে কালকূটকে নিয়ে যাওয়ার আগে বলরাম ইঙ্গিত করে, গুরু ধরার বিষয়ে। বলরামের কথায়—

> ''গুরু না হইলে কি চলে? জন্ম থেইকে মরণ পর্যন্ত, গুরু আসে যায়, সকলে তো চিনা দেয় না। ...

গুরু বইলে ক্যারে পরনাম করিব মন।

তোর ভিতরে গুরু, বাইরে গুরু,

গুরু অগণন।”[২৭]

এই গুরু ঠিক না থাকলে, সব বেঠিক। কালকূট প্রশ্ন করেন, বলরাম তার গুরু করেছে কিনা। তখন সে জানায়—গুরু সেবা করে তার মনটা ভরেনি। কে সেই গুরু বলরামের কথায়, যে নিজে কেঁদে তাকে কাঁদায়। সে হলো তার লক্ষ্মীদাসী। বলরামের চোখের জলে কালকূট ডুব দিলেন। তাঁর অনেক, অনেক মুখ মনে পড়ছে। এক লক্ষ মানুষের মুখের মিছিল, আজ তারা মিলেমিশে একাকার। কত গুরু। পথে প্রান্তরে, কুটিরে বস্তিতে, ইমারতে ঘরে-অগণিত গুরুকে তিনি নমস্কার জানান। এ সংসারে হৃদয়ের রীতি বড় বিপরীত পথে ধায়। এক বিকলাঙ্গ মূল গায়েন যে এমনি করে একটি নারীর হৃদয় জুড়ে রয়েছে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। যে নারী তাকে সর্বক্ষণ আগলে আগলে রেখেছে। লক্ষ্মীদাসীর আশ্রমে রাধামাধবের প্রসাদ খেতে খেতে লেখকের মনে হয়—

> ‘‘না, বলরামকে আমি হিংসে করবো, সেকথা এ বিশ্বে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি বলি, ভাবতে পারি নি, বলরামের জীবনের চারপাশে নিরাপত্তার একটি সুরক্ষিত পাঁচিল আছে। তার খাওয়ায় পরায় আহারে বিহারে কোনো সযত্ন হাতের স্পর্শ থাকতে পারে, একথা মনে আসেনি, তাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম পথেরই ভিখারি, তারপরে আখড়ার মূল গায়েন। আজ আমরই এক পংক্তিতে সে আহারে বসেছে। আমার ঢাকা চোখের সামনে বিস্মিত মুক্ত প্রাঙ্গণ কে খুলে দিলে বুঝতে পারলাম না। লক্ষীদাসী, না বলরাম? হৃদয়াবেগ, ভক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় মিলেছিল বলরামের গানে ও কথায়। সে একদিক। আর এক দিক দেখিয়ে দিল তার লক্ষ্মীদাসী।”[২৮]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধনের নিগড়ে বলরামকে বেঁধে রাখতে পারেনি লক্ষ্মীদাসী। মেলায় শেষ দিনে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে মৃতদেহের স্তূপ জমে। সেখানেই বিশৃঙ্খলার ফলে বহু মানুষ পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। লক্ষ্মীদাসীর প্রেমাস্পদ বলরাম চিরতরে হারিয়ে যায়। লেখকের

অস্ফুট প্রশ্নের উত্তরে লক্ষীদাসী শান্ত গলায় জানায় সে অনেকবার একা পথে বেরিয়ে যেতে বারণ করেছে, কিন্তু সে যে চলে যাওয়ার জন্যই এসেছিল তাকে কেমন করে ফেরাবে। লক্ষ্মীদাসী একজন বৈষ্ণব চিতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কালকূট বুঝলেন, বলরাম নেই। বলরাম তার কথার ফুল বাগান নিয়ে প্রয়াগে এসেছিল। তার মালিনী ছিল লক্ষ্মীদাসী। এখন বাগান দগ্ধ হচ্ছে। বাগানের মালিনী ঠায় বসে আছে। লক্ষ্মীদাসী চিতার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে গেয়ে ওঠে, বলরামেরই গাওয়া গান— ''তুমি যেথায় আছো সেথায় আছি, আমার মিছা ভাবনা নাই মনে। তুমি ডাকলে, আপনি কপাট খোলে, তোমার বাতাসে বাতাসে তাল দিয়া নাচি।''[২৯] বিদায় লগ্নে প্যাসেঞ্জার গাড়ি যখন বর্ধমানে পৌঁছায় তখন লক্ষ্মীদাসী শেষবারের মতন চোখ বুঁজে তার মিষ্টি গলায় গেয়ে ওঠে—

''মনের আগুন কেউ দেখলো না।
তোমার বাঁশির সুরে বাতাস আগুন।
য্যাখন ত্যাখন আইসে ফাগুন।।
বাজাইয়ে ফিরলে বন্ধু,
আমার মন দেখলো না।''[৩০]

দু-চোখ দিয়ে নেমে আসে জলের ধারা। যেন মন্দিরের রাধারানী আজ মূল গায়েনের অভাবে নিজে গেয়ে কাঁদছে।

এই পটভূমিতে আরেকটি যে কাহিনি গড়ে ওঠে তা হলো লেখক ও শ্যামার মধ্যে। ব্যর্থ নারী জীবনের অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে শ্যামা এই প্রয়াগে তীর্থের পথে বেরিয়েছে। বিহারের একটি সম্পন্ন ভুঁইয়ার পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী হলো শ্যামা। পূর্ণ যুবতী শ্যামা তার তীব্র চাপা আগুন নিয়ে কীভাবে সে সতীনের সঙ্গে প্রৌঢ় স্বামীকে নিয়ে কুম্ভমেলায় এসেছে এবং তার মানসিকতায় তিক্ত পৃথিবীর বর্ণহীন আভিজাত্য তাকে কীভাবে কুরে কুরে শেষ করছে, তার প্রতি পাঠককে লেখক সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কৌলিন্য প্রথার শিকার অসংখ্য নারীর মধ্যে শ্যামাও একটি বঞ্চিতা নারী। যে নিষ্ঠুর প্রথা 'কুমারী' নাম ঘোচাবার জন্য একদিন সমাজকে কলঙ্কিত করেছিল। কালকূটের জিজ্ঞাসা, শ্যামার এমন কী বয়স হয়েছে যে তার কুমারীত্ব ঘোচাবার জন্য এক বৃদ্ধের অঙ্কশায়িনী হতে হয়? অথচ তাই হয়েছে। তাই হয়তো শ্যামার বৈধব্যের কথা জানার পরও লেখকের মধ্যে

কোন আন্তরিক আবেগ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। তবে অধিকাংশ ভুঁইয়া পরিবারের অর্থের অভাব নেই। হয়ত বা শ্যামার মতো মেয়েদের সান্ত্বনা সেইটুকুই। পথ চলার পরিচয়ে শ্যামার সঙ্গে কালকূটের খানিকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। শ্যামা বাইরে থেকে যতটা নিজের চঞ্চলতা প্রকাশ করে তার দ্বিগুণ ভেতরে চাপা আর্তনাদ কাজ করে। মেলাপ্রাঙ্গণে বলরামই প্রথম লেখককে নিয়ে শ্যামার তাঁবুতে হাজির করে। সেই মুহূর্তে একটি চাপা খিলখিল হাসি হঠাৎ বেজে উঠে কুহক বিস্তার করে। প্রথম পরিচয়ের দিনে শ্যামার এই অনর্গল হাসির ঢেউয়ের মধ্যে লেখক এক বন্দী বিহঙ্গের পাখা-ঝাপটা-খাওয়া শব্দ শুনেছিলেন। আর দুর্গকোলে, যমুনা তীরের জ্যোৎস্না ভরা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রে ব্যথা ও যন্ত্রণার এক নতুন হাসির কুহকজাল ঘিরে আনন্দময়ের রূপে ফুটে উঠেছিল। কালকূটের মনের সামাজিকতা, ভব্যতা, লোকলজ্জা শ্যামার সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ হলেও তাঁর মনে হয়েছে ওই বোধগুলি আপাতত বিবেকের আড়াল করতে হবে। লেখকের কথায়—

> ''মনে করেছিলাম,পথে বেরিয়েছি, লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়। ... কিন্তু যে আছে আমার রক্তধারায় ... শ্যামার কথায় বসতে গিয়ে যদি কোনো বেদনাদায়ক অপমান নিয়ে ফিরতে হয়, আমার চলার পথের ধূলায় তো ফেলে রেখে যাব। যদি না পারি, তবু জানি, জীবন-মনের পলিতে একদিন তা ঢাকা পড়ে যাবে।''[৩১]

শ্যামা ও লেখকের এই সময়ের মনের যে অব্যক্ত ভাব তা বলরামের চাপা গুনগুন স্বরে ফুটে ওঠে—

> ''কত কথা ছিল মনে
> আজ মনে বাহির হইল না,
> সখী, একি দায়, সময় যায়,
> বুক ফাটিয়ে মুখ খুইল্ল না।।''[৩২]

শ্যামার সঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতা কালকূট গোপন করেননি। তাঁর মনে হয়েছে যে—শ্যামা স্বৈরিণী নয়। সে কুলীন ভুঁইহার ঘরের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ! হৃদয়ে তার বহু বজ্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রয়েছে চাপা। উৎসবের রাত্রে তা খোলা আকাশের বুকে বহু রঙের আলোর ঝাড়ে হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠতে চায়। উৎসবের বাসর রচনা করতে চায় সর্বত্র, জীবনের

বিড়ম্বনার অন্ধকারে। তাই এ সমাজের সব পরিবেশেই সে ভিন্ন ও বিচিত্র। আর একটি দিনে জনবিরল গঙ্গার ধারে শ্যামার সঙ্গে দেখা হওয়ার চিত্রে, শ্যামা পরেছে লাল টকটকে শাড়ি, হাস্যময়ী শ্যামার চোখে বহতা যমুনা। সে অসংকোচের নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে নিভৃতে তার হৃদয়ের কিছু কথা লেখকের কাছে নিবেদন করেছে। আর লেখক দেখলেন—

> ''... শ্যামার লাল শাড়ি নীল হয়ে উঠলো। ও যে ব্যথার রঙ। যমুনার কারসাজি। যমুনাতীরের বাঁশি কবে লোক লজ্জা মেনেছে! সে যে চিরদিন কলঙ্কের ফোঁটা কপালে দিয়ে হাসিয়েছে কাঁদিয়েছে। শুধু মিতালী! শ্যামা আমার মিত্রাণী। মনে মনে কোনো অস্বীকৃতি ছিল না। প্রকাশ্যে লজ্জা ছিল, সে-বাঁধও ভাঙাল। তাকিয়ে দেখি, সেই দুরন্ত মেয়ে কী অসহায়! ডাকলাম, শ্যামা!''[৩৩]

তারপরে শ্যামার কথা মতো প্রায় প্রতিদিন দেখা হয়েছে। শুধু ঘাটে নয়, নাগাবাসুকির মন্দিরে, দারাগঞ্জের বেণীমাধবের স্থানে, অড়হরের ক্ষেতের ধারে। বলরাম ছিল সব সময়। প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়াও সঙ্গে ছিল দু-একবার। ফেরার সময়ে যখন ট্রেনের কামরায় দেখা হয়, তখন শ্যামার বিধবার বেশ। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর নেই, কপালে নেই টিপ। চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও বেদনা। আর ছিল চাপা সুখের একটি নিগূঢ় ছাপ। কিন্তু বৈধব্যের যন্ত্রণার ছাপ কোথায় যেন আড়াল পড়ে যায়। পাটনায় ট্রেন বদলের সময় শেষবারের মতো তার হৃদয়ের কথা বলতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার আকাঙ্ক্ষা শুধু লেখকের স্মৃতিতে বেঁচে থাকার, তাই তো বলে—'এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?' শেষ পর্যন্ত শ্যামাকে বিদায় দিতে হল। কালকূটের সেই মুহূর্তে অনেক কথা মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। কিন্তু শ্যামাকে আর কিছুই বলা হয় না। যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল প্ল্যাটফর্মের ওপর, নতুন বিধবা শুধু অন্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

কালকূট কোনরকম ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ভ্রমণে বের হননি, কিংবা কোনো প্রথাগত ভ্রমণ কাহিনিও লেখেননি। আসলে কালকূট ভ্রমণে নয়, বেরিয়েছিলেন পরিভ্রমণে। ফলে তাঁর মনটি ছিল বাউলের কিন্তু হৃদয় ছিল গৃহীর। তাঁর পরিভ্রমণ সবসময় হয়ে উঠেছে সত্যান্বেষী বিহার। অজস্র কৌতূহল নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা। এই সত্যান্বেষণের মধ্যেই রয়েছে কালকূটের নিজস্ব বিশেষত্ব, আপন ধর্ম। মানুষের মধ্যেই অমৃত সন্ধানী কালকূট মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার,

জীবন জিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই অমৃতের পরশ খুঁজে ফিরেছেন। আসলে কালকূটের অমৃত কুম্ভ প্রয়াগে নেই, আছে মানুষের জীবনসত্যে। তিনি মানুষের মন-প্রয়াগে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে নেমেছিলেন। ফলে সারাজীবন সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য মানুষের বাইরের আবরণ সরিয়ে দিয়ে অমৃতরূপ সত্যের সন্ধানে বেড়িয়েছিলেন। এই কারণে প্রয়াগের কুম্ভমেলাতেই তাঁর—'অমৃত সন্ধানে'র অনুসন্ধিৎসা শেষ হয়ে যায় না, বাকি জীবনেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কেননা এই অমৃত সন্ধানই পার্থিব মরণশীল মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা। এই সংস্কারান্ধ মনের প্রতি কালকূটের গভীর দৃষ্টি পাঠককে সচকিত করে তোলে। এমনকি তাদের জীবন দর্শনের প্রতি কালকূটের সত্যান্বেষী মন সদা জাগ্রত। হাওড়ায় ট্রেনে উঠে যাত্রা শুরু করা থেকে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত তাঁর এই মন সক্রিয় ছিল। এজন্য প্রয়াগ থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় কালকূটের মনে অসংখ্য বিচিত্র প্রকৃতির পুণ্যার্থী মানুষদের মুখ ভিড় করে আসে তাঁর জিজ্ঞাসা অমৃতের সন্ধানে গিয়েছিলাম কিন্তু কী নিয়ে ফিরে এলাম যেদিকেই তিনি তাকান সেই দিকটাই বড় ভারী হয়ে ওঠে। সকলের কথা, একে একে মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর অমৃতের সন্ধান এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তীর্থ ফেরৎ পুণ্যার্থীকে পা ধুইয়ে দিতে হয় বলে বুড়ি অবলা বাগদিনী কালকূটের পায়ে এক কলসী জল ঢেলে দেয়। এজন্য লেখক তাঁর অসমাপ্ত যাত্রার কথা বলে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র ইতি টেনে দিয়েছেন— ''যাত্রার শেষ কোথায়? ঘরের কাছে এসে অবলা বাগদিনী আমাকে নতুন অমৃত সন্ধানের জলধারা দিল পায়ে। সন্ধানের শেষ কোথা?''[৩৪] আর এই সন্ধানেই কালকূটের পথ চলা।

কোথায় পাব তারে : (১৯৬৮)

এই উপন্যাসটি লেখকের অন্যতম গ্রন্থ। অরূপের অন্বেষণে বিভিন্ন জনপদে লেখকের পরিক্রমা। সমগ্র কালকূট রচনাবলীতে লেখক মোট আটটি তীর্থ নামাঙ্কিত স্থানে গিয়েছেন, যদিও পুরীর পটভূমিকে আবর্ত করে অন্যরকম কাহিনি বিস্তারিত হয়েছে, তীর্থ দর্শন এক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে বাকি সাতটি তীর্থস্থানের মধ্যে প্রায় পাঁচটি তীর্থ স্থানই রয়েছে বীরভূমে এবং এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে আমরা এই গ্রন্থের আলোচনায় পাই।

এই গ্রন্থটি ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও কালকূটের এই বৃহত্তম রচনাটি পূর্বেই 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে

প্রকাশ হয়। কালকূট গ্রন্থটিকে 'স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে' উৎসর্গ করেন।

'দেশ' পত্রিকায় 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর ১৯৬০ (২১ ফাল্গুন, ১৩৬৬) সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হলো কালকূটের একটি নাতিদীর্ঘ রচনা 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে'। কেঁদুলির জয়দেব মেলার পটভূমিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত হয়। এই কেঁদুলির মেলার বাউলদের সাহচর্যই তাঁকে পরবর্তীকালে 'কোথায় পাব তারে' উপন্যাসটি লিখতে মূল প্রেরণা দেয়। সুতরাং সেই অর্থে 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' রচনাটিকে 'কোথায় পাব তারে' নামক বৃহত্তম গ্রন্থটির মুখবন্ধ বলা চলে। কারণ যদি পাঠ করা হয় লক্ষ করা যাবে এই রচনার বিষয়টির সঙ্গে 'কোথায় পাব তারে' লেখাটির পূর্ব কথন-এ অনেকটা বক্তব্য গত সাদৃশ্য রয়েছে। 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' বা 'কোথায় পাব তারে' —এই দুটোরই নামকরণের মধ্যেই সুপ্ত বাউল ভাবনার বীজকে আমরা পাই। 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' — উপন্যাসে পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের পাটে বাউল সমাবেশে কালকূটও উপস্থিত হয়েছেন। বাউলের এই মিলন মেলা বহুকাল ধরেই চলে আসছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' সেই মানুষকেই বাউলের খুঁজে ফেরার চেষ্টা। কিন্তু সেই মানুষ কে? বাউলের কথায়—সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা। বাউলের কাছে লেখকের প্রশ্ন, কেমন করে সেই মানুষকে পাওয়া যায়? পাওয়া যায় সহজ সাধনে, সহজ ভজনে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের প্রেমে। এই প্রেম তত্ত্বই মূলত বাউল সাধনার একমাত্র অন্বিষ্ট বস্তু। যার সূচনা পাই 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' আর গভীর ব্যাখ্যা পাই 'কোথায় পাব তারে' গ্রন্থে। এখানে বাউলের ব্যাখ্যা এই রকম—

> ''... যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী। নারী আর পুরুষের প্রেমে। তাই রূপ নেই, সে অরূপ। তার ভাষা নেই সে অনির্বচনীয়। সে শুধু অনুভবের স্পন্দন। এই সহজ সাধন 'রোচক পূরক স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন।' কিন্তু 'সে নদী অত্যন্ত গভীর, আচে কামরূপী কুম্ভীর।' 'কুল কুণ্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে, প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে।''[৩৫]

বাউল চলে সহজিয়া মতে, 'মাটির দেহ মাটিতে মিশায়।' তাদের গানের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ গৌর নিতাই শুধু মাত্র তত্ত্বকথার প্রতীক। তার দেবতা নেই, নেই কোনো মূর্তি। কেঁদুলির

বটের তলায় জ্যোৎস্নার আলো আঁধারে, অজয়ের নিশি পাওয়া বালুচরে ও স্রোতের ধারায়, উপযুক্ত স্থান ও পাত্র-পাত্রীর মুখ থেকে বাউল গান শুনে কালকূটের মনে হয় এমন গান শহরে তিনি অনেক শুনেছেন ঠিকই কিন্তু এমনটা নয়, যার মাধুর্য অন্যরকম। যদিও এই মাধুর্যের অন্য দিকে যে করুণ রূপ রয়েছে তাকে কালকূট বিস্মৃত হন নি। বাউলরা একদিন ছিল অনেকখানি নিয়ে, কিন্তু আগামী দিনে হয়তো বা আর থাকবে না। তাদের গুহ্যতত্ত্ব থাকবে মানুষের স্বভাব বিকাশে। আর থাকবে মানুষের নিজেকে খোঁজার জ্বালা মানুষ নিজেকে খুঁজবে। মানুষের মধ্যেই অপরূপ রূপ দর্শন হবে বাউল যেদিন থাকবে না, সেইদিনও।

'কোথায় পাব তারে' — উপন্যাসটি কোনো নির্দিষ্ট পটভূমি বা কোনো বিশেষ সময় ও স্থানের বর্ণনায় রচিত হয়নি। বরং বলা যায় লেখক এখানে এক মেলা থেকে অন্য মেলা বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বিচরণ করেছেন। তাঁর সহজ সাবলীল বর্ণনায় উঠে এসেছে নদীর মতন বন্ধনহীন মানুষজন, কালকূটের পূর্ববঙ্গের বাল্যস্মৃতি সেখান থেকে তাঁর অরূপের খোঁজ শুরু হয়, এবং সেই আকুলতার মধ্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র বর্ণময় সব রূপ ফুটে উঠতে থাকে। চরিত্ররা হয়ে ওঠে জীবন্ত।

ইছামতি পার হতে গিয়ে অধরমাঝির নৌকোয় মামুদ গাজীর সঙ্গে লেখকের দেখা হয়ে যায়। সে লেখককে জিগ্যেস করে কী কাজে এদিকে এসেছেন? লেখকের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের কথা সূত্রে বাল্য স্মৃতির বর্ণনা আসে। কৈশোরের নৌকা ভ্রমণের অচিন আনন্দের স্মৃতি। আজও সেই অকারণ আনন্দের খোঁজে চলেছেন তিনি। কৈশোরের রূপের তৃষ্ণা হয়েছে অরূপের আকুতি। এই মামুদ গাজী তার আলখাল্লা উড়িয়ে তিন চার পাক দিয়ে গানের শেষে ডুপকিতে টোকা দিয়ে, ঘুঙুর বাজিয়ে, কোমর দুলিয়ে গান গায়—

''তারে দেখা পাবার আশে,
কত করি খুঁজি বেড়াই দেশে-বিদেশে। ...
এমন ব্যথার ব্যথী কেহ নেই।
এখন মনের মানুষ কোথা পাই।
ওহে দেল্ ...।''[৩৬]

সংসারের প্রথাগত খোপের থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ পারাবারে এসে দাঁড়ায় যে গাজী, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কালকূটেরও যেন বলতে ইচ্ছা করে— ''অধরকে ধরবো বলে, দড়ায় বাঁধা পড়েছি।

এখন আপন ধরা, বেজায় কড়া, এমন মরা মরেছি।”[৩৭] কিসের সন্ধানে লেখক হন্যে হয়ে ফেরেন তার হদিস মেলে না, তবু অন্ধকার নিরালায় মনে হয় কী এক রতন যেন রূপ সাগরে দোলা দেয়। খুঁজে পাবার জিনিস তো সে নয় বরং অ-খোঁজে দেখা দিয়ে যায়। সেই তো পরম ধন, যাকে আবিষ্কার করতে লেখক পাড়ি দেন। এই আশাতেই তাঁর ঘরের বাইরে পথ চলা। লেখকের মনে হয়— ‘‘সহসা, এই অন্ধকার বিজন নিশীথে যেন কার আবির্ভাব ঘটে। আমি দেখতে পাই না, অনুভব করি। চোখের ঝাপসায়, হাত জোড় হয়ে আসে বুকে। নিজের কথা, নিজের বুকে কান পেতে শুনি, এই মানুষে, সেই মানুষ আছে। তাকে নমস্কার।”[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই রাঢ়ের মাটিতে কাটিয়েছেন। কালকূট রাঢ়ভূমিতে বসবাস না করেও উদাসী বাউল বোষ্টমীদের মতো চিনেছিলেন এই প্রকৃতি আর তার সংলগ্ন মানুষকে। প্রয়াগের মহাকুম্ভে ছুটে যাওয়া সেই কারণেই, গিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণরূপ দিতে চান। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর ভারতযাত্রা যা ‘কোথায় পাব তারে’ সৃষ্টি করে। এর পরেও রচিত হয় আরো অসম্ভব সব উপন্যাস। যার লিখন প্রক্রিয়া, আঙ্গিক একেবারেই আলাদা। কালকূট সর্বদাই মানুষকে অন্বেষণ করেছেন। নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন কৈশোর থেকেই তাঁর এই রূপের তৃষ্ণা। আজও তাঁর দুচোখ ভরা তৃষ্ণা। কিসের খোঁজে তিনি বেরিয়েছেন নিজেই বুঝে উঠতে পারেননা। এ একরকম অনির্বাচনীয় উপলব্ধি যার জন্যে অকারণে চোখে জল আসে। পুচ্ছ নাচানো একটা পাখিকে নিজের মধ্যে দেখেন তিনি। আপন বাসা ছেড়ে যে অসীমে যেতে চায়। লেখক তার ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ লেখায় বলেছিলেন মানুষ দেখতে চলেছেন, মানুষ থেকে মানুষের অন্তর সত্তাকে দেখেছেন আর ‘কোথায় পাব তারে’তে এসে বলছেন অরূপের নাম যদি ‘মনের মানুষ’ দিই তবে কেমন হয়। তাঁর ‘কোথায় পাব তারে’—গ্রন্থ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> ‘‘নদী, প্রান্তর, স্রোতের চলিষ্ণুতা এবং লাল কাঁকরের স্তব্ধতা সর্বত্র সঞ্চরমান একটি পথ-পাগল পথিকের বিচিত্র মাধুকরী ফুটে উঠেছে। কোনো ভারতখ্যাত তীর্থভূমি বা কোনো ইতিহাস কীর্তিত পুরাভূমি এখানে লেখকের লক্ষ্য ছিল না। বরং বাংলার নিজস্ব বাউলের মতো এ-মেলা থেকে সে-মেলা, আন্-গাঁয়ে, ভিন্-গাঁয়ে—পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে, সেই ধুলোয় ধূসর হতে হতে এগিয়ে চলাই ছিল

লেখকের ইচ্ছা। প্রথমার্ধের নদীতে ফুটে উঠল নদীর মতোই বন্ধনরহিত মানুষের মনের ছবি। চোখের জলের খোঁজ তারা রাখে না—নদীর জলে সব ধুয়ে যায়। এক নদী বয় মাটিতে, আরেক নদী বয় মনে। কালকূট দুই নদীতেই অবগাঢ় হয়েছেন। এর চেয়ে বড় তীর্থ আর তাঁর কাছে নেই। সেই তীর্থ বারি তিনি অঞ্জলিবদ্ধ করেছেন 'কোথায় পাবো তারে' গ্রন্থে।"[৩৯]

ভারতবর্ষের আত্মার গভীরে প্রোথিত যে অধ্যাত্ম সুর তা বহু মানুষের উৎসর্গীকৃত প্রাণের শক্তির সঙ্গে এক হয়ে রয়েছে। এই একীভূত মূল সুরকেই কালকূট অন্বেষণ করে ফেরেন। যা তাঁর আত্মানুসন্ধানে মিলেমিশে যায়। তাঁর ভিতরের এই আর্তির প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে বাউলের উদার মুক্ত প্রাণের ডাক। যার পরিণতি স্বরূপ আমরা পাঠকরা বৈষ্ণব বাউল তত্ত্বের একাত্মতায় একটি অখণ্ড মানবতত্ত্ব 'কোথায় পাব তারে' গ্রন্থে পাই। এই গ্রন্থে এক গুচ্ছ বাউল চরিত্রের সঙ্গে বাউল আসরের কিছু চিত্র লেখক এঁকেছেন। তিনি উপন্যাসে সুনিপুণ ভাবে বাউলবৃত্তের চরিত্রগুলির সঙ্গে নাগরিকবৃত্তের চরিত্রগুলিকে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ফলে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় গোপিদাস, রাধা, গোকুল, বিন্দু, সুজন, অন্য দিকে অচিনদা, ঝিনি, এরা প্রত্যেকেই যেন একই পরিবারভুক্ত হয়ে উঠেছে। বাউল যে অরূপের সন্ধানী সেই অরূপ ভাবনা এদের মধ্যে মুখ্য। 'বাউল' মতাদর্শ হল পথ। লেখক নাগরিক ভাবনার অপসারণ ঘটিয়ে মুখ্য করে তুলেছেন বাউল ভাবনাকে। যেমন অচিন চরিত্রটির মধ্যে শহুরে ছাপ মুছে গিয়ে জীবনের শোকে বাউল ভাবনায় উত্তীর্ণ হতে দেখি। অন্যদিকে গোপীদাসের প্রকৃতি যেমন রাধা, গোকুলের যেমন বিন্দু, নয়নতারা যেমন গাজীর প্রকৃতি তেমনি সামঞ্জস্য রেখে ঝিনি যেন কালকূটের প্রকৃতি। এখানে পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঘটনা লক্ষ করে মনে হয় অন্তরে বাউল কালকূট যেন তাঁর আপন প্রকৃতি সন্ধানে ঝিনি চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন।

এই উপন্যাসের বক্তাপাত্রটি পেশায় হলেন কলকাতার এক লেখক। পরিচিতির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে অচেনা অজানার উদ্দেশ্যে তাঁর পথ চলা। জীবন সত্যকে অনুসন্ধানের এক অমোঘ আকর্ষণ, সেই উপলব্ধিইকেই আমরা সমগ্র উপন্যাসে অনুভব করি। অজানা পথ চলাতে লেখক কখনো বিচার করেন না যে এদের সঙ্গে তাঁর কোথায় কিসের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি শুধু দেখেন কত বিচিত্র এই মানুষের মিছিল। যার মধ্যে লেখক অনুভব করেন

নানা বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনজিজ্ঞাসা ও নানা ভাবের খেলা বহমান। সেই স্রোতেই তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেন এবং এই ভাবেই কখনো বা অপরিচিত মানুষের মধ্যে খুঁজে পান অনন্ত অধর সেই মানুষকে।

কালকূটের যাত্রা শুরু ইছামতির ঘাট থেকে। শুরুতেই লেখকের অজানা পথের সঙ্গী হিসাবে মামুদ গাজীর আবির্ভাব। যার দিন দুনিয়ার কারবার চলে মুরশেদের নাম নিয়ে, মুরশেদের নামের মজদুরি করে। গাজীর মুখ গোঁফ দাড়িতে ভর্তি, ফাটাফুটি চৌচির, যেন আদ্যিকালের মুখটি। বালা পরা হাতের চেহারাও তেমনি, যত ফাটার দাগ, তত শির। তবে এই চৌচির মুখের চোখ দুটি যেন ইছামতীর রোদ লাগা চলন্তা জলের মতো। ছোট ফাঁদে কালো তারা কেবলই নড়ে চড়ে, ঝিলিক মারে, কত ভাবের খেলা খেলে যায়। দরবেশের গলাটা বেশ ভরাট, ইছামতীর বুকে গেয়ে ওঠে—'আমি ছিলাম কোন্‌খানে, আমারে আনলে কোনজনে।' দরবেশের গানটি লেখককে নিয়ে যায় অন্যজগতে যেন তিনিও তাঁরই অজান্তে গানের এই কলিটি শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। গাজীর পাশে পাশে, ইছামতীর ধারের গাঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেখকের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ঢাকা শহরের একরামপুরে দশ বছরের ছোট্ট ছেলেটি মায়ের পায়ের কাছে বই নামিয়ে দিয়েই অনেক দূরে বুড়ি গঙ্গায় ডিঙি বেয়ে চলে যেতো। বড়োদের কাছে শাস্তি জুটলেও তার চোখে সবসময় থেকে যায় বুড়িগঙ্গার ঢেউ। সে নিজেও জানে না কী আছে সেখানে, কীসের খোঁজে বারবার সে সেখানে ছুটে যায়। সেই ছেলেটিই যেন আজও লেখকের রক্তে, প্রাণে, মন জুড়ে বসে আছে। গাজীর উৎসুক প্রশ্ন, আপনি কোথায় বেড়িয়েছেন, কিসের খোঁজে? এর উত্তর যেমন সেই ছোট্ট ছেলেটির জানা ছিল না তেমনি লেখকেরও জানা নেই। শুধু সেই ছেলেটির চোখ জোড়া ছিল রূপের তৃষ্ণা, বুড়িগঙ্গার রূপ, ওপারের রূপ। তাঁর জানা নেই কিসের সেই খোঁজ, সেই অরূপের নামই বা কী। যেন তিনি অনেক কাল হলো বেড়িয়েছেন, চলেছেন কালান্তরের পথে। লেখক মনে করেন মানুষ আর প্রকৃতির রূপের হাটকে যদি অরূপ নাম দেওয়া হয় তাহলে মনের মানুষ ঠিক কেমন হয়, যার উত্তরে কেবল বলতে হয়—কোন্ মানুষে, সেই মানুষ আছে থাকে কোথায়! চলে কোন্ আজবের কলে। উদাসী গাজীর গানও এই এক কথা বলে ওঠে — ''যার তরেতে মন ভুলেছে/আমারে বলবে কে সে কোথা আছে/তারে না দেখে যে হিয়া ফাটে সদা মন তাপে জ্বলে যাই।/মনের মানুষ কোথা পাই।''[৪০] বুড়িগঙ্গা, ইটিণ্ডা, হাসনাবাদ প্রভৃতি

পটভূমির রূপান্তরের মাঝখানে যে পথিক পথে নেমেছে তার কাছে কোনো পট-ই মানুষ অপেক্ষা বিশেষ নয়। কালকূট তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদের বুঝতে চাইলেন, এবং এই দেখার গভীরতায় লেখক আপন সত্বাকে খুঁজতে চাইলেন। চেনা পরিবেশে হাঁফিয়ে ওঠা জটিল প্রাণটা বাধাহীন দিগন্তের সামনে অথই হয়ে পড়ে, তাকে আর ধরে রাখা যায় না—

> ''পুচ্ছ নাচানো একটা পাখি যেন নিজের মধ্যেও দেখি। আপন বাসা ছেড়ে যে অসীমে যেতে চায়, প্রাণ অথৈ হয়ে পড়ে। ... দিগন্তজোড়া রূপের মাঝে তাকে ধরে রাখতে পারি না। নিজের গলার গুনগুনানি চেপে রাখতে পারি না। এ অনুভূতির নাম কী, কে জানে। এ সবুজের কাজলমাখা স্বপ্ন কিনা কে জানে। মনে হয়, কার সোহাগের দুটি হাত যেন জড়িয়ে নেয় বুকে। তার কোমল উত্তাপের সকল তৃপ্তি যেন সহসা আমার চোখের জলে গলে আসতে চায়। আর অবাক হয়ে শুনি, গাজীরই প্রতিধ্বনি আমার অস্ফুট গলায়, 'যার তরে মন খেদে প্রাণো কান্দে সর্বদাই'...।''[৪১]

গাজীর সঙ্গে অধর মাঝির নৌকোয় চড়ে দু'পাশের জীবন পরিবেশ দেখতে দেখতে তাঁর মনের ভিতর অপরিসীম কৌতূহল জন্ম নেয়। লেখকের বর্ণনা কুশলতার গুণে অচেনা অজানা ইটিণ্ডা, হাসনাবাদ, ইছামতী নদী এবং স্মৃতি থেকে বলা কদমতলা, নারিন্দার পুল, গ্যাণ্ডাইরা, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি একে একে পাঠকের চোখের সামনে। সজীব হয়ে উঠতে থাকে।

'কোথায় পাব তারে' গ্রন্থের শুরুতেই যে চরিত্রের বর্ণনা পাই সে হলো দরবেশ মামুদ গাজী। চরিত্রটি একটু ব্যতিক্রমী। অপরিচয়ের পর্দা সরে যেতে ক্রমে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আসল মানুষটি। প্রতিনিয়ত আমাদের চেনা চারপাশে এমন অনেক আত্মভোলা অচেনাকে আমরা এড়িয়ে চলি। তাদের আত্মভোলা আত্মপর উদাসীনতা উপেক্ষা করি বা এই উদাসীনতা আমাদের বিদ্ধ করে না। অথচ তার মধ্যেই এক আশ্চর্য জীবনবোধ লুকিয়ে থাকে। গাজি তেমনই এক চরিত্র। যার সম্বন্ধে লেখকের মনে হয় এই যুগের বাতাস ওর প্রাণে কি তুফান তোলে না! আমরা যখন প্রতি পদে পদে জীবন-মরণের প্রশ্নে হোঁচট খাই তখন এই আলখাল্লা উড়িয়ে মুখের হাসি এমন অটুট রেখে ঝলকায় কেমন করে! ধরা ছোঁয়ার বাইরে যদিও, তবু যেন কিসের এক স্পর্ধায় মত্ত থাকে। আমাদের জীবনস্রোতের আঁকাবাঁকায় যেন

কিছুই যায় আসে না ওর। গাজীর সঙ্গে আলাপচারিতায় কাহিনি এগিয়ে চলে, নানান মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, সখ্যতা বাড়ে, আবার যে যার গন্তব্যে চলে যায়। গাজী লেখকের সঙ্গ ছাড়ে না। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কালকূট তাঁর অস্তিত্বের উন্মোচনে বিস্ময়বোধ করেন। গাজীর কথা তাঁর ভিতরে বাজতে থাকে। মুহূর্তে রাঙা সন্ধ্যা, ধানকাটা মাঠ, দূর দিগন্ত ঠেকে থাকা আকাশ, কত নরনারী, যাদের মাঝখানে থেকে মনে পড়ে না কিসের সন্ধানে তাঁর ফেরা। তাঁর সেই ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে যায়। যখন 'আমার আমিত্বে আজকের কোনো পরিচয় লেখা হয়নি।' অথচ বারে বারে মনে হয় সেই আমিকে কোনদিন ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গাজীটা কে! লেখকের ভাষায়—

> ''ও যেন সবই ভিতর থেকে দেখে। ও কি আমার জন্মলগ্নের সাক্ষী! ও কি চিরদিন ধরে চেনে আমাকে! ও কি সেই মাঝি নাকি, যে আমাকে নিয়ে এসেছিল বুড়িগঙ্গার মোহানা থেকে! ও কি ধলেশ্বরী তীরের চর লত্‌বদী গ্রামের সেই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু, যিনি একবার আমার চিবুক তুলে ধরে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন! গায়ের গেরুয়া দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলেন, পারেননি কেবল চোখের কূলের বিস্ময় আর কৌতূহল মুছিয়ে দিতে।''[৪২]

লেখকের শৈশবস্মৃতি আবারও এখানে উঁকি দিচ্ছে। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে মিশে থাকা অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গগুলি তাঁর রচনার ভিতর ঢুকে পড়তে থাকে। পশ্চাদপটে ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে দীর্ঘ বৃত্তান্ত। কাদিশালের খালের ধারে পশ্চিমপাড়ার গোরাই দত্তের বিস্ময়কর কাহিনি, ইন্দির, কুতুদাসের জীবনকথা, ধলেশ্বরী নদীতীরের সিরাজদিঘার মানুষজনের কথা, লত্‌বদীর চর, সাধু, পিসিমা, বুড়িগঙ্গা, সলিমা, নানীবুড়ি প্রভৃতি বহুব্যাপ্ত জীবনাভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো ছবি পাঠককে মুগ্ধ করে তোলে। এইসব চিত্রে মানুষের জীবন, তার সুখ-দুঃখ, নানান ওঠা-নামা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবকিছুকে তুলে ধরাই শিল্পীর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সাধারণের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে কালকূটের রচনায় গাঁথা হয়ে যায় বহু বিচিত্র জীবনাট্যের নানা রূপ। ফলে শুধুমাত্র কোন একক কাহিনি গড়ে ওঠে না, পাশাপাশি মূল কাহিনির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রেখে জন্ম নেয় টুকরো টুকরো উপ-কাহিনি।

হাসনাবাদের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ডাংসা নদীপটে ভিন্ পুরুষ ও ভিন্ নারীর সমাবেশ।

যেমন—হেডমাস্টার ব্রহ্মনারায়ণ, তাঁর একমাত্র কন্যা ঝিনি, মাহাতো চাচা, আঙরি, নারাণ ঠাকুর, ফোঁচা-ফোঁচার বৌ, দুলি প্রভৃতির চালচিত্র লেখক আন্তরিকতায় তুলে ধরেন। এই আন্তরিকতা আরো মধুর হয়ে ওঠে যখন মামুদ গাজি গেয়ে ওঠে— ''সব লোকে কয়, তুমি কী জাত সংসারে। আমি কই, জেতের কী রূপ দেখলাম না নজরে। সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান। বামণ চিনি পৈতার প্রমাণ, বামনী চিনি কী ধরে।''[৪৩] গাজির গাওয়া লালন ফকিরের গানগুলিতে ধরা পড়ে এক বৃহত্তর জীবনবোধ যা কালকূটের বুকেও স্পন্দিত হয়ে ওঠে—

> ''এ গান কে বাঁধে, কেন বাঁধে। কী যেন বলে, কী এক অচিন কথা। মনে করি, ধরতে পারি, তবু অধরা। গলা খুলে, কথা বলে, সুরে গাওয়া হলো যেন সদর দরজা হাট। আর এক দরজা ভিতরে, বন্ধ দরজা। হাতড়ে ফিরি, খুঁজে পাই না। হয়তো আছে কোনো তত্ত্ব পর্দায় ঢাকা। থাকুক, তবু যেন, বেরিয়ে পড়া ঘরছাড়াকে, আর একবার ঘরছাড়া করালো গাজী। দিগন্ত চলে যায়, চরাচর হারায়। নিজের মধ্যে আর্তরব, কোথায় যাই, কেন যাই, কিসের সন্ধানে। ইচ্ছা করে, আমিও ধরি, 'পারলাম না রে চিনিতে'।...''[৪৪]

গাজীর কণ্ঠে আর্তরব হয়ে বাজে—

> ''(ভোলা মন) এই মানুষে আছে রে মন—
> যারে কয় মানুষ রতন
> ক্ষ্যাপা কয় পেয়ে সে ধন
> পারলাম না রে চিনিতে।''[৪৫]

কালকূটের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গাজী তার সব গানেতেই এক কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুনগুনায়। গাজী এক কথার মানুষ। তার জাত নেই, ঈশ্বর নেই, খোদা নেই। তার আছে 'একমেবা দ্বিতীয়ম্', মনের মানুষ। কখনো সে মুরশেদ, কখনো দীনদরদি। এ ধর্মের নাম কী, কে বা সেই মনের মানুষ, মুরশেদ আর দীনদরদি কে। এরপর ধূলামলিন বেশে, মুরশেদের নামের মজদুর গাজী চুপিসারে বাউলের গূঢ় গুপ্ত কথা শোনাতে থাকে। গাজী বলে, ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর। সেই রসের মানুষ যখন পালাবে পড়ে থাকবে শুধুই ঘর। —এই ঘরেতে সব আছে। কালকূটের কাছে এসব কেমন হেঁয়ালি লাগে। গাজী

বলতে থাকে, যিনি মুরশেদ তিনি গুরু। গুরু সত্য, মুরশেদ সত্য। গুরু এদের সব পথ দেখিয়ে দেন, নিয়ে যান অধরা সেই মনের মানুষের কাছে। এই দেহভাণ্ডের ঘরে যার অবস্থান, তার রূপ নেই, সে হল নিরাকার। গাজীর গানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

''কেউ বলে তুমি রাম, থাকো পুবে, আর
পশ্চিমে আলী।
তবে কেন হিদয়সুরে খালি। ওহে দীনদরদী—
কেউ জানে না, তুমি মনের মানুষ, মনে অবস্থানো।''[৪৬]

এদের না আছে মন্ত্র-তন্ত্র, জপ-তপ, জাতিপাতি, খানাপিনার বারণ। সবমিলিয়ে বলতে হয় এদের কোন কিছুতেই বারণ নেই। গাজীর এই তত্ত্বকথা শুনে লেখকের মনে হয় এদের সব কিছু বোঝা যায় না কারণ ভারতবর্ষ একে নেই, বহুতে তার প্রকাশ। সব কিছু তার বোঝা যাবে এমন আশা না করাই ভালো। একবার মনে হয় এরা নিরীশ্বরবাদের কথা বলে। আবার মনে হয়, এর নাম রহস্যবাদ। রহস্য যাই থাকুক, মূলকথা হলো মানুষ সে যেমন হোক, গাজীর ধর্মে, সে আছে সব-কিছুতে। গাজী তার নিজের কথা নিজের ঢঙে বলে চলে। সংসারে তার কাছে সব থেকে বড় হল মানুষ। সবার বড় এই মানুষ, যার দুই ভাগ, নর আর নারী, মরদ আর আওরত। গাজীর কথায় এই সংসার করতে হলে যেমন মিয়াবিবি ছাড়া হয় না, তেমনি মনের মানুষ পেতে হলে এই দুজনার যোগ চাই। সংসারে মিয়া-বিবি, আর এখানে পুরুষ-প্রকৃতি। মিয়াবিবি সংসারে নিয়মের স্রোতে চলে আর পুরুষ-প্রকৃতি চলে উজানে। যা ভীষণ কঠিন, এর জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। সন্তান হলেই তা সাধকের কাছে পতন চিহ্নিত করে। আলাপচারিতায় উঠে আসে বসিরহাট শহরের ধারের বাসিন্দা গাজীরও এক প্রকৃতি রয়েছে। যার সঙ্গে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলায় গাজীর সাক্ষাৎ হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের বারো তারিখে পীর গোরাচাঁদের মেলা হয়। পীর আবার গোরাচাঁদ। পীরের দরগায় গিয়ে হিন্দু সিন্নি দেয়। মুসলমানে গোরা ভজে। বিদ্যেধরী নদীর তীরে সেই হাড়োয়ার মেলায় প্রকৃতি নয়নাতারার সঙ্গে গাজীর দেখা হয়। গানেরই গুণে, না কী গুণ হওয়ার গুণে, কে জানে, সারাদিনের দেখাদেখি, সাঁঝবেলাতে প্রকৃতি একেবারে হাত ধরে জীবনসঙ্গিনী।

মানুষের ছবি অঙ্কনে কালকূট সবসময়ই উৎসাহী। বাইরের থেকে ভেতরের, জীবনের অতলকে স্পর্শ করাই তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল লক্ষ্য। লেখক তাঁর গ্রন্থের প্রথম অংশে জীবননাট্যের

নানা বিভঙ্গ তুলে ধরার পাশাপাশি বেশি করে তুলে ধরেছেন রঙ্গ-রসিকতা ও পরিহাসকে। যা তাঁর বিচিত্র বর্ণনার গুণে সজীব হয়ে ওঠে। 'কোথায় পাব তারে' গ্রন্থের কাহিনি বৃত্তের অঙ্গীকারেই রচিত হয়েছে ছোট ছোট প্রেমবৃত্ত। প্রেমবৃত্তের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— অচিন্ত্য-নীরজা বৃত্ত, ধনু-তিপু বৃত্ত, অনন্ত দুলি বৃত্ত, নারান ঠাকুর, ফোঁচার স্ত্রী সন্তানহীন মাহাতো দম্পতি, বিন্দু গোকুল-সুজন, যোগোমতী-কার্তিক বৃত্ত। এই অসংখ্য প্রেমবৃত্ত যেন কালকূট ও ঝিনির প্রেমকে একটি মান্যতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই যুক্ত হয়েছে। অন্য গল্পগুলির পাশাপাশি কালকূট খুব সুনিনিপুণ ভাবে ঝিনির মনের বিবর্তনকে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেছেন।

গাজীর সঙ্গে হাসনাবাদ যাওয়ার পথে লঞ্চের ফার্স্ট ক্লাসে লেখকের পরিচয় হয়ে যায় হেডমাস্টার ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী সহ তাঁর স্ত্রী ও ফিলজফি পড়া শহুরে কন্যা ঝিনি ওরফে অলকার সঙ্গে। কালকূট একটা কথা প্রায়ই বলেছেন যে, মানুষের মতো বিচিত্র কিছু নেই, অতএব মানুষকে পুরোপুরি চেনার অহংকার না করাই ভালো। তাঁর বহু উপন্যাসগুলিতে এমন কিছু বিপরীতধর্মী চরিত্র এঁকেছেন যাদের বাইরেটা কর্কশ কিন্তু তার ভেতরে একেবারে ভিন্ন রূপ ঝলকায়। এমনই এক চরিত্র অবসর প্রাপ্ত হেডমাস্টারমশাই ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী। ঝিনির সঙ্গে এখানেই প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত। ব্রহ্মনারায়ণ যেমন পেশায় হেডমাস্টার তেমনি ব্যবহারেও পুরোদস্তুর কড়া, হাঁকডাক তার লেগেই রয়েছে। কখনো মেয়েকে ডাকনামে ডেকে অস্বস্তিতে ফেলছেন তো কখনো নিজের ফেলে আসা বিবাহের স্মৃতিকে ভিন্ পরিচয়ের লোকের সামনে তুলে ধরে স্ত্রীকে লজ্জায় ফেলছেন। আবার কালকূটের আত্মপরিচয়, পেশা, কোথায় যাওয়া হবে ইত্যাদি খুঁটিয় খুঁটিয়ে তথ্য নিয়েছেন, এমনকী গাজীর মতো অপরিচিতের সঙ্গ নেওয়ায় তিনি এই ভিন্ যাত্রীর কাণ্ডজ্ঞান হীনতায় অবাক হয়ে যান। কালকূট লেখালেখি করেন শুনে তা নিয়েও ব্রহ্মনারায়ণের পরিহাস কিছু কম নয়। শেষ পর্যন্ত অবাক মানেন যে একমাত্র তিনি ছাড়া স্ত্রী ও কন্যা দুজনেই এঁর লেখা পড়েছেন। গাজীর গানে মুগ্ধ হয়ে ঝিনি তাকে এক টাকা দিলে, ব্রহ্মনারায়ণ তাকে ধমক দিয়েছেন অথচ আবার এই রাশভারী মাস্টারমশাই নিজে, লঞ্চ থেকে নামার সময় গাজীকে তার গান শোনানোর পাওনা স্বরূপ একটি সিকি দিয়েছেন। আর এই এক সিকিতেই লেখক যেন কড়া হেডমাস্টারমশাই ব্রহ্মনারায়ণের ষোলো আনা দেখতে পান। তাই আবারও মনে হয় মানুষকে চেনার বড়াই না

করা ভাল। গাজী বলে —

> ''কোন্‌খান দিয়ে কী গলে, তা বলা-কওয়া যায় না। দেখেন দি নি, বুড়া বাবু কেমন ঝকর মকর করে। আর আমি বলি কিনা — যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা। কি গুনাহ্‌ দেখেন দি'নি। মুরশেদের পাঁচ পয়জার পড়ুক আমার পিঠে।''[৪৭]

কালীনগর গঞ্জ থেকে ফেরৎ পথে আবারও এই পরিবারটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কথাবার্তার সূত্র ধরে ক্রমশঃ রাশভারী ব্রহ্মনারায়ণের মধ্য হতে যেন আরেক মানুষ বেরিয়ে আসতে থাকে। তিনি আসলে লেখককে ছেলের মতো ভাবেন বলেই সারাক্ষণ লেখককে নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন। হেঁকো-ডেকো হাসকুটে মাস্টারমশাই যিনি নিহত আত্মজের ঘা নিয়ে বেড়াচ্ছেন, বাইরে থেকে একবারও তা বোঝার উপায় নেই। তিনি বলেন তাঁর একমাত্র এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা ছেলে বীরুকে তারই প্রিয় এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বন্ধু হেনরি ওয়াইলডেভ ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল কারণ, দুজনে এক স্থানে চাকরি করলেও একসময় হেনরিকে ছাপিয়ে বীরুর একটা লিফটের সুযোগ আসে। হেনরির সেটা সহ্য হয়নি, তাই এই ঘটনা। যার পরিণামে হেনরি জেল খাটছে। ব্রহ্মনারায়ণের মনে হয় তাতেই বা কী সান্ত্বনা! মানুষের যেমন মন! কখন কী করে বোঝা দায়। তিনি অনায়াসে, স্থির গলায় জীবনের এত বড় দুর্ঘটনার কথা বলে চলেন। এ সব ছাপিয়ে লেখকের মনে জেগে ওঠে—

> ''সেই এক অরূপরতন, চোখেতে তার রূপ দেখি না। তবু দেখি, কোথায় যেন এক রূপের ঝোরা ঝরে যায়। রতন বলে ঝিলিক হানা বস্তু নিয়ে ঠুঙ -ঠুঙ বাজিয়ে ঝোলায় ভরি না। তবু আমার ঝোলা ভরে যায়। ... অরূপরতনের একটা নাম দিতে চাও, দাও—মানুষ। অরূপরতনের আরো অনেক নাম। তার আর এক নাম বলো, প্রাণ। বলো, মন।''[৪৮]

কালীনগরে নোনা মাটির বুকে পথ চলতে চলতে লেখক শুধু প্রকৃতির বর্ণনা করেন নি বরং একেবারে মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে থাকা মানুষের প্রাত্যহিক অভাব, অনটনকেও তাঁর কলমের আঁচড়ে সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনের রুক্ষ বাস্তব থেকে তিনি গভীর জীবন দর্শনকে দেখাতে চেয়েছেন। সব মিলিয়ে তিনি যেন এক ভিন্‌ জগতে এসেছেন। নতুন

ছবি, নতুন সমাচার। যদিও এখানে শহরের ঝিলিক, ঠাঁটবাট কিছুই নেই। তবুও এ সাজসজ্জা তাঁর কাছে অনেক দিনের চেনা মনে হয়। পূর্ববঙ্গে দেখার পাশাপাশি এই ছবিতে যেন শত শতাব্দীর অতীত কথা কয়। এই গঞ্জের হাটে যেন নিজেকে দেখা যায়। আধুনিকতার মধ্যে দূর কালের এক চেনাচেনি। যা নতুনের স্বাদে আস্বাদিত।

নোনা মাটির দেশে লেখকের নজরে আসে ভালোবাসার অমোঘ টান যা সামাজিক নিয়মকেও তোয়াক্কা করে না। অনন্ত পাল আর এক বারোবাসরের দুলি, সমাজ যাদের অবৈধ ঘোষণা করেছে, নিষিদ্ধ বলেছে। বারবধূ যে ছেলেকে ভালবেসেছে তার জন্য বিয়ের পাত্রী খোঁজা চলছে, এই ভালোবাসাকে সমাজ কখনও স্বীকৃতি দেবে না। সেই দুলির জন্যেই লেখকের অনুভব— ''সমাজ আছে, অনাদি-অনন্তে। মনকে বলি, আমাকে তুমি এই ক্ষণে সামাজিক হতে ব'লো না। দুলির পরাজয়ের মাঝখানে যে মন বিরাজ করে, চোখের জল পড়ে, তার শরিক কর। আজ আমার সেই মনেতে বসতো, সেই মনেতে ভাসি।"[৪৯] অবস্থাপন্ন অনাদি পালের ভাই কালীনগর গঞ্জের বারো বাসরের মেয়ে দুলির প্রেমে মত্ত। কিন্তু হাটের দশজনের সামনে বড় দাদার মান রাখতে অনন্ত মনের মানুষ দুলিকে অবজ্ঞা করে। আর এরই জেরে সৃষ্ট ঝগড়া শেষ পর্যন্ত গাজীর অনুমান মতো মধ্যরাত্রেই মিটে যায়। পাজী গাজীর মুখে অন্তরের গভীর কথা প্রকাশ পায়, লেখকের কথায় এ যেন রস-দরিয়ার পাকা মাঝি। গাজী হেঁ হেঁ করে হেসে বলে—

> ''আমি বলবো কেন বাবু। আজই রাতের বেলায় আবার যার জিনিস তার ঘরে আসবে, তখন মান ভঞ্জের পালা। তারপরেতে একেবারে ভাব সম্মিলন। ... অই বাবু ঘরের বলেন, হাটের বলেন, সব মেয়ে মানুষের এক কথা— হেঁই, জগতে তোমার কাছে আমি বড়, না বাপ-দাদা বড়? দুলিরও সেই কথা। মেয়ে মানুষ কে বলতে লাগবে— রাই তুমি ছাড়া কী ছাই জগৎ আছে!"[৫০]

আর লেখকের মনে হয় সংসারে এমন ঘটনা নিত্য অহরহ ঘটে কিন্তু তা সংসারে ঘটে। তবে সংসারের সীমান্তে, যেখানে সকলই নিষিদ্ধ, অচ্ছুৎ সেখানেও যে এমন সাংসারিক লীলা ঘটে, তা তাঁর জানা ছিল না। সংসার আর সংসারের সীমান্ত, দুয়েতেই মন একাকার। সবখানে সেই এক মানুষ, এক সমান। এই ভাবেই মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিতে একাত্ম হতে হতে লেখকের পথ চলা। এর পরে আরেকটি বৃত্ত গড়ে ওঠে কালীনগর গঞ্জের মহামায়া হিন্দু

হোটেলে। হোটেলের মালিক নারান ঠাকুর এবং তার দোকানের কর্মচারী ফোঁচা ও ফোঁচার স্ত্রী, এই তিনজনকে নিয়ে। হিন্দু হোটেলটি গোলপাতার ছাউনি তলায় এক ভোজনাগার, হাটের মানুষ আসে চলে যায়। কিন্তু এর এক রূপেতে কত রূপ, এ যেন এক মঞ্চ। দিনে এক পালা আবার, অন্য সময় আরেক পালা। হোটেল মালিক নিঃসন্তান, তিনি রাত্রে ফোঁচার স্ত্রীর সঙ্গ করেন। কিন্তু তার ছেলেগুলো ফোঁচাকে বাবা ডাকে আর তাকে ডাকে কত্তা। অর্থাৎ কিনা, মহাজন পাচক নারান ঠাকুর প্রেমিক নাগর, দাসী প্রেমিকা আর ফোঁচা আয়ান। কিন্তু অতবড় দশাসই চেহারার ফোঁচা ডিগডিগে চেহারার ঠাকুরের সামনে কেমন যেন নিঃস্তেজ হয়ে থাকে। তার কথা ভাবতে গিয়ে লেখকের কেমন যেন—

> ‘‘... বুকের কাছে হঠাৎ কেমন ফিক লেগে যায়। চোখ পিটপিটানো,
> তামা-রঙ সেই প্রকাণ্ড মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ...
> কোন্ কুলেতে জন্ম তার, কোন্ দেশেতে বিয়ে! কোন্ ঘরের বালা
> তার ঘরনী হয়েছে! সেই ঘরণীর প্রাণের ঘরে কোথায় আছে তার
> ঠাঁই! এই জীবনের দরিয়া তার কোন্ প্রবাহে চলে!’’[৫১]

তবে বৃথা জিজ্ঞাসা, কোন্ কাব্য পুরাণ কবেই বা আয়ান মন কথার সংবাদ দিয়েছে। কে জানে, ফোঁচার প্রাণে বৌ এর অনুভূতির বোধ কত গভীরে, কতটুকুই বা তার তরঙ্গ ওঠে, কিছুই জানা নেই। বাইরে থেকে আমরা রূপ দেখি মাত্র, অরূপকে দেখার মন কোথায়। তাই কে জানে, ফোঁচা নামক লোকটির প্রাণে ফুল কোথায় ফোটে, কোথায় ঝরে যায়! ডিগডিগে শরীরের নারান ঠাকুরকে শুধুমাত্র প্রেমিক নাগর বললে বড় মিথ্যে বলা হয় কেননা তার ভিতর জীবের মধ্যে যে মহৎ সেই পিতৃদেবের অবস্থান। যা রূপেতে নয় অরূপেতে ধরা পড়ে। নাম যাদের ফোঁচার ছেলে, তাদের বাঘের মতো আগলে থাকে নারাণঠাকুর। আসলে রক্তের টান বলে একটা কথা আছে তো! তাই বোধহয় মানুষের আসলকে চেনা হলে আর রূপের ধন্দ থাকে না।

সুন্দরবনের নোনা গাঙের কূলে, দিগন্ত জোড়া মাঠের মাঝে, বেচাকেনার হাটের ধারে একেবারে ভিন্ন পরিবেশে, অচেনা মানুষ জনের ভাষার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে লেখক তাঁর প্রগাঢ় দরদ দিয়ে স্পর্শ করে যান। জীবনের হাটে বাজারে আনাগোনা করা গড়পরতা সাধারণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে জীবনোপলব্ধি, প্রাণের টান, আলাপচারিতার

সুর, সুখ-হাসি-কান্নার মিশেল, তা লেখকের সংলাপের ভিতর দিয়ে অতি যত্ন সহকারে ফুটে ওঠে।

আরেকটি ক্ষুদ্র কাহিনি আমরা পেয়ে যাই নারাণ ঠাকুরের হোটেলে। সেখানেই এক নিঃসন্তান দম্পতির সুখ-দুঃখে পূর্ণ জীবননাট্যের পরিচয় মেলে। মাহাতো চাচার তিন নম্বর ঘরণী হলো আঙুর অর্থাৎ আঙরী। মাহাতোর প্রথমা স্ত্রী অসুখে মারা গেছে, দ্বিতীয়ার নাকি চরণ দুখানি ছিল বড় চঞ্চল অর্থাৎ কুলত্যাগিনী হয়েছে। এরপর থেকেই মাহাতো চাচার চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আকালের সময় পেটের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে একদল মজুরানী বাদায় আসতে থাকে। চাচার গোলায় তখন ধান, সবাই হাত পেতে থাকে পেটের জ্বালায়, তখন সব আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। তাই ক্ষুধার্ত ঝি-বউদের ধান দিত মাহাতো, শোধ নেবার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। আসলে মাহাতোর প্রাণে ছিল ঘা, দ্বিতীয় স্ত্রী আঘাটায় যাওয়ার ঘা, সেই তার ব্যামো। শোধ নিতে চেয়েছিল এইসব নিরপরাধ মেরে। শেষে ঘা শুকালো এই নয়া চাচীকে পেয়ে, যে এসে ঘরের শ্রী ফিরিয়ে আনে। তবে সে বিয়ে করা বৌ নয়। লেখকের চোখের সামনে মাহাতো আর আঙ্‌রি ভেসে ওঠে। তাঁর মনে হয়—

> ''বিবাহের চেয়ে মানুষ বড়। মানুষের জীবন ধর্ম বড়। মানুষকে কি কেবল সাত পাকেই বাঁধা যায়? ... মরা কি আর মন্ত্রে জাগে? প্রাণের ধিকিধিকি চাই। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে সব আছে। তার চেয়ে বল, আঙরি হলো আরোগ্যের ওষুধ। শাঁখের শব্দে, বাজনা বাজিয়ে, কপালে কুলোর ছোঁয়ায় আঙ্‌রি স্বামী ঘর করতে আসেনি। প্রাণের দায়ে দিশেহারা হয়ে এসেছিল। একে বলে আগমন।''[৫২]

এই আঙুর আবার ঘরে ডাকাত পড়লে মা দুর্গার মতোই দুষ্টের দমন করেছে। আঙরি তার শূন্য ঘরের দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য মা-বাপ মরা চাঁপাকে নিজের কাছে এনে মানুষ করেছে। আঙরি ভালো না মন্দ, সে ভাবনা লেখকের মনে আসে না বরং ভাবতে থাকেন—

> ''ভাবি, সাহিত্যের থেকে জীবন কত বড়! তুমি যখন কলম নিয়ে ভাবো, কলম নিয়ে রচো, তখন তোমার বিধিবিধান সামঞ্জস্য যুক্তি কলমের চালে চলে। জীবন তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর, বিচিত্রতর। সে এমনি অমানিত, যুক্তিতে অথই। সে কোন কিছুর অধীন নয়।

এই অধর অথই কে সাধনা কর কলমের হিজিবিজি কেটে। ... আঙ্‌রি সেখানে নেই। সে তোমার মন ভুলানো নিটোল গল্পে বাঁধা নয়। ... কেবল তার সেই মুখখানির সঙ্গে মাহাতোর কথাগুলো কানে বাজে, ভগবান তোর মনের মতন করি সোম্‌সার গড়ে নাই। যাকে তোর ভালো লাগে, তাকেই তুই ধরি রাখতি চাস...।"[৫৩]

সব কিছুই এমন চকিত আর আঁকাবাঁকা, অন্তঃস্রোতের সব প্রবাহ নজর করা সম্ভব হয় না। তবু সব মিলিয়ে লেখকের মনে যেন ধন্দ লাগে কারণ তিনি মাহাতোর শ্রেণি বুঝতে ভুল করেছেন। গাজীর ভাষায়, যার ঘরে লক্ষ্মী সবসময় বাঁধা থাকে। অথচ এই রকম একজন ধনী যার ময়লা কাপড়ের বন্ধনীতে সেকালের সোনার ঘড়ির দেখা মেলে, সে কি না একেবারেই সাধারণ পোষাকে নোনা গাঙের এক সস্তা দরের হোটেলের বারান্দায় বসে। যে লোক কৃষি ট্যাক্স দেয় চল্লিশ হাজার টাকা, সেই লোক কিনা সস্ত্রীক বিড়ি টানতে টানতে মোটর বাসে করে তারকেশ্বর থেকে আসে। আবার গাজীর কাছে বসে কাঁদে বংশধরের ক্ষুধায়, লাল চোখ দুটি তার জলে ভেসে যায় না বরং চোখের জলের থেকেও তার কান্না যেন আরোও গভীর। জলের ধারার মধ্য দিয়ে যাতনা থেকে যে মুক্তি সেটুকুও যেন তার নেই। এই ব্যথা লেখকও যেন অনুভব করেন এবং অবাক হয়ে যান এই ভেবে—

"... এই লোককে তুমি কেবল কৃপণ ভাববে নাকি। না কি, ভারতের এ আর এক রূপ। হয়তো সাবেকি রূপ। লক্ষ টাকা কৃষিতে বাঁধা, তবু আপন সমাজ পরিবার বেশবাস আচরণবিধির এদিক-ওদিক নেই। ধূলায় চলে, ধুলোয় বসে, রাস্তায় কাঁদে। দূরের এই বাজার গঞ্জে, না জেনে পথ, অচিন খোঁজে, এইটুকুও দেখা জানা পাওনা ছিল আমার।"[৫৪]

বারোই ফাল্গুন হাড়োয়ার মেলায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ নিয়ে গাজীকে বিদায় দিয়ে কালকূটের যাত্রা আবার অন্য পথে। প্রতিমূহূর্তে কেবল বাইরের হাতছানি লেখককে আনমনা করে তোলে। ঘরেতে মন থাকে না কেবলই ছটফট, ফাপর ফাপর লাগে তাই আগল একটু খোলা পেলেই ঝোলা কাঁধে দে দৌড়। যেন, কোথা থেকে এক বাঁশির গান মনকে আনমনা করে তোলে। সবকিছুর মধ্যেই যেন মনে হয় 'তবু ভরিল না।' কে জানে সেই নামহীন অচিনের কী নাম,

কোথায় সন্ধান, প্রাণে থেকে যায় এই আফসোস 'শূন্য মাঝারে।' আর সেই কারণেই বেরিয়ে পড়া, চলো যাই, কী মেলে কিম্বা মেলে কিনা কিছু। এবারে ভ্রমণের পথ একটু ঘোরালো, গন্তব্য হলো ছাতিমতলার মেলায়, পৌষ সেখানে ডাক দিয়েছে। যেখানে রয়েছে মহাঋষির স্মৃতিতীর্থ, উপাসকের আশ্রম, সেখানে আছে বটতলা, যেখানে ঋষি সূর্যোদয় দেখতেন। ঋষি যেদিন দীক্ষা নিয়েছিলেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেইদিন তাঁর জন্মান্তর, জন্মান্তরের সেই দিনটিই সাতই পৌষ স্মরণোৎসব হিসেবে পালিত হয়। গেরুয়া রঙে ছোপানো বীরভূমের মাটি তার সঙ্গে দেখতে পাবে ঋষিপুত্রের তিল তিল করে গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়। যা এক কীর্তিমানের কর্ম তার মর্মের কথা আলাদা। মহর্ষির ধ্যানের মধ্যে সেই মরমের জন্ম, যে মরমের ধ্যানের কথা আমরা শুনতে পাই গানের সুরে। সেই মরমিয়ার ব্যাকুল চাওয়া, ধ্যানের চাওয়া, অরূপরতন, তাঁর নিজের কোনদিন মিলেছিল কিনা, কে জানে। আলো আলো বলে এই আর্তরবের অন্ধকারে তাঁর চোখের তীরে কখনো আলো জেগেছিল কিনা, কে জানে। কিন্তু আমাদের হাত ভরে গিয়েছে সোনায় সোনায়। অরূপরতনের কাব্যবিতানের মালিকায় যা গাঁথা। মহর্ষির তীর্থে, মরমীর থানে, কর্মীর বিশ্বলোকের প্রাঙ্গণে তাই এতো আনাগোনা। সমস্ত প্রাণ যেন এক অনুভূতিতে মিলিত হতে আসে। উপলক্ষ, মহর্ষির দীক্ষাদিনের সাতুই পৌষ। ছাতিমতলার যাত্রাটা তাঁর সোজাসুজি হয়নি বরং ঘুরপথে সাঁওতাল পরগণা হয়ে তবে বীরভূমের লালমাটির পথে তাঁর পরিক্রমা। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশের সুনিপুণ বর্ণনা, বীরভূমের মানুষজন, সাঁওতাল পাড়ার সাপ খেলা, ছাতিমতলার অনুভূতি ইত্যাদির পাশাপাশি মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বাউলের জীবনদর্শন, গান তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

লেখকের ভ্রমণ পথে নানান কাহিনি বৃত্তের সমাবেশ ঘটে। যেখানে দেখা মেলে বিচিত্র সব চরিত্রের। তাদের প্রত্যেকের জীবনের স্বতন্ত্র গল্পের চমক লেখককে বিস্মিত করে কখনো বা অভিভূত করে। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পথে এমনই এক চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। নাম অতুল দাস, রেলের লোকো শেডের ক্লিনার, দরিদ্র পরিবারের কর্তা। সে যাত্রাদলে অভিনয় করে স্টেজে সিরাজদ্দৌলা সাজে, কিন্তু শিল্পীর সে কদর বর্তমানে আর নেই। যাত্রাগান তেমন আর চলে না। তবু ডাক পেলে সে ছুটে যায়। ভেতরের আক্ষেপ তখন চাপা পড়ে প্রকৃত শিল্পীর কাছে। অতুল দাস বলে—

''বুঝেন তো, যা দিনকাল, তাতে আর যাত্রা গানে চলে না। অই

> যদ্দিন বে-থা না করা যায়, ছেলেপিলে না হয়, তদ্দিন চলে ... শিল্পীর জীবনধারণের তাগিদ। কোথায় লোকের মনোহরণ করবে, না রেলের লোকো শেডোর এঞ্জিনে জাম ছাড়াতে হচ্ছে। ভাত বড় ব্যাজ, কোনো জাত রাখে না।"[৫৫]

অতুলদাসের আমন্ত্রণে নয়-ই পৌষ লেখক যাত্রা দেখতে যান সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পরিচয় সূত্রে অচিনদার বাহিনী, যে বাহিনীতে ঝিনি রাধা লিলি ছাড়াও, নীরেনদা আর সুপর্ণাদি। আসরের সামনে বাদক দলের সঙ্গে শতরঞ্চিতে বসার ব্যবস্থা করে দেয় স্বয়ং অতুলদাস। যাত্রাপালায় অতুলদাস একাই একশো। যাত্রা দেখার আনন্দের মধ্যেও লেখকের মন বেদনায় টাটিয়ে ওঠে। যাত্রায় অভিনীত সিরাজ চরিত্রের মৃত্যুর আর্তনাদের মধ্যে লেখক যেন শিল্পী অতুল দাসের যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখেন। যার একদিকে সংসারের ক্ষুধা অন্যদিকে শিল্পী সত্তার মরিয়া প্রচেষ্টা। লেখকের মনে হয় অতুল দাস খাঁটি শিল্পী। যাকে সংসার দমিয়ে রাখতে পারে নি।

আর তাই পালা শেষে প্রকৃত এই শিল্পী সত্তাকে সম্মান জানাতে লেখক দশ টাকার সাম্মানিক দিতে ভোলেন না। লেখকের মতোই পাঠককেও নিরুপায় শিল্পী জীবনের বিষাদঘনতা আবিষ্ট করে তোলে। আর এখানেই লেখক এই চরিত্রকে সফল রূপদান করতে সক্ষম। এমন চরিত্র তাঁর পথ চলার মাঝেই খুঁজে পান। যে চরিত্রগুলি আমাদের ভীষণ কাছের, চেনা অথচ তেমন করে আমরা এদের চিনতে পারি না। লোকো শেডের ক্লিনার অতুল দাস এমন শিল্পী যে হার মানে না। ভাঙাচোরা মুখখানি কামিয়ে, চোখের কাজলের সূক্ষ্ম প্রলেপ দিয়ে। দানার ভাবনা পিছনে রেখে, শিল্পী আসরে নামে। ক্লিনার কেবল পেটে বাঁচে। শিল্পী বাঁচে অধরায়। তার ধরা ছোঁয়া অনেক দূরে, যখন ভাববে, এই মানুষে সেই মানুষ আছে।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার যাত্রাপথে চলন্ত ট্রেন থেকে শীতের রাঢ়ভূমির লাল রঙা বিকেলকে দেখে লেখকের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মলুটি বা মৌলীক্ষা গ্রাম। কয়েক বছর আগে বীরভূমের লাল মাটির দেশে কালীপূজার নিমন্ত্রণ পেয়ে ছিলেন এক সম্পন্ন গৃহস্থ বড় রায়ের ঘরে। ইনি মলুটি রাজ্যের রাজাদের ছয় তরফের, বড় তরফের বড় কর্তা। বড় কর্তা রায় মশাইয়ের কাছ থেকে শোনা মৌলীক্ষা হলেন দেবী। রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী। মা মৌলীক্ষা রাজবংশের দেবী, গ্রাম্য দেবীও তিনি। এই মৌলীক্ষা হলেন তান্ত্রিক দেবী। মৌলীক্ষা থেকেই

গ্রামের নাম হয় মলুটি। এমনই নানান কিংবদন্তীর দেশ এই মলুটি। যার কিছুটা বড় রায়ের কাছ থেকে শুনতে শুনতে গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। লেখককে রক্তমৃত্তিকার রাঢ়ে সেই প্রথম গমনে যেন স্বপ্নে পেয়েছিল, তাঁর পথে পথে ফেরার দিশায় মলুটি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল রাঢ়ের এক রূপকথার দেশে। সেখানে মাত্র কয়েকদিনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। দেখেছেন পুজোর রাতে অনবরত বলির মধ্য দিয়ে উদ্দাম ঢাকের আওয়াজে উৎসব পালন করার রীতি। আর পরের রাতে বিসর্জনের সময় নীল আকাশের নীচে গণমিলনের আসর। উৎসবের রাতে ঢাকের বাজনায়, রক্তে, নৃত্যে, উল্লাসে, সময় সেখানে বাঁধা পড়েছিল। ভদ্রাভদ্র, সকলের এক দশা। এই অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে লেখক দুটি কাহিনি বৃত্ত রচনা করেন। সুষি নামে এক দরিদ্র তরুণীর একাকী জীবন ও অন্যদিকে ধনু তিপুর প্রণয় কাহিনি। চর্তুদশীর অমানিশায় যেখানে সর্বত্র উৎসবের মেজাজ, পূজা-দালানে উল্লাস, বাজনা, পশুর চিৎকার সেখানে সুষি একা অন্ধকারে, নিরালা নির্জনে, উৎসবের আসর ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকে। বলি দেখতে তার ভালো লাগে না। লেখকের মনে হয় মলুটিতে এ যেন নতুন কথা! নতুন সুর, নতুন ভাব! অন্যদিকে যেখানে কালী পূজার উৎসবের সঙ্গে ধনু-তিপুর প্রণয়ও সমান তালে চলেছে। যেমন চলেছে রাগ-অভিমানের পালা তেমনি উৎসবের রাতে ঘরের নিচে অন্ধকারে চলে মান ভঞ্জনের পালা। লেখক একদিকে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রণয় চিত্র চিত্রণ করেন তেমনি সুষির চরিত্রে আমরা বৌদ্ধ দর্শনের অহিংসার নীতি অনুভব করি। লেখক যখন তাঁর উপলব্ধিতে ঘরের নিচে, অন্ধকারে ফুটিয়ে তোলেন 'দেহিপদ পল্লব মুদারম্'-এর সুর, আর ওপরে 'শ্রীমতি নামে সে দাসী'-র চিত্র রক্তের ধূলায় যে অহিংসার সাহসে কাঁদে। মলুটির পথে পথে রক্ত শুকোবার আগেই বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছিল। মলুটির রূপ বদলে যাচ্ছিল। নাচ, গান, সাপ খেলা আর ঢাকের দগরে কালীর জয়ধ্বনি। সঙ্গে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের মত্ত মিছিল। মাদলের বোল, বাঁশির কাঁপানো সুর, সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের নাচ, গানের সুর, সব মিলিয়ে লেখককে তাঁর চির পরিচিত জগৎ থেকে বহু দূরে নিয়ে ফেলছিল। তারপরে তাঁর চেতনার শেষ রেশটুকুও মুছে গিয়ে দেখেন প্রকৃতি ও পুরুষের নিরাবরণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া, উন্মুক্ত আকাশের নিচে। তাঁর মনে হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। যা লেখককে শুধু মাত্র চোখের সীমায় আটকে রাখেনি, দৃষ্টির ওপারের অসীমে, বিস্ময় শিহরণ ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল অচেতন

চেতনার ঘোরে। মৌলীক্ষার মাঠের আঁধারে গণমিলনের আসর দেখে তাঁর মনে হয় মৌলীক্ষার মন্দিরের গায়ে তখন যেন পুরাণের নর নারীরা একই অনুষ্ঠানে লিপ্ত। সকলের এক প্রার্থনা, এক আত্মদান। লেখকের উপলব্ধি ধরিত্রীর বুকে কৃষিকাজের তাৎপর্যে উন্নীত হয়ে যায়। যার উদ্ধৃতি স্বরূপ—

> ''উৎসব যা কিছু কর, ওহে মানুষ, ধরিত্রী উর্বরা হোক, সেই তোমার পূজা। পূজার আচার অনুষ্ঠান, যা কিছু সকলই সৃষ্টির ক্রিয়ায়। যে-ক্রিয়া বৃষ্টিধারার অনুকরণে বীজ বপণের ভঙ্গিতে, মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রবেশের অক্লান্ত আনন্দ শ্রমের প্রক্রিয়ায়। সে-ই তার আদিম কামনা, ধরিত্রী তুমি গর্ভবতী হও, শস্য দাও। যে মতো তোমার ক্রিয়া, সেই মতো আমার অনুষ্ঠান। হে মা, সেই অনুষ্ঠানে আমি সন্তান উৎপাদন করি। ... ওপরে অসীম আকাশ, নিচে গণমিলনের আসর ... সকলের এক প্রার্থনা।''[৫৬]

বোলপুর স্টেশনে এসে লেখকের চমক ভাঙে। স্টেশনে লোকে লোকারণ্য, ছাতিমতলার মেলার যাত্রী সব। কিন্তু তখনো লেখকের মনে মৌলীক্ষার ঘোর, সূর্য ডোবা আলোছায়া প্রান্তরে, যেখানে অরূপের খেলা খেলে নরনারী জীবন্ত মিথুন মূর্তিতে। তার পরেও মলুটিতে গিয়েছেন তবু প্রথমের তুলনা যেন নেই। সেই দেখা সত্য হয়ে রয়ে গেছে। অনুসন্ধিৎসা বিচার-বিশ্লেষণ, যত প্রকার প্রকারণে দেখা, তার কোন দাগ নেই মনেতে। দেখতে দেখতে লেখক ছাতিমতলার যাত্রীর ভিড়ে এসে পড়েন। মেলার ঝলক, নাগরিয়া চালের যাত্রীদের এমন ভিড় লেখক আর কোথাও দেখেন নি। এই দূরের রাঢ়ে, রাজধানী যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষ, নরনারী, যাদের দেখলে চেনা যায় জামা-কাপড়ে, চোখে-মুখে, কথায়-বার্তায়। এরাও মেলার যাত্রী কিন্তু মেলার আগেই মেলা দর্শন করে, দূর নগরের নাগরিকদের দেখে। যেন অবাক কৌতূহলে অচিন দেখা দেখছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার মাথায় পশরা নিয়ে। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো দুই চারজন আলখাল্লা পরাও আছেন। কারুর আছে বাঁয়া একতারা, কারুর দোতারা গলায়। কারুর মাথায় রাঙা পাগড়ি, কারুর কেশে বাঁধা চূড়া। বীরভূমের গেরুয়া মাটির পথে গেরুয়ায় ছোপানো কাপড় তাদের অঙ্গে। ভিড়ের মধ্যে আছে, সাঁওতালী আদিবাসী নরনারী। দূর-দূরান্তের মানুষের আনাগোনা এখানে,

সবাই চলেছে ছাতিমতলার অঙ্গনে। কে জানে, সাধকের পীঠভূমিতে তারা কেন যায়। কেন চলে সেই মরমিয়ার ঠাঁই। যেখানে গান বেজেছে ধ্যান থেকে, প্রাণের জন্ম হয়েছে কাব্যের তপস্যায়। যেখানে 'আলো আলো' ডাক ভারী আঁধার যাতনায়। হয়তো কেবল উৎসবে, কেবল মাতনে, কৌতূহলের অবাক বাণের ঢেউ খেলাতে। লেখক যেন এক স্বপ্নরাজ্যে এলেন, যার রূপ সবই যেন আলাদা। আপনভোলা মন এক গভীর গহনে মিলিয়ে যায়। বুকে দুলে ওঠে সুখ একই সঙ্গে বেজে যায় ব্যথা, কিন্তু কেন। কেন তাঁর পথে পথে ফেরা, কিসের সন্ধানে, সেই অচিনের নামই বা কী? লেখকের ভাবনায় প্রশ্ন জাগে—

> ''ছাতিমতলার দীক্ষা দিনের যে মেলা দেখতে এসেছি, তার প্রথম মেলা এই দেখা। এই গাছপালা বন আকাশ, রাঙা মাটি, ছায়া নিবিড়, পাখির ডাক, এই প্রকৃতি মেলা। কেন হে, এই ভাবি মনে, ঋষি কেন এই ঠাঁই বেছে নিয়েছিলেন। এই ঠাঁইয়ে কেন পেতেছিলেন আসন, নমস্কারে নত, আর উচ্চারণ, 'আনন্দং, অনন্তং, শুভং।'... এই প্রকৃতির মধ্যে কী দেখা মিলেছিল নিরবয়ব-এর নির্বিকার-এর, একমাত্র এর! কোন্ পাতা শ্যাম চিকনে ছিলেন ঋষির 'সর্বব্যাপী'। কোন্ ফুলেতে ছিলেন সেই 'নিত্য'। এই আকাশেই দেখেছিলেন নাকি অনন্ত স্বরূপ।''[৫৭]

যখন সকল তর্ক শেষ, যখন যুক্তি যুক্তিহীন, সকল ব্যথা অসীমে হারানো তখন ঋষি এই ছাতিমতলার ধ্যানে বসেছিলেন। তাঁর শুরু প্রেম বন্দনা দিয়ে। মরমিয়ার সৃষ্টি যত, সব প্রেমে বেজেছে।

শাল, জামের ছায়া নিবিড় শান্তিনিকেতনে লেখক দেখতে পান নবীন ছেলেমেয়েদের ভিড়। যাঁরা এবার আশ্রমের দীক্ষান্তে শিক্ষান্তে বিদায় নেবে, যাবে নতুন জীবনের পথে। লেখক অবাক মানেন, যখন পাঞ্জাবের এক মেয়ের মুখে মরমিয়ার বাঙালা গানের সুর, সঠিক স্বর ও উচ্চারণে বেজে ওঠে। তাকে দেখলে মনে হবে, সে মেয়ের বুঝি জন্ম কর্ম সকলই বাঙলায়। রূপে যাই হোক, অরূপে তার খেল্। একদিন এরা আশ্রমে এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, যাবেও তাই। হয়তো আসার সময় মনে হয়েছিল চলেছে নির্বাসনে, অচেনা অপরিচয়ে, ভয়ে সংশয়ে কিন্তু যাওয়ার সময় ছেড়ে কিছু যায় না, বরং নিয়েই যায় কিছু। তবু ছেড়ে যাওয়ার

মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক কিছু। অনেক মুখ, অনেক আলো-কালো দিন, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। এখানে তো কেবলই অধ্যয়ন বা শিক্ষা নয়, আর কিছু থাকে। আর একটি জন্মের কাহিনি, আর একটি ইতিহাস। একটি মন বা প্রাণের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানান ঘর, নানা লোক, বন বনান্তরের স্মৃতি! শান্তিনিকেতনেও এই পর্বের পালা চলছে, এক দেখেই বহুকে চেনা যায়। মেলা কেবল ঝলকে না, অলখেও বটে, অর্থাৎ যাকে বলে অলক্ষ্যে।

লেখকের মনে হয় ছাতিমের মতো প্রাচীন গম্ভীর এক মানুষ যেন ধ্যানে বসে আছেন, সেই ঋষির সকল কিছুতেই যেন ধ্যানের রূপ। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতের মিলমিশের মেলা। এখানে সকল ভুবন, ভবনের নামে নামে। লেখক চেতনায় সেই মরমিয়াকে স্পর্শ করতে চান—

> ''মরমীয়ার প্রাণে যবে 'বলাকা'র পাখা মেলেছিল, 'ফাল্গুনী'র ছন্দে বেজেছিল দোলা, তখন আর এক স্বপ্ন কর্মযজ্ঞের সাধনায় রূপ নিতে চেয়েছিল, তার নাম বিশ্বভারতী। ... সৃষ্টি ঘরের ঘন্টায় তখন যুগের এক নতুন তাল বেজে উঠেছিল। রূপ পেতে চলেছিল। আর অরূপ ঝরার দুই প্রবাহে মরমীয়া যেন ভেসে চলেছিলেন, যে প্রবাহের এক নাম মানুষ, আর এক নাম ঈশ্বর। ... তাঁর ঈশ্বর মানুষ। দুই ধারাতে পারাপার প্রকৃতির সাঁকো ধরে। ... মরমীয়ার সাধ, তিনি যাবেন মহাসাগরে। যেখানে সকলের মিলে মিলনলীলা। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, রয়েছি সেই মহাসাগরের উপকূলে।''[৫৮]

এই উপন্যাসে কালকূট অত্যন্ত সার্থক ও সুচারুভাবে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার ছবি এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পল্লীর বর্ণনা প্রকৃতির পরিবর্তমান নানান সৌন্দর্য, সেই মহান ঋষির মহান ভাবসকল ভাষার কারুমিতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া শান্তস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতনের সাত, আট ও নয়ই পৌষকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উৎসবের আয়োজন হয় তারও সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। মেলাপ্রাঙ্গণে যে নানা স্থান থেকে আগত মানুষের ভিড়, বিভিন্ন দোকানপাটের খুঁটিনাটি বর্ণনা তাঁর লেখা হতে পাই। এছাড়াও মেলার একটি বিশেষ আকর্ষণ ও আবহ গড়ে ওঠে দূর দূরান্ত থেকে আগত ডুব্‌কি একাতারা নিয়ে হাজির বাউল সংগীতের আসরকে কেন্দ্র করে। সাতুই পৌষ, সকালবেলার প্রথম অনুষ্ঠান শুরু ছাতিমতলায়।

গম্ভীর উচ্চরণে প্রথম উচ্চারিত হয় স্তোত্র। ছাতিমের ছায়াতলে বেদী, সেখান থেকে উচ্চারিত হয় স্তোত্র। ঐশ্বর্যময় নিকেতনের ভাবময় চিত্র অঙ্কন করতে করতে লেখকের চোখে ছবি ভাসে তপোবনের। বনস্পতিচ্ছায়ে উচ্চারিত উপাসনার বাণীতে লেখক যেন প্রাচীন ভারতের পায়ের শব্দ কান পেতে শোনেন। মনে হয়—

> ''যখন হাটে-বাটের লেনাদেনায় শ্রমে-ঘামে ফিরি, তখন ভুলে যাই এমন ভারত ছিল। সে ভারতের প্রয়োজন আছে কিনা, সে কথা পুছ কর না। কালের দাগ নিয়ে নিয়ে চলে অধরা পৃথিবী। তবু এক মন থাকে — এক মন, আপনাকে আগের দেখায় দেখতে তার সাধ। পূর্বপুরুষের সেই ভারতলীলায়।''[৫৯]

কালকূটের কলমে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ যেন যথাযথ ভাবে পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যদিও সময়ের প্রলেপের দরুন এই ছবি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

ভুবনডাঙার গ্রামের প্রাচীন যে কিংবদন্তী ছিল সে কথা কালকূটের লেখা হতে পাই। ঋষির বাক্যে ভুবনডাঙার সব ডাকাত ডাকাতি ছেড়েছিল, নিকেতনের নানান কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে তারা। ধ্যানীর স্পর্শে বদলে যায় তাদের জীবনধারা। লেখক মনে করেন আসলে সেই ডাকাত সর্দার ঠিক ডাকাতি করে ধরা পড়েনি। সে ধরা পড়েছিল এক ধ্যানীর কাছে। আর এমন ধরাতে শাস্তির চেয়ে যেন আনন্দটাই বেশি। ছাতিমতলার নয়ই পৌষ অনুষ্ঠানটি হলো হবিষ্যান্ন গ্রহণের দিন। শান্তিনিকতনের জ্ঞানীগুণী সংগঠক কর্মচারী, সমস্ত মৃতদের স্মরণে এই হবিষ্যান্নের দিনটি পালিত হয়। ব্যক্তির মৃত্যুর বিশেষ দিনের দিনক্ষণ নেই, নয়ই পৌষ সবাইকে স্মরণ করা হয়। কালকূটের মনে হয়, এই তো ভারত ও ভারতরীতি। আত্মীয় আত্মজনে ছেড়ে যায়, তার স্মরণে হবিষ্যান্ন। পৃথিবীর এক দেশেতেই এই রীতি। এই রীতিতে তার আত্মপরিচয়। হবিষ্যান্নের আসরে লেখকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধ্যানীর প্রসন্ন মুখ। যিনি তাঁর নিবিড় স্নিগ্ধ দুই চোখ মেলে, জীবিতদের দেখেন। যেন সেই দৃষ্টি আঁকা রয়েছে আম ছাতিমের পাতায় পাতায়। অজস্র সেই চক্ষু। আমলকীর রোদ, লাল ঝিলিকে সেই চোখের হাসি, পাতার বাতাসে ঋষির বিশ্বাস। সকল প্রাচীন মহীরুহে তাঁরই দেহের আকার। এই স্মরণ ভোজনের দিনে লেখকের মনে পড়েছিল আত্মানুসন্ধানের কথা। মনের গহীনে এক যাত্রীকে দেখতে পেয়েছিলেন, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে যিনি ফেরেনবলে ফেরেন,

আমার আঁধার হৃদয় আলো কর। যাঁর চোখে বিগলিত ধারা আর বুকের মধ্যে আতুর ধ্বনি, কতদিন, আর কতদিন। তাঁর অপেক্ষা পরিপূর্ণ আনন্দময় সত্তায় পরিণত হওয়ার। হবিষ্যান্ন গ্রহণের দিন লেখকের মনে হয় মহামানবের সাগরতীরে বসে আর এক ভারত প্রাণের প্রকাশ তিনি দেখেছেন।

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা প্রাঙ্গণের বাউল সঙ্গীতের আসরে লেখকের পরিচয় হয় অচিন বাবুর সঙ্গে। পুরো নাম অচিন্ত্য মজুমদার। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা, এবং সরকারি চাকুরে। তবু চাকরির জোয়াল সারা জীবন ধরে বয়ে চললেও এই বাউণ্ডুলে মানুষটি চেনা থেকে অচেনায় ফেরে। তার চোখের করুণ আর্তিতে ফুটে ওঠে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি। সংসারের যে সীমানায় সে যেতে চেয়েছিল অথচ যাওয়া হয়নি, সেই দিকেই সে চেয়ে আছে। প্রাণখোলা এই মানুষটি তাঁর সহজ আকর্ষণে যেকোন স্থানে মানুষদেরকে আপন করে নিতে পারেন। কীভাবে যেন বাউলদের আসরেও মিশে গিয়ে সমগোত্র হয়ে ওঠেন। কালকূটের কথায়—

> ''...আমি বেশি দেখি অচিনবাবুকে। ওঁর গায়ে তো আলখোল্লা নেই, গেরুয়া নেই, লম্বা কেশে পাগড়ি নেই। সাজপোশাক, কথাবার্তা, মায় হাতের চুরুটখানিও দেখে মনে হয়, ঘরানা আলাদা। অথচ, এই মানুষদের সঙ্গে এত বোঝাবুঝি কেমন করে, যেন ভাবের এক ঘরেতেই বসতো। কেবল, তা-ই না, চোখেমুখে এমন মুগ্ধতা, যেন ভাবের ঘোরে দোল-দোলানো। ... কেন যেন মনে হয়, এ মুখেও সেই কাঁদন ভরা হাসির ছিটা লাগানো।''[৬০]

আবার এই মানুষটিই খোয়াইয়ের পথ ধরে কোপাই নদীর ধারে অন্ধকার বাঁশঝাড়ে সাঁওতাল বরহমদের আসরেও কেমন অনায়াস। বছরের মধ্যে এই একটি দিন ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে মন খুলে আনন্দ করে। নিজের প্রথম জীবনের আস্বাদ পেতেই এই আসরে যোগদান করা। যা স্মৃতির পথ ধরে আরো অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়। বরহম, শরতদের আসরে কবে থেকে আসছেন, সেই প্রথম দিনের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে বলতে শুরু করেন তাঁর দাগা খাওয়া প্রাণের অধরা প্রেমের কথা। শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবস্থায় তিনি ভালোবাসেন নীরজাকে কিন্তু নীরজার অভিভাবক অচিন বাবুকে মেনে নেন নি। ফলে সম্পর্কে চির বিচ্ছেদ যোগ হয়। এরপর যখন দেখা হলো তখন দুজনেই জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন। নীরজার পরিচয়

বর্তমানে অচিন বাবুর অধস্থনের স্ত্রী হিসেবে। এই সূত্র ধরেই শুরু হয় যাতায়াত এবং কবে যে সন্তানহীন এই দম্পতির শূন্য সময় তাঁর আগমনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তা বলা মুশকিল। নীরজাই এখন দুই সংসারের পরিচালিকা। সমাজ ও সংসার বেসুরে বাজলেও এদের তিনজনের একটাই সংসার। মৃন্ময় চৌধুরী, অচিন বাবুর আসরের মাঝখানে তাল দেয় নীরজা। প্রৌঢ় অচিনের হিজিবিজি মুখের রেখায় কাঁপন লাগে, এই অশেষের পালা তিনি আর সইতে পারেন না। তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে এক আর্তের ধ্বনি। যে প্রেম তাঁকে সহজে মানুষের কাছে নিয়ে আসে সেই প্রেমই তাঁকে ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে করে তোলে। কে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল না পাওয়ার পাওয়ায়, অধরার ধরায়। তাই আজ অ-শেষের পালা সইতে পারা যায় না। লেখকের অজান্তে বুকের ভেতরটা যেন টনটনিয়ে ওঠে। তাঁরও যে কোন হদিস জানা নেই পথের, কী খোঁজেন তাও তো অজানা। তবু মনে হয় ''কী এক রতন যেন আমার রূপ-সাগরে দোলা দেয়। খুঁজে পাবার জিনিস না সে। অ-খোঁজে দেখা দিয়ে যায়। যা পাইনি, তার নাম জানি না। যা পাই, তা-ই নিয়ে যাই পরম ধন বলে।''[৬১]

বাউলদের মতো পথ ভোলা বাউল বিবাগী কালকূট পথ চলতে চলতে সঙ্গী হয়ে পড়েন গোপীদাসদের দলে। গোপীদাস তাঁর নাম দেন চিতাবাবাজী। গোপীদাস যেন চোর ধরা দারোগার মতো। ওদের আচার-আচরণ, জীবন কিছুই বোঝা যায় না। কী চায়, কী করে অথচ যেন কিসের নেশায় আছে। ঝিনিরও মনে হয় এদের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা সবই একরকম। সবাই যেন এক সাধনাই সাধন করে চলেছে। কালকূটের মনে হয়—

> ''গোপীদাসের মনপ্রাণ এত ভরা কিসে? ধূলি আলখাল্লায়, ধূলি জটায়, ধূলা গায়ে, ঝোলায় একতারা বাঁয়া প্রেমজুরিতে, মাঠেঘাটের বাটে বাটে ফেরায়, কোন নেশাতে ভরপুর! এমন না যে, চাঁদির জেল্লায় ঝকমকানো দৌলতের টাটে বসে মৌজ করে। চোখে তো দেখি, ফৌত ফতুর মানুষ সব, চালচুলো নেই। তবু যেন প্রাণ ভরা, বুক ভরা, মুখে ভুবনমোহন হাসি। দুনিয়ার সব পাওনা ঝোলায় তুলে যেন এখন নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। মনকে ডাকে 'ভোলা' বলে, 'মনের মানুষ' ডেকে বেড়ায়। না বুঝি সেই মন। না চিনি সেই মনের মানুষ।''[৬২]

এ হল ভারতের আরেক রূপ যা আমাদের অতি পরিচিত, যাঁরা সহজ রূপে থেকেও তত্ত্ব ভাসেন, এক অধরা প্রেমের সাধন তত্ত্বই বাউলের উৎস। অথচ ভীষণ চেনা হওয়া সত্ত্বেও এদের গভীরে আমরা ডুব দিতে পারি না। তাই সেই অর্থে সমগ্র রূপে চিনে উঠতে পারি না। আমরা সমাজ জীবনের ঘেরাটোপে অতি সন্তর্পনে হিসাব নিকাশ করে চলি। কোনো রূপেই নয়ন ভোলে না। কোনো পাওয়াতেই মন ভোলে না। কেবল হারাই হারাই এই ভয়েতেই রয়েছি। শুধু ভোগের ভাগে চক্রে পাক খাই। তাতে যখন হাঁফিয়ে মরি তখনি ছুট লাগাই। মনে করি রূপ ছেড়ে অরূপ দেখে আসি, কী পাই না, তার সন্ধানে যাই। চিরকালের ঘর পালানো, আপন ভোলা, অনাসক্ত পথিক কালকূট তাঁর পথ চলাতে এই বাউলদের নিকটে এসেছেন। এর আগেও গাজীর মুখ থেকে তিনি বাউলের পুরুষ প্রকৃতির কথা জেনেছেন। নানুরে গোপীদাস বাউলের সাহচর্যে তিনি বাউলের গভীর গূঢ় দেহতত্ত্ব আরো সূক্ষ্ম ভাবে জানার চেষ্টা করেন। তিনি চণ্ডীদাসের নানুরে পৌঁচ্ছে যান গোপীদাসের সঙ্গী হয়ে। এক কবির ঠাঁই থেকে আর এক কবির থানে। গোপীদাস তাঁর দাড়ির ভাঁজে হাসির ঝিলিক হেনে গুনগুনায় যে, বাউলের গুরু চণ্ডীদাস, আবার যেমন তেমন গুরু নয়, পরম গুরু। সহজের পাঁচ রসিক, রসিক সবাই হয় না। বাউলের কথায় বলে, ভবেতে আছেন পাঁচ রসিক বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর শেখর রায়। গোপীদাসের মধ্যে মুগ্ধ রহস্যের ঝলক, রাধা বৃদ্ধা, গোকুল বিন্দু সুজন সবাই যেন একই ভাবের মধ্যে চলে। স্থান কাল দিশা ভুলে যার ঢেউ যেন কালকূটের বুকে এসেও লাগে। কী এক ভাবের খেলায় মন টলটলিয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে কোথায় কিসের তরঙ্গ বহে যায় তার ভাষায়—

> ‘‘ভিন্ দুনিয়ার মানুষ আমি, ভিন্ ভাবেতে থাকি। এই মানুষদের বুঝি না। এদের ভজন পূজন রীতি প্রকরণ, কিছুই জানি না। তবু দেখো, এরা কেবল যে বিশ্বাসেই আছে তা না। যেন মন ভরে এক কিসের তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে ভাসে। এরা পরস্পরের পায়ে ধরে, পরস্পরের জিভে ঠেকায়। তারপরে চোখের জলে হাসে। বুঝি না বুঝি, মানি না মানি, মিথ্যার ঘরে এমন ভাবের খেলা খেলে না। এ সত্যের স্বরূপ কী, কে জানে!’’[৬৩]

নানুর! নান্নুর! যা-ই বলো সেই এক কথা, নাম চণ্ডীদাস। এই নাম নিয়ে লেখক

ইতিহাসের কচকচিতে না গিয়ে মনে করেন সব খানেতেই সেই নামের মহিমা। সেই এক নাম চণ্ডীদাস, এক কথা, এক গান, একই সুরে বাজে। তাই নামের স্থানের, মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে যে যায় যাক তাঁর কাছে নানুর যা, ছাতনাও তাই। যেমন একান্ন পীঠের যেখানে যাও, এক শরীরের নানা রূপ। যেখানে তাঁর নাম, সেখানেই কবিতীর্থ। শিল্পীর সাধনক্ষেত্র। বীরভূমের এক গ্রাম। পরম রসিকের লীলাভূমিতে এসে ভূমির ধুলা নিয়ে মাথায় ছোঁয়ায় গোপীদাসের দল। মুখে শব্দ 'জয় গুরু'। গ্রামের পথে পা দিয়ে লেখকের বুকের মধ্যে ধ্বক করে ওঠে, তাঁর ভাষায়—

> ''ভাবি, এই কি সেই রজকিনীর পাট নাকি? আর কোথায় বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতো বাশুলীর পূজারী ব্রাহ্মণ? যেথায় 'পীরিতি করিল, জগতে ভাসিল, ধোপানী দ্বিজের সনে। জগতে জানিল, কলঙ্কে ভাসিল, কানাকানি লোকে জনে।' কোথায় সেই তেহাই গ্রাম, তিন ক্রোশ দূরে। যেখান থেকে রজকনন্দিনী আসতো নানুরের বাশুলীর জলাশয়ে কাপড় কাচতে।''[৬৪]

কবির লীলাভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখক অনুভব করেন, হয়তো এই একই পথে হেঁটে গিয়েছেন কবি মাঠে গ্রামান্তরে। হয়তো এই একই ধূলিতে সেই পায়ের ধূলা আছে। এই বাতাসে সেই মানুষের নিশ্বাস। নিরালা নিরিবিলি কোন্‌খানে বসে হয়তো ছন্দের ভাবে মগ্ন থাকতেন! পদাবলীর চণ্ডীদাসকে ঘিরে এক কিংবদন্তী আছে যা লেখকের কলমে ফুটে ওঠে। গৌড়ের রাজা চণ্ডীদাসকে পদাবলী গান শোনাতে ডেকেছিলেন। সঙ্গিনী রজকিনীকে তিনি নিয়ে যান কিন্তু তাঁর গান শুনে ও দেখে গৌড়ের রাণীর অবস্থা 'ঘরে রৈতে নারে, করে অভিসার।' ফলে রাজার আদেশে কবিকে হাতীর পিঠে শিকল দিয়ে বেঁধে মারো। 'চণ্ডীদাসে কবির ধ্যান; বেগম তেজল প্রাণ। শুনিয়া ধবিনি ধায়; পড়িল বেগম পায়।' চণ্ডীদাসের সঙ্গে বেগমের প্রাণ যায়। তার পায়ে প্রাণত্যাগ করে রজকিনী। কত কথা, কত কাহিনি তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখোনো ছাড়াছাড়ি হয়নি। গোপীদাস এক পরম বার্তা দেয়—

> ''রাধাকিষ্টের লীলা কোথায়, নিজের কথা বাজে, বুইঝলে ত? রজকের বিটির কথা ভাব, আর চণ্ডীঠাকুরের কথা ভাব। এ দুয়েতে যে লীলা, তারই মিলেমিশে রাধা কেষ্ট। নিজের কথা পরকে দিয়ে, হাঁ, বুইঝলে?

যে দুঃখে রাধা কাঁদে, রামীও সেই দুঃখে কাঁদে, ... ইবারে দেখো, রসতত্ত্বের লেগে কেষ্ট থাকেন রাধার পায়ে। উনি থাকেন রামীর পায়ে। তবে কিনা বাবাজী, খালি পদাবলী শুইনলে, রসিকের আদত কথা শুন নাই।"[৬৫]

তাহলে কী সে কথা? গোপীদাস মাথা দুলিয়ে বলে, সেই এক তত্ত্ব। রাধা কেষ্ট যা সাধে, পুরুষ পিকিতিও তাই সাধে। গোপী দাস যেন গোপন কথা বলে, এমনি তার সুর স্বর মুখের ভাব। বলে— ''এই জানবা বাবাজী, মোট কথা, পুরুষ পিকিতি মিলন চাই, আবার যখন মিলন, তখনই বিচ্ছেদ। জীবন্তে যে মরা থাকে, টানেতে যে উজান চলে, তার সাধন হয়। বড় কঠিন, বড় কঠিন। পিরীতে সাধন, সাধনে পিরীতে, এই কথা। চণ্ডীদাস হলেন এই সাধক।"[৬৬]

নিরালা নিভৃতে দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি যেমন শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয় গোপীদাসের কথা ঠিক তেমনি যেন। অন্ধকারে যেমন জাগে ঝাপসা আলোর ইশারা, তেমনি যেন তার কথা। গোপীদাসের কণ্ঠে দেহতত্ত্বের সহজ সাধন কথা যেন এক অরূপের রূপে জেগে ওঠে। আর কালকূট এক শূন্যতায় বেজে ওঠেন—

''তার ধর্ম কী, মর্ম কী, জানি না। মনে বাজে, প্রেম ভজে যেই জন, সেই জন সেবিছে মানব। প্রেম, দুঃখের লাগিয়া শুধু। যবে সুখের আগমন, তখন সুখ দুঃখ অতীত। তখন এক ভিন্ জগতের দোলা। তখন রূপ ছেড়ে অরূপের খেলা। তখন চোখের জলে, হাসির ধারা ঝরে। সে অনুভূতি কেমন, কে জানে, কেবল দেখি নিজের বুকে কেমন এক বাষ্প জমে ওঠে। কথা ফুরিয়ে যায়। কী চাই, কী পাই না। সেই এক শূন্যতায় বাতাসের ঘূর্ণি লেগে যায়।"[৬৭]

নানুর পর্যন্ত পথের সঙ্গী অচিন দা, ঝিনি ও তার বন্ধুদের বিদায় জানাতে হয় লেখককে। পথ চলার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় তাঁর ঝুলি উপচানো হৃদকলসী টলটলানো। কবির ভুঁয়েতে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথা তাঁর প্রাণে জাগে, সবার উপরে এই মানুষ বিচিত্র। তবে পথ চলাতে বিদায় মুহূর্তও কখনো কখনো কষ্ট দিয়ে যায় যার কাঁটা কালকূটের প্রাণে বিঁধে থাকে। তবু এও সত্য যে, মানুষ নিশ্চল না, চলে নিরন্তরে, পথে জনপদে, মানুষের মাঝেই যে দেশকালের পরিচয়।

বাউলরা আমাদের পরিচিত সমাজ সংসারের বাইরে অবস্থান করে। তাদের নিজস্ব

সাধন পদ্ধতি, দেহতত্ত্ব আছে। তবে গোকুল-বিন্দু-সুজন এর মধ্যে ত্রিকোণ সম্পর্কের জট থেকে যে ভুলের সূত্রপাত আর অপরাধ ভঞ্জনের মধ্য দিয়ে যার পরিণতি তাতে করে নির্বাক স্তব্ধ লেখকের মনে হয় বাউল হোক বা বৈষ্ণব সকলই মানব মানবীর লীলা। এদের জীবনেও রয়েছে গৃহস্থের ছাপ। না হলে সুজন-বিন্দুর রঙবিচ্ছুরিত হাসাহাসি গোকুলের প্রাণে আঁধার ঘনিয়ে তুলতো না। তা ঘর-করণের স্বামী স্ত্রী না হোক তবু সাধন সাধবার পুরুষ প্রকৃতি তো। গায়ে আলখাল্লা, মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুলে পাগড়ি, হাতে একতারা, কিন্তু এই মানুষেও সেই মানুষেরই খেলা। এই মানুষেও সেই এক ব্যথা বাজে। 'হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফিরি চকিতে।' সুতরাং ভেক দাও, ভেল্‌কি দাও, নিঃসঙ্গের কান্নায় মানুষ সেই মানুষ। সেই তার সব থেকে বড় চেনাচেনি। তাইতো কালকূটের চোখের জলের সঙ্গে হৃদয়ের খুশি বাজে বেশি—

> ''পরম বিস্ময়ে আমার নমস্কারে নতি অন্য কারণে। সে কারণ শুধু মানুষ পরিচয়ের সুখে নয়। মানবমহত্ত্বের বিস্ময়ে। ভাবি, প্রাণধর্মের এত সাহস, এমন সহজ মন কোথা থেকে পেয়েছে গোকুল বিন্দুরা! ঈর্ষা যেখানে ব্যথা হয়ে বাজে, ব্যথা যেখানে হীনমন্যতার অন্ধকারে বাঁধা পড়ে না, নিঃসঙ্গ মানুষটিকে একলা ছুটিয়ে দেয়, যেন ত্যাগেতেই প্রেম জাগায়। একবারও তো ওদের মুখে অন্ধকারের কালি দেখিনি। কথার ঘৃণায় অপমান করতে দেখিনি। বিতৃষ্ণায় বিরাগে রাগে একবারও তো হাসাহাসি দেখিনি। অথচ প্রাণের এক জায়গায় বিঁধে ছিল ঠিক। সেই তীরবেঁধা পাখি একবারও কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেনি। কখন নিঃশব্দে বুকের পালকে রক্ত চাপা দিয়ে চলে এসেছিল আপন ঝোপের কোটরে।''[৬৮]

কিন্তু তারপরেও কী সহজ আবেগে আপন ভুল ভঞ্জনের দায়ে মনের কলুষ যত সকলই সে তার প্রকৃতির পায়ে ঢেলে দেয়। সুজনকেও বুকে আগলে ধরে। কিন্তু দীনতা, অন্ধকার শুধু একলা গোকুলের নয় বিন্দু আর সুজনও ঠিক সেই সুরেই বাজে। তাদেরও যেন সেই কথা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। এই হাসি কান্নার ভেতরই লেখক যেন তাঁর প্রাণের অন্ধকার মোছার শক্তি পান। এই অপরূপের দর্শনের পথেই তিনি বারবার যাত্রা করতে চেয়েছেন। এই পথ

চলার পাওনা নিয়েই তাঁর এগিয়ে যাওয়া। এই পরম পাওনার কাছে তীর্থ-মন্ত্রতন্ত্র-সাধনপূজন-সন্ন্যাস-বৈরাগ্য এইসবের থেকে বড় হয়ে ওঠে তাঁর আত্মদর্শনের অনুসন্ধান। নানুর থেকে বক্রেশ্বর যাবার পথে কালকূট সিউড়িতে গোকুল-বিন্দুর আখড়ায় রাত্রিযাপন করেন। তবে আখড়ার চেয়ে তাঁর বেশি করে মনে হয় যেন কোনো গৃহস্থের ঘর আঙিনা। সেখানে গোপীদাস-রাধা বৃদ্ধা, গোকুল-বিন্দু- সুজন, নিতাই, কুসুম সবাই মিলে আসর বসে যায়। সব মিলিয়ে অচেনা অজানা পরিবেশে এমন আসরের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই কালকূট যেন নিজেকেই চিনে উঠতে পারছেন না, চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক, প্রাণে এক ভাবের তরঙ্গ। যেন নিজের প্রত্যয় হয় না এমন আসর যে হতে পারে এমনটা তাঁর জানা ছিল না। সত্যিই তো আমাদের দেখা ক্ষুদ্র পরিসরের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ছাড়িয়ে মানুষ কত যে ঠাঁই, কত যে রূপ, কত অপরূপ, বঙ্গের নানা অঙ্গে। কালকূটের চিন্তার সীমায় এক দূর কালের চির রহস্যের বাণী ভেসে ওঠে, অনুভূতিতে এক আলো অন্ধকারের দোলা। যেখানে বিস্ময় লাগে, জিজ্ঞাসার তরঙ্গ ভেসে যেতে থাকে। যার নিরসন হয় গোপীদাসের মুখ দিয়ে। তাঁর বাউল তত্ত্বের বর্ণনায়। লেখকের মনে পড়ে যায়, দক্ষিণের দরিয়ার কূলে গাজীর কথা। তার মুখেও শুনেছিলেন পুরুষ প্রকৃতির কথা কিন্তু সেই মিলনে জীবের জন্মলীলা নেই। কাম রতির মিলনে অমৃত নদী উজানে বয়ে চলে। সেই অমৃতের নদীতে ডুবতে পারলেই সুখ। কামেতেই প্রেম, প্রেমেতেই উত্তরণ। পতন পাতন ত্যাগ করে, নিরন্তর সেই মহাভাবের অনুভূতি, তাই হলো বাউলের সাধনা। গোপীদাসের গলা গুনগুনিয়ে বেজে ওঠে—

> ‘‘বাউলের মোদ্দা কথাটো শুইনছো তো, যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই বেহ্মাণ্ডে। অই অই গ বাবাজী, উটি হলো আসল কথা। তোমার শরীলে যা নাই, তা জগৎ সোম্সারে নাই। ভজন কর, পূজন কর, সবই শরীলের মধ্যে। পুরুষের শরীলে, আর নারীজাতির শরীলে। ই দুয়েতে মিলন হলে, তবে সব মিলে।’’[৬৯]

কালকূটের চার পাশের গভীর অন্ধকার ভেদ করে যেন এক ঝলক দেখা দেয়। বাউলের তত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতির মিলন রহস্য যেন একটা চকিত ঝঙ্কারের মতো অবোধ অনুভূতির মধ্যে বেজে ওঠে। তারপরেও প্রশ্ন জাগে, এই সাধনের লক্ষ্য কী? কোন্ ঈশ্বরের আরাধনা করে এরা? যার উত্তর গোপীদাসের বর্ণনাতেই পাই। সেই এক লক্ষ্য, অচঞ্চল মিথুনানন্দের মধ্যে ‘মনের

মানুষ'-এর অনুভব। 'সহজ মানুষ' কে অনুভূতিগম্য করে তোলা, ইনিই ঈশ্বর। সে জন্যেই বাউলের গান, 'টলিলে জীব, অটলে ঈশ্বর।' এর মাঝে ক্রীড়া করে রসিক শেখর।' জগৎজোড়া মীন সেই গাঙে, খেলছে খেলা পরম রঙ্গে। ইনিই সেই ঈশ্বর, রূপের ভেতর অরূপ, আকারের মধ্যে নিরাকার। যদি টলে তবে তা 'জীবাচার', 'প্রেমাচার' আর হলো না। লেখকের কল্পনার চোখে যেন নানা দৃশ্য, বিচিত্র অনুভূতি খেলে যায়। তাঁর মনে হয়—

> ''এক মহা সুখবাদেরই কথা শুনি। বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দু তন্ত্র সাধনার সঙ্গে এর তফাত বুঝতে পারি না। পরস্পরের যোগসূত্র কোথায় জানি না। তবু, সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে এক বিশাল ভারত, যেন রহস্যকুয়াশা বেষ্টিত, জেগে ওঠে। ... এই একটি লোক গোপীদাস। এক গ্রামীণ বাঙালী। তার মুখ থেকে শুনি এক ভিন্ জগতের কথা। আমারই আর এক পরিচয়। যে পরিচয়ের লিখন আমার সমাজে পরিবেশে কোথাও নেই। কিন্তু আমারই চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ... এই পরিচয়ের কোথাও ভারতের সেই অধ্যাত্মবাদের চিহ্ন দেখি না। ... ঈশ্বর নেই, ব্রহ্মণ্যবাদের কথা নেই। বেদ বিধিবহির্ভূত এ আর এক জগতের সংবাদ। আর এক ভারতের সংবাদ।''[৭০]

লেখক মনে করেন এই ভারতের রূপ আগে কিছুটা থাকলেও ধীরে ধীরে বর্তমানে এর অবলুপ্তি ঘটছে যা ভবিষ্যতে হয়তো বা আর থাকবে না। গোপীদাস বলে চলে, এই সংসারে মানুষ লীলা করে, কেউ 'সহজ মানুষ' ভজে আবার কেউ ভজে 'জীবপ্রেম' । আর কিছু না। কিন্তু তত্ত্বকথা বলতে বলতে গোপীদাস এক গভীর নৈঃশব্দে ডুবে যায়, নিজের ব্যর্থ সাধনার ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গোপীদাসের কথায় তারা সাধন পথে পতিত কিন্তু এই চুল দাড়ি আলখাল্লা ধড়াচূড়া ছাড়তে পারে না। গুপীচন্দ্র আর বাঁয়া এখন কেবল হাতের শোভা। কিন্তু সত্যিকারের বাউল তারা নয়। কারণ বাউলের সংসারীদের মতো সন্তান হয় না। গোপীদাসের আক্ষেপ খালি তত্ত্বই জেনেছে কিন্তু কাজের কাজী হয়ে ওঠেনি। বাউলের যন্ত্রণাময় ব্যর্থ অস্তিত্বের প্রকাশ কালকূট গাজীর মধ্যেও দেখেন। প্রথমে যে ফকির দরবেশ গাজীর মুখে পুরুষ প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব শোনেন কিন্তু বিদায়ের শেষ মুহূর্তে কালকূট জানতে

পারেন, ঘরে তার ক্ষুধার্ত সন্তান ও প্রকৃতি রয়েছে। সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল গাজী যেন দরবেশ ফকির না। মুরশেদের নাম নিয়ে ফেরা সে এক দরিদ্র বাঙালী। তার অন্তরে বাস করে এক স্বামী, এক পিতা।

কালকূটের কাছে বাউলের তত্ত্ব, গান আর দুর্বোধ্য রহস্যময় মনে হয় না। যেন প্রতিটি গানের কথা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, গহীন জলের তলায় সব জিনিস স্পষ্ট হতে থাকে। বাউলের গান আসলে গান না, সবই তার আপন সাধনমার্গের ঠিক ঠিকানার কথা, গানই তার মন্ত্র। সে থাকে আপন ঘোরে, জপে, সাধনে। রসের রসিক যে সেই বোঝে, অরসিকের লাভ শুধু বিচিত্র বাণীর ছন্দে। বাউল তার গানে সাধন পথের প্রতীক খোঁজে। প্রতীক দিয়ে যখন সে গান বাঁধে তখন সে শিল্পী। যুগ বদলের হাওয়ায় প্রতীকের বদল হয়। বলে আমাদের ঘরের কাছেই 'আরশীনগর' সেখানে এক পড়শীর বসত। এই আরশীনগর হলো তার আপনার 'দেহভাণ্ড'। পড়শী হলো সেই 'অধর মানুষ'। বাউলের পথের সন্ধান দেয় গুরু, তাই গুরু তার ঈশ্বরের তুল্য। বাউল বিনয়ী, সে সকলের কাছে কিছু না কিছু শিখতে চায়। সকলের সব কথার মধ্যেই সে তার সাধন পথের সংকেত খোঁজে। তার অঠিক বেঠিক গুরু অগনন, তাই বিশেষ করে সে কাকে প্রণাম করবে। সেই কারণেই বাউলের গানে সামান্য মানুষের সামান্য কথার সুর বাজে। ভিতরে চলে অসামান্যের খোঁজাখুঁজি। মুখে বলে বৃথাই তাকে এই মাটির বৃন্দাবনে খুঁজে ফেরা, তার আসল অবস্থান এই হৃদয়ের মাঝখানে। বাউল গানের সুর ধ্বনিত হয় হাজার বছর আগে চর্যাপদের দোহায়, হিন্দু তন্ত্রেও। যেখানে বাউল গানের মতো কথা শুনতে এক কিন্তু অর্থ হয় আরেক। নানা ভাষা, সংকেত, প্রতীকের ব্যবহার কিন্তু লক্ষ এক। সাধককে চলতে হবে উজানে, সেই তার শক্তি। তবে এই দেহবাদের আদি অন্ত কোথায়। কালকূট এর সঙ্গে দূর কালের কৃষি উৎপাদনের প্রতীককে যেন একই সূতোয় বাঁধাবাঁধি করতে চেয়েছেন। যেখানে গূঢ় সাধন পদ্ধতি নেই রয়েছে সৃষ্টির বাসনায়, বিশ্বাসে, নানা বিচিত্র রীতি পদ্ধতিতে পৃথিবীর অনুকরণ—

> ''মানুষ মাটি কেটেছে, বীজ বুনেছে। আর বালিকা যবে প্রথম সৃষ্টির সংকেতে ঝলকে উঠেছে, তখন পুরুষ তার সঙ্গে কর্ষিত ক্ষেত্রে সৃষ্টির সহজ আচরণে নিবিড় মিলনে মিলেছে। বলেছে 'হে পৃথিবী, তুমি যা কর, আমরাও তা-ই করি। তুমি উৎপাদন কর, আমরাও উৎপাদন

করি। আমার দেহের সৃষ্টির সকল কণা তোমার মৃত্তিকায় রেখে যাই। বীজের ভাঁজে ভাঁজে দিয়ে যাই। তোমার গর্ভ ভরে উঠুক। বীজ আহরণ করে আমি গর্ভবতী হই।"[৭১]

মলুটির সাঁওতালদের গণমিলনের উৎসবে আসলে তো এই আকাঙ্ক্ষাই ফুটে ওটে। এই বিশ্বাসে মানুষ কত বিচিত্র আচরণ করেছে যা সভ্যতার চোখ দিয়ে চেনা যায় না। কালকূট মনে করেন দেহতত্ত্বের মধ্যে কৃষিলীলার যোগ আছে, যে যোগাযোগ পরে ধর্মতত্ত্বের আঙিনায় এসে উজান, উর্ধ্বগমন হয়ে উঠেছে। কারোর সাধনা জন্মান্তর না ঘটুক, কেউ চায় শক্তি, কারণ শক্তিই মুক্তি, মানব জীবন সার্থক। এই ফললাভের বিচারে কালকূট নেই, তাঁর দৃষ্টি বিস্তারিত হয় এমন করে—

"আমি বুঝি না। আমি জানি না। আমার চোখের দুয়ারে দেশের, কাল-কালান্তরের, রূপ-অরূপের এক তরঙ্গ দোলে। আর ভাবি, কত স্রোত মেশামেশি, তবু এক স্রোতেই যেন ভারতবর্ষ চলমান। এক স্রোতের হেথায় এক রঙ, হোথায় আর রঙের ঝলক। তারই সঙ্গে বিবিধ বিচিত্র মানবগোষ্ঠী। কত যে তার ধ্যান-ধারণা, কত বিভিন্ন মন! কত বিচিত্র রূপ। নানা ভাবে নানা রূপে যাত্রা যেন সেই একই অরূপের দ্বারে।"[৭২]

গোকুল বিন্দুর আখড়া থেকে গোপীদাসের সঙ্গে কালকূট যাত্রা করেন বক্রেশ্বরের পথে। গোপীদাসের মুখে ফুটে ওঠে ধর্মে থাকতে না পারার এক কষ্ট, এক আক্ষেপ। তার মনে হয় বৃথা তার বেঁচে থাকা। না পারলো ধর্মে থাকতে, না পারলো খোলস ছাড়তে। কিন্তু কালকূটের মনের ভিতর যেন ভারত রীতির বিস্ময় লেগে যায়। তাঁর মনে হয়—

"এমনি এক ধূলিমলিন আলখাল্লা পরা, একতারা বাঁয়াওয়ালা ঝোলা কাঁধে পথে পথে ফেরা মানুষ যে, এমন তত্ত্ব ভাষতে পারে, না শুনলে তা জানা যায় না। এইসব মানুষে যে আর এক মানুষ আছে, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ভারতবর্ষের হর্ম্যতলে, রম্যকক্ষে কবে তত্ত্ব শোনা গিয়েছে। কেবল তত্ত্ব কেন। শিল্প বলো, সঙ্গীত বলো, সবই তো বনে পথে পাহাড়ে বন্ধুরে গাছতলায়। ভিক্ষার ঝুলি

নিয়ে যে মানুষেরা মোহন হেসে পথ চলে যায়, ভারত তত্ত্বের তত্ত্ব যে তাদেরই ঝুলিতে। ... ধূলা পায়ে যে মানুষ পথের প্রান্তে গাছতলায় বসে, গভীর বাণী সেখানে বেজেছে।"[৭৩]

এক অচিন আবেগে গোপীদাস কালকূটকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজেকে বার বার বাউল ধর্মে পতিত বলে উল্লেখ করলেও লেখকের বিশ্বাসে অনুভূতিতে কেবল একটি কথাই বেজে ওঠে, সে গোপীদাস পতিত নয়।

বক্রেশ্বর যার নাম পাপহরা, উষ্ণ কুণ্ডবাহী, শিবক্ষেত্র। পাথুরে জমিতে কেবল শিব মন্দিরে মন্দিরে ভরে আছে। শিবক্ষেত্রে মানুষ নানা বাসনায় মানসে এবং বিশ্বাসে এক এক মন্দির করেছে। যার সংখ্যা প্রায় তিন শো-র ওপরে। কালকূটের অবাক লাগে মুগ্ধ হন এর নাম ভারতবর্ষ। তার মাঝে এক দেশ, বাঙলা দেশ। যেখানে যাবে নানাখানে নানা বৈচিত্র্য। এই নানারূপের মধ্যে কালকূটও তাঁর সমস্ত কিছু নিয়ে মিশে যান। বক্রেশ্বরের মূল মন্দিরে পাণ্ডার মন্ত্রোচ্চারণ, চারিদিকে আরো অন্য গলার মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রতিধ্বনি সঙ্গে ফুল বেলপাতা ধূপ-দীপ সমস্ত মিলেমিশে এক অন্য আবহ সৃষ্টি হয়। কালকূটের মনে হয় তিনি যেন বর্তমানে নেই, যেন হাজার বছর ধরে অনেক পায়ের চিহ্নে চিহ্নে চলেছেন। বহু দূর থেকে সেই ছায়ায় ছায়ায় যেন তাঁর আগমন। যেখানে তিনি শুধু একা নন সঙ্গে বহু লক্ষ কোটির সহবস্থান। যেন দেশ-কাল গোষ্ঠীর পূর্ব পরিচয়ের আলো-অন্ধকার বেয়ে পথ অতিক্রম করেছেন, পিছনের বিচ্ছিন্নতাকে ক্রমশঃ যোগ দিয়ে দিয়ে। বর্তমানের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণের রূপে পাবার ঔৎসুক্যে। মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণের মতো প্রণাম করেন। যেন বর্তমান তাঁকে অনেক যুগযুগান্ত দেখিয়ে নিয়ে এসেছে অনেক রূপ অরূপের মধ্য দিয়ে। এখন সেই রূপ থেকে অরূপের স্রোতে পথ চলা। কালকূট তাঁর সমস্ত লেখার ভেতরে বিচিত্র মানুষ ও তাঁর মনকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন। সেই গভীর ও নিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লেখকের মনে হয় বাউলরা সমাজ জীবনের বাইরে এসে অবস্থান করলেও তাঁরা হলেন আপাদমস্তক সংসার মনাক মানুষ। তাঁরা প্রকৃতি পুরুষের সুগভীর তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে, সমাজ নির্দিষ্ট স্বামী-স্ত্রী-র মতোই দৃঢ় অধিকারবোধে পরস্পর জীবনযাপন করেন। 'ব্রক্রেশ্বরের ব্রহ্মানন্দ অবধূত ও যোগমায়ার' আখড়ায় গোপীদাস লেখককে নিয়ে যান। গোপীদাসের সম্বোধনে যোগমায়া হলেন যোগদিদি অর্থাৎ সমাজ নির্দিষ্ট সম্পর্কের বাইরে তাঁরাও চলেন না। অবধূত ও ভৈরবী সাধনে লিপ্ত

থেকেও তাঁদের জীবন যাপনের সুর মান অভিমানে পূর্ণ স্বামী-স্ত্রী-র আচরণের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে যায়। যেন ধর্মকর্মে লিপ্ত থেকেও মন চায় সেই গৃহকোনের সুখ। অন্তরে বাহিরে সীমান্তে সেই এক কথা। ব্রহ্মানন্দের দেওয়া আঘাত ভৈরবীর বুকে সংসারের নারীর মতোই এক সুরে বেজে ওঠে। লেখকের মনে হয় শ্মশানে মশানে, তীর্থে-নগরে, বন্দরে-গ্রামে সব স্থানেই সংসারের লীলাখেলা। বৃন্দাবনে-গোকুলে যেমন নায়ক-নায়িকা লীলা তেমনি যোগমায়া। সাধিকার জীবনেও সেই চিরন্তন মানবীর সুর বেজে ওঠে। বক্রেশ্বরের রূপ মুহূর্তে বদলে যায়। দিনের আলোয় সে ছিল এক, রাত্রে আরএক। দিনের আলোয় যাকে চেনা যায় রাত্রের অন্ধকারে সে হয় অচেনা। লেখকের মনে হয় দেখার চেয়ে অদেখাই বেশি রয়ে গেছে, তা ঠিক কী, তা জানা নেই। তবে যা আছে তা যেন অনুভূতির গভীরে। বক্রেশ্বরের মহাশ্মশান, উষ্ণ কুণ্ড, শত-শত মন্দির, খোয়াই, গাছপালা সব মিলিয়ে কেমন এক উদাস বৈরাগ্যের গাম্ভীর্য। অথচ ঘরছাড়া মনকে এখানে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডাক দিয়ে বসায়, একটা অচেনা আকর্ষণের টানে।

ব্রহ্মানন্দ অবধূতের প্রকৃত নাম অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনের নাম শ্রীযুক্ত কার্তিক ঘোষাল। যার ঘরে অন্নের অভাব নেই। কিন্তু সংসারের সেই সুখ ছেড়ে এই মানুষটি তাঁতী ঘরের বউ যোগোমতীকে নিয়ে শ্মশানে এসে আশ্রম করেছে। যখন যেমন জোটে, তখন তেমন খায় পরে। ক্ষুধার্ত অবধূতকে যোগোমায়ার পাশে বসে ব্যগ্রভাবে অন্নগ্রহণ করতে দেখে কালকূটের মনে হয় শুধুমাত্র সাধন ভজন নয় আরও কিছু যেন এই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে। যা এই উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে জীবন যাপনের মধ্যে সীমায়িত নয়। এর শেষ কোথায় কে বলবে! মানুষের শেষ কোথায়, তল কোন্ গভীরে, কতটুকু জানি। কালকূটের যাত্রাপথে উঠে আসে 'অঘোরী বাবার' আশ্রম। লেখকের দক্ষ বর্ণনা কৌশলে তা চিত্রয়িত হয়ে ওঠে, আবার আমরা পাঠকরা রোমাঞ্চিতও হয়ে উঠি। যেমন, সামনে খোলা কুঁড়েঘরের মতো একটি ঠাঁই। তার মধ্যে টিমটিম করে আলো জ্বলে। সেই অস্পষ্ট আলোয় স্তূপীকৃত নরমুণ্ডের কঙ্কাল। যেন দলা পাকিয়ে ভিড় করে আছে অনেক অনেক সব মুখ। তাদের মুখে মাংস নেই, যেন কোনো অভিব্যক্তি নেই। অথচ চোখের কালো গর্তে যেন দৃষ্টি আছে। যেন কোন্ দূর ওপার থেকে ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে আছে এরা কে নারী, কে পুরুষ কিছু লেখা নেই। নাম ধাম পরিচয় কিছু ছিল নিশ্চয়ই একটা। এখন পরিচয় শুধুমাত্র কঙ্কালের মুণ্ড হিসেবে। এই পথ চলায় উঠে

এসেছে 'ঠ্যাঙাবাবা' চরিত্রটিও। যাঁর কাছে এক অটুট বিশ্বাসে লোকে মার খেতে আসে সঙ্গে তাদের আর্ত আকুতি। সকলেই এরা উদ্ধারের আশায় আসে, গভীর বিশ্বাসে তারা বিষণ্ণ, আর্ত। ঠ্যাঙাবাবার যন্ত্রণাক্লিষ্ট অথচ গভীর ভাবনায় স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে কালকূটের মনে হয় কে ইনি? কেন মারেন? কেন এদের এত বিশ্বাস? ধর্মাধর্ম কি তা তিনি বোঝেন না। কিন্তু কত বৈচিত্র্য এই সংসারে কত বিচিত্র মানুষ। তাইতো এমন বিচিত্র দৃশ্যের দর্শন ঘটে। এই চলার পথের ধারে শেষ পর্যন্ত কেবল বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে কালকূট স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। গোপীদাসের সঙ্গে বক্রেশ্বর ঘুরতে ঘুরতে কালকূট বাউল, অবধূত ছাড়াও শ্মশানচারী বিভিন্ন সাধকের সাধনতত্ত্বের নানা বিচিত্র অজ্ঞাত তথ্য তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। অবধূতের পুরুষ প্রকৃতির মিলিত ধর্মাচরণ, প্রকৃতিকে মাতৃ রূপে দর্শন—এক আধিভৌতিক পরিবেশে বর্ণনা করেন। শ্মশানচারী ছাইভস্ম মাখা এক দিগম্বর পুরুষ ঠিক কিসের ভাবে গেরুয়া আলখাল্লা পরা গোপীদাসকে আলিঙ্গন করে, হাসি-কান্নায় মেতে ওঠে তার অর্থ অনুভব করতে চেষ্টা করেন। যার ফল স্বরূপ তাঁর মনে হয় শ্মশানের চারদিকের অন্ধকারে আগুনের আলোয় কী এক বিস্ময়কর গভীর মানবলীলা। যে ঘর থেকে এসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ডুব দিয়েছিলেন, সেখানে এখন দৃশ্যের পর দৃশ্য। ব্রহ্মানন্দ অবধূত ভৈরবী যোগোমতী, শ্মশানের চিতা, অঘোরী আশ্রমের নরমুণ্ডের কঙ্কাল, মুক্তির প্রহার, ভাবের আলিঙ্গন। যেন সুর থেকে অন্য সুরে, তাল থেকে অন্য এক তালে বিচিত্র রাগিনীতে বাজে। কালকূটের একজায়গায় চমক লেগে যায়, যখন অবধূত নিজেকে ফোঁপড়া ঢেঁকি, শ্মশানের কুকুর বলে যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। সাধনমার্গে শীর্ষে না পৌঁছানোর এই আর্তি তিনি গোপীদাসের মধ্যেও পেয়েছেন। যে নিজেকে পতিত বাউল বলে চোখের জল ফেলে। সব মিলিয়ে লেখক যেন তাঁর বর্তমান, দেশকাল, জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা বিস্মৃত হতে থাকেন। যেন কোনো এক কালান্তরের ওপারে, বিস্ময়াবিষ্ট রহস্যের দ্বারে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ভাবেন—

> ''সত্য মিথ্যার বিচার জানি না। মোক্ষ মুক্তির মূল্য বুঝি না। কিন্তু আমার এই সামান্য জীবন কালের স্রোতে, আমারই অপরিচয়ের দূর কাল এসে মেশে। সংসারে কত মানুষ, কত ধ্যান-ধারণা, কত তার বিচিত্র স্রোত নানা দিকে বহে। তার মাঝখানে আমি, আমার চলার পথের বাঁকে বাঁকে, কেবল জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকি।''[৭১]

এরপর লেখক যাত্রা করেন বাহান্ন পিঠের এক পিঠে, নাম যার অট্টহাস। সেখানে নাকি দেবীর ওষ্ঠ পড়েছিল, তাই নাম হয় অট্টহাস। বর্ধমান থেকে কাটোয়া, সেখান থেকে আহমেদপুর হয়ে পাঁচনদিতে নেমে গাঁয়ের পথচলা। অট্টহাস গ্রামের সঙ্গে অট্টহাস ক্ষেত্রের ব্যবধান অনেক। গ্রামের প্রান্তে ঘন ঝোপের বিশাল মহীরুহের বিস্তৃত অরণ্যের মধ্যে ভেসে থাকা দ্বীপ -এর মতো অট্টহাস ক্ষেত্র। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের পথে যেতে এক স্রোতস্বিনীর ধারে এসে পৌঁছান যেখানে চালক হিসেবে পুরোহিতের সঙ্গে পরিচয় ও মন্দিরের প্রাচীনত্বর নানান খবর পান। মন্দির দেখাশোনার কেউ নেই, তিনি দিনে একবার এসে পূজা দিয়ে যান। নির্জন মন্দিরের পাশে থেকে শেয়ালের ডাক, গাছের ওপরে শকুনের ডাক সব মিলিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিনের বেলাতেও গা ছম ছম করা অনুভূতি সৃষ্টি করে। পুরোহিতকে দর্শনী দিয়ে, তাঁর হাত ধরেই কালকূট বন পথ থেকে বেরিয়ে এলেন। বাহান্ন পিঠের পুরাণ কথা তিনি জানেন কিন্তু ওষ্ঠ রহস্য বোঝেন না, তবু সব মিলিয়ে এক গভীর কল্পনা মনোজগতে তরঙ্গ তোলে—

> ‘‘পৃথিবীতে কত বিস্ময় আছে। তবু বাঙলার এমন বৈচিত্র্য আর কোথায় আছে জানি না। আকাশের নিচে, দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝে এক অরণ্যদ্বীপ। তার মধ্যে কোন্ মানুষেরা খুঁজে পেলো দেবীর ওষ্ঠ! নাম দিয়েছে, তার অট্টহাস। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সঁপেছে নিজেকে।’’[৭৫]

লেখকের মনে হয়েছে, এ সবের মধ্যে যে ভাবনা নিহিত আছে হয়তো তার মধ্যে তিনি নিজেকে সঠিক খুঁজে পান না। অথচ তাঁর সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই অট্টহাস যেন কোন্ এক স্তরে চাপা পড়ে আছে। অট্টহাসের প্রকৃতি, পরিবেশ, রক্তচক্ষু বামনাকৃতি পুরোহিত, সব কিছুর মধ্যেই যেন তাঁর ছায়া ফেলে চলেছেন। সব কিছুতেই এক অচিন অনুভূতির দোলায় মন দুলে ওঠে। কোন্ এক রহস্য পারে তাঁর মন নির্বাক স্তব্ধ হয়ে থাকে।

এরপরে কালকূট সাঁওতাল পরগণা ছাড়িয়ে চলে আসেন জয়দেবের কেঁদুলি মেলায়। কেন্দুবিল্ব, বাউলের পাঁচ রসিকের, এক রসিক লীলাক্ষেত্র। বাউল বলে ‘জয়দেব যাব’ অর্থাৎ তার মানেই কেঁদুলি যাওয়া। পৌষ সংক্রান্তির এই দিন হলো জয়দেবের স্মারকোৎসব। যাত্রাপথে ভিড় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি তার কষ্টটা ভুলিয়ে দেয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে শালের

বিস্তৃত বন তার মাঝখান দিয়েই লালমাটির শক্ত সড়ক। সবখানেই লালে লাল। শাল বনের পাতায় ডালে ডালে লাল ধুলার মাখামাখি। যেন আলখাল্লা জড়ানো বিবাগী বাউলে পরিণত হয়েছে মহীরুহগুলি। পথের ঝোপঝাড়েও ধুলো মাখামাখি। যাত্রীরাই বা বাকি থাকে কেন! লাল ধুলা তাদেরও গায়। সব মিলিয়ে এক ভালোলাগার আবেশ সৃষ্টি হয় লেখকের মধ্যে। কিছুটা এগিয়ে মেলার জমজমাট। বেদনাশা বটতলায়, অজয়ের ধার ঘেঁষে মস্ত জমির পরিসরে গাছতলাতে গেরুয়া রঙের ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি আলখাল্লার ছড়াছড়ি। যেখানে ডুপ্‌কি প্রেম জুরি, একতারা বাঁয়া গোপীযন্তরী, খোল করতাল খঞ্জনীর জমজমাট আসর। আবার পাড়হীন গেরুয়া থান পরা বৈষ্ণবীর রসকলিও দেখতে পাওয়া যাবে। যেখানে নাম করা ক্ষ্যাপা কিংবা বাবাজীদের সমাবেশ সেই সব আস্তানায় দেখা মেলে কোট পাতলুন সাহেবের, ধুতি পাঞ্জাবীতে ঝকমকানো বাবুর দলের। সেই সঙ্গেই আসর আলো করে মেমসাহেব আর বিবির দল। সব মিলিয়ে, তবু ভালো লাগে। যেন নানা রূপের ছন্দে, এক অরূপের সুর বাজে। রূপে রূপে লহর তোলে।

ঝিনির সঙ্গে কালকূটের আলাপ হয় পথ চলার টানে। হাসনাবাদ যাত্রাপথে ষ্টিমারে প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ। সেই পরিচয় আরেকটু গাঢ় হয় শান্তিনিকেতনের পুনর্মিলন উৎসবে। কোপাইয়ের নির্জনতায় ঝিনি তার জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা কালকূটকে জানিয়েছিল। ওর কৈশোরেই এক রাগী বিষন্ন দুঃখী বন্ধুর সঙ্গে অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে বিয়ে হয়। সেই অসুস্থ স্বামী কিছুদিন পর মারা যায়। অথচ বাবা-মাকেও সে নিয়ে কিছু বলে উঠতে পারেনি। তারপর বন্ধুর হাতে তার দাদার মৃত্যু ঘটে। এই সব নিয়ে একটা তার জীবনের গভীরে মিশে গেছে। তারপরেও হয়তো আর দশটা মেয়ের মতো নিটোল সংসার পেতে জীবন কাটানো ঝিনির পক্ষে কিছু আশ্চর্যের হতো না, কিন্তু ওর ভিতরে আছে এক বিড়ম্বিত মন তাই তার এই ছুটে বেড়ানো না পাওয়ার মধ্যেই ডুব দিয়ে চোখের জলেই যেন হাসির কিরণ দেখতে চায়। তাই অনেক দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে, অনেক সংশয়ে হাতড়ে ফিরে কেঁদুলিতে এসেছে। পথের ভালোলাগা, পথের দেখা গভীর ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। ওর সমস্ত অবয়বে এক যোগিনীর ছায়া রূপ। তার ভালোবাসা দু চোখের নোনাজল হয়ে বারবার বয়ে গেলেও নিরুপায় সেই পথিক, যার নিরন্তর পথ চলাই হলো উদ্দেশ্য। সে কী করে বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে পারে। তাই যে যা-ই বলুক, হাসুক, কাঁদুক, রাগুক সব মিলিয়ে তবুও যেন

একটা সুর বেজে ওঠে, বেসুরের আঘাত লাগে না। তাঁর ধারণা—

> ''যে অচিনের খোঁজেই ফিরি, ফেরার তালে, যতই দ্বিধা সংশয় ভয় বিরক্তির দোলা লাগুক, জানি যাব 'আপন দেল্-এ'। ফকির যেমন তার মুরশেদের দেল্-এ যায়, তেমনি আমার নিজের দেল-এ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাব এই সুরটুকুও। কোথাও একটু থেমে ঝুলি ঝাড়া দিলেই এই সুরটুকু বাজবে মনের কোণে। সেইটুকু আমার প্রাপ্য।''[৭৬]

তাইতো সমস্ত কিছুর পরে ফেরার পালা আসে, মন বলে ফিরে চলো। রাঢ়ের উত্তর থেকে দক্ষিণের ঢলে নামতে নামতে মনের দৃষ্টি ভরে যেন প্রকাণ্ড এক আলখাল্লা দোলে। কত যে ধূলা, কত যে রঙ তার গায়ে! দেশান্তরের ধুলা রূপান্তরের রঙ! যত সেলাই, পট্টিতালি মারার রঙে। তালিতে তালিতে রঙ। কত ঝলক দেওয়া তালি এই আলখাল্লায়। কালকূট তাঁর নিজের সম্বন্ধে মনোহরা প্রকৃতি ও মদন বাউলের কাছ থেকে শোনেন। তিনি নাকি কিছু খুঁজে মরছেন, গোপীদাসের কথায় চিতে বাবাজী, যার লক্ষ শুধু শিকারের দিকে। হয়তো বা এই মদন, গোপীদাস বাউলদের সব কথা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে এও সত্যি যে তাঁর নিজের মনের কথা অন্য কারোর মুখে কখনো এমন করে শোনেন নি। এঁদের কথা শুনেই যেন তাঁর মনে বার বার প্রশ্ন ওঠে—

> ''কী খুঁজি। কিছু কি খুঁজি! আমি কি কখনো এমন গতি পেয়েছি, যেন ফিরে যাবার কথা আমার কানে যায় না। চলি চলি চলি, এখন আর মরি কি না মরি। না হয় মরতেই আছি। এমন গতি কি আমার! না কি, এও সেই গতির কথা বারংবার বহু ডাকাডাকি, তবু যাই সেই তার কোলে, মরণ মরণ মরণ।''[৭৭]

লেখক যেন অনুভব করেন তাঁর চিরবৈরাগী মন ঘরের বাঁধন কেটে বার বার বেরিয়ে যেতে চায়। মনে হয়, অনেক দূরে কোথায় যেন ডারা ডুপ্‌কি প্রেমজুরি, একতারা বাঁয়ার মিলিত শব্দ ক্ষীণ সুরে বেজে ওঠে। তার সঙ্গে গানের কলি—

> ''দিনে দিনে হল আমার
> দিন আখেরি
> আমি কোথায় ছিলাম

সদায় ভেবে মরি।”[৭৮]

নিরন্তর পথ চলতে চলতে কালকূটের ক্লান্তি আসে না, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা ভার মোচড় দিয়ে ওঠে। অথচ যেন একটা ব্যাকুলতা। কিসের ভার, তা জানা নেই। হয়তো বা যে পথ তিনি পিছনে ফেলে আসেন, যা–কিছু ছেড়ে আসেন, তারজন্যই কেমন একটা ব্যথা ধরানো ভার অনুভব করেন। যে, অচিনের খোঁজে তাঁকে ফেরায়, সেই পাগলই যেন তাঁকে অহরহ পাগল করে তোলে।

জয়দেবে রাত পোহাতেই মাঘ মাস পড়ে যায়। ফেরার পথে নবদ্বীপের ধুলট উৎসবে কালকূট পৌঁছে যান। যত বৈষ্ণব কীর্তনীয়া, সকলের আগমন ঘটে নবদ্বীপে। যত নাম, তত গান, তত ধুলোমাখামাখি। সেখানের ধুলায় নিমাই চলেছে, যে ধুলায় নিমাই গড়াগড়ি দিয়েছে, সেই ধুলোয় ভক্ত গায়কের গড়াগড়ি। যত কীর্তনীয়া, মেয়ে-পুরুষ, ভদ্রাভদ্র, সকলেই নিমাই ক্ষেত্রে গান নিবেদন করতে আসে এ সময়ে। প্রথম নিবেদন এখানে, তারপরে গ্রামে জনপদে যত্রতত্র গান গাওয়া চলবে, মাধবী দাসীর গান, সুদেব গোস্বামীর গান। কালকূট এর আগে মন্দিরে মন্দিরে আখড়ায় অনেক গান শুনেছেন কিন্তু ধুলট উৎসব না দেখলে, এ গান না শুনলে নবদ্বীপের মরমে যে রসের ধারা বয়, তা জানতে পারতেন না। রাসযাত্রা বা অন্যান্য উৎসবে কোলাহল বেশি, সে রূপে ঠিক এ রূপ নেই। উৎসবের শেষে কালকূটের আবার পথ চলা শুরু হয়। বারোই ফাল্গুন গাজীর নিমন্ত্রণে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলায় যেতে হবে, মনে মনে ব্যাকুলতা যেন বাড়ে। তবুও ফেরার পথে মাঘের পূর্ণিমায় বর্ধমানের কুলীনগ্রাম হয়ে যান। সেখানে কেবল শ্যামের মন্দির আর মেলা না, ভক্ত হরিদাসের একটি স্মৃতিমন্দির আছে। কুলীনগ্রাম থেকে নৌগ্রামের জলেশ্বরের শিব ক্ষেত্রে যান। ফাল্গুনে শিবরাত্রির উৎসবে মেলা হয়। কিন্তু জলেশ্বর ক্ষেত্রের অরণ্যের নিবিড়তা যেন বেশি করে মন ভুলিয়ে দেয়। লেখকের মনে প্রশ্ন, বনের নিরালায় কে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিল কে জানে। তবে বাঙলাদেশের বেশির ভাগ দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠাই দেখা যায় নদীর কূলে, ঘর-গৃহস্থের সীমানা পেরিয়ে আকাশের নিচে, কোনো এক সুদূর বিস্তৃতিতে। তাঁর ধারণা—

> ‘‘মানুষ সেখানে আর এক জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। দেখি, পথ চলি, দেখি। ‘তবু ভরিল না চিত্ত।’ ভরবেও না। কিসের খোঁজে ফেরা,

তার সন্ধান যে জানিনে, তার ভরাডুবির কোনো কথা নেই। শুধু এই এক, দেখি, চলি আর দেখি, নানা মানুষ। ভাবের পটে, ছবির মতন। এত বিচিত্র, বিস্ময়কর, অভয় মন-প্রাণের শূন্যতার কথা ভুলে যাই। বৈরাগ্য আমার নেই, আমি বৈরাগী না। তাই অনেক শূন্যতার মধ্যেও যে বিচিত্র বিস্ময়কে দেখি, তার সামনে দাঁড়িয়েই সহসা স্তব্ধ হয়ে যাই। বুকের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি।"[৭৯]

নোনামাটির দেশে মামুদ গাজীর সঙ্গে তিনি পথ চলেছিলেন, গিয়েছিলেন নতুন জায়গার পথে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার গানে। তারই নিমন্ত্রণে হাড়োয়ার পথে পা বাড়িয়েছেন। বিদ্যাধরীর নদীর কূলে পীর গোরাচাঁদের মেলা দেখে লেখক ঠিক করেন দক্ষিণে, দূর দরিয়ার কূলে সুন্দরবন সাগরসঙ্গমে যাবেন। কিন্তু এত ব্যাকুলতা নিয়ে, মেলায় প্রতিটি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যে মুখকে খোঁজেন, সে মুখ তার কথা রাখেনি। সেই কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি, পান খাওয়া লাল ছোপ দাঁত, গহীন দরিয়া চোখ নিয়ে গাজী কোথায় গেল। দেখা হল গাজীর প্রকৃতি নয়নতারার সঙ্গে, সেই খবর দিলো গাজী ডানসার জলে ডুবে মারা গিয়েছে। পাজী গাজীর এমন হঠাৎ অর্ন্তধানের খবরে লেখক মুহূর্তে চোখের সামনে সব অন্ধকার দেখেন। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের সহস্র দরকারের কোনো কিছুই ছিল না গাজীর কাছে বরং এক সুবিশাল অদরকারেই তাকে প্রয়োজন ছিল। যে অদরকারের কথা সংসারের কাউকে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু গাজীহীন নয়নতারা কেন এসেছে পীর গোরা চাঁদের মেলায়? গাজীর জন্যেই কী? এই তো সেই স্থান, যেখানে তারা পুরুষ প্রকৃতির প্রথম লীলায় নিজেদের দেখা পেয়েছিল। বিচ্ছেদের দিনেও নয়নতারা যেন সেই প্রথম দিনের মিলন স্থানে কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ঝিনির সঙ্গেও কালকূটের এখানেই শেষ দেখা ঘটে। প্রথম দেখা হওয়ার দিনের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ঝিনিও যেন বৈরাগীণি হয়ে উঠেছে। সে তার নাগরিকতার সমস্ত চিহ্ন ভুলে গিয়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছে। নয়নতারা আর ঝিনি যেন তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে, তারা যেন দু'জনে এক। এখান থেকে কালকূট আবারও পথ চলা শুরু করেন। এবার তাঁর ভেসে যাওয়ার পথ জঙ্গলে, সাগরে। আবারও চলবে অজানা পথে অজানা বিচিত্র মানুষের সুখ-দুঃখের নানান অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে এগিয়ে চলা। পথের সঙ্গী সত্য মাঝি—

''সত্য বাউল নোঙর তুলে নৌকা ঠেলে দেয় জলে। তারপরে হাত দিয়ে, বিদ্যাধরীর জলের গণ্ডুষ নিয়ে আমার মুখে মাথায় ছিটিয়ে দেয়। নিজের মনেই গম্ভীর স্বরে বলে, 'জয় গুরু, যাত্রা করি।' বিদ্যাধরীর জল আমার মাথা থেকে মুখে এসে পড়ে। ঠোঁট চুঁইয়ে জিভে স্বাদ পাই, জল লবণাক্ত। কিন্তু আমার চোখ ঝাপসা। ঝিনিকে আর দেখতে পাই না। হাড়োয়ার ভূমি, পীর গোরাচাঁদের মেলা, কিছুই চোখে পড়ে না।''[৮০]

কেবল মনে হয়, কোথাও যেন গাজীর গুনগুনানি শোনা যায়, যেন—

'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।'... (ঐ)

সত্য মাঝির নৌকা বিদ্যাধরীর স্রোত বেয়ে চলতে থাকে। আমরা দেখেছি কালকূট 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মধ্যে একটা কিছুর খোঁজ বা সন্ধান করেছেন যা তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'কোথায় পাব তারে' -এর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' তে যেমন বলরামকে পেয়েছিলেন তেমনি এই উপন্যাসেও আমরা তাঁর প্রায়সব সময়ের সঙ্গী হিসেবে গাজী চরিত্রকে পাই। এই গাজী মামুদ যেমন তার জাগতিক সমস্ত দুঃখ ভুলেছে সহজ মানুষের মধ্যে আনন্দ খুঁজে এক মুরশেদের নামে তার দিন গুজরান। এই সমস্ত মনের মানুষের মধ্যেই যে তার মুরশেদের যেন অবস্থান অনুভব করে হাসি-গানে-আনন্দে সর্বক্ষণ মেতে থাকে। তার প্রতি এই মুগ্ধতা লেখককেও যেন আত্ম দর্শনের যাত্রা পথে এগিয়ে দেয়।

অমাবস্যায় চাঁদের উদয় : (১৯৭৫)

'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' নামক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশকালে লেখক ভূমিকা দেন এইরকম—

'' 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' মূলত একটি সাধন বিষয়, যা প্রকৃতি পুরুষের মিলন জাত। কিন্তু এ মিলন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা নয়, বরং বলা যায়, একটি প্রোসেস মাত্র। আমি নিজে সাধক নয়, অতএব অভিজ্ঞতাও সাধকের নয়, সাধকের জীবনী ও ব্যাখ্যা আমার মূলধন।

... আমি নিজে শাক্ত পরিবারের সন্তান, ছেলেবেলা থেকে আমাদের গৃহে কিছু কিঞ্চিৎ ঘটনা আমি দেখেছি, যা আমার অবুঝ মনে দাগ কেটেছিল... শক্তি সাধনা বা তন্ত্রসাধনা আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ঠিক মতো ভাগ করলে, তিনটি বিভাগ— হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বাউলতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য সকলের এক। 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' এবং এ কথাটি প্রধানত বাউলরাই তাদের গানে বলেছেন। লালন গেয়েছেন—

'অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে, থেকো সদয়
ত্রিবেণীতে থেকে বসে।'—

এরকম আরো আছে। ... হিন্দুতন্ত্রেও ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যার নাম, এবং এ সবই সাধক-সাধিকাদের শরীরের ভিতরের নাড়ি ও অঙ্গের নামের প্রতীক মাত্র।...''[৮১]

দেবী কামাখ্যার মাহাত্ম্য কালকূটকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল আসামে। ফলে পর্বত ও তীর্থভূমি একই সঙ্গে দুই দেখা থেকে জন্ম নিল এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়।' বইটির ঘটনাকাল ১৯৪৭ সাল।

এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৮১ সালের 'আনন্দলোক' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। পরবর্তী বাঙলা নববর্ষের দিন 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : 'বিনয় ঘোষ (কালপ্যাঁচা) শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' নামটি বাউল রাজা লালন ফকিরের সাধন সঙ্গীতের একটি অন্যতম পংক্তি বা কলি থেকে নেওয়া। আর গ্রন্থটি তন্ত্র সাধনার পটভূমিকায় রচিত। 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' এমন একটি বিষয় যা প্রকৃতি পুরুষের মিলনলব্ধ সাধন ফল। কালকূট এই মিলনের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন কামরূপে কামাখ্যা মন্দিরে প্রাণতোষ বাবা ও পবিত্রী মায়ের সাধন লীলা থেকে। এই সাধন লীলার উপস্থিতির কারণে 'তন্ত্র ও বাউলের' সাধন প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকাংশেই সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। কালকূট নিজে কোন সাধক নন, কিন্তু সাধকের জবানী

ও ব্যাখ্যাকে মূলধন করে অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল ভাষায় পাঠকের সামনে তাঁর অভিজ্ঞতা মেলে ধরেছেন। যদিও তিনি নিজে একজন শাক্ত পরিবারের সন্তান এবং সেই সূত্রে পিতার গুরুদেবের কিছু কিছু অলৌকিক ক্রিয়া শৈশব থেকেই তাঁর মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ সালে কিন্তু এর পটভূমি বহু বছর আগেকার, যখন লেখকের বয়স মাত্র চব্বিশ বছর তিনি তখন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা চালিত হওয়ার পাশাপাশি লেখকের মধ্যে জীবনরস রহস্যের সন্ধানী, সৃষ্টিতত্ত্বের মৌল লক্ষণ আবিষ্কারে অনুসন্ধিৎসু একটি সত্তার সহাবস্থান ছিল; তারই প্রকাশ ঘটে এই উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনে। এই উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কিন্তু এ কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় অনেক বছর পর, ১৯৭৫ সালে। তন্ত্রসাধিকা বিমলা পবিত্রী মা ও ভৈরব প্রাণতোষ বাবার কাহিনি '৭৫ সালের বস্তুবাদী সমরেশকে যে আবিষ্ট করে ফেলেছিল তার অন্যতম কারণ, লেখক তখন অন্তরের মধ্যে জগৎ ও জীবনের জটিল মর্মরহস্য অনুধাবনে সুতীব্র পিপাসা অনুভব করছিলেন। এই সময়টাতে সমরেশের নামে প্রকাশ পায়—মানুষ শক্তির উৎস (১৯৭৪), আমার আয়নার মুখ (১৯৭৪), প্রাণপ্রতিমা (১৯৭৫), হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা (১৯৭৫), বিজড়িত নামে বিভিন্ন উপন্যাস। এই উপন্যাসে যে তীর্থটির সবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হলো আসামের বিখ্যাত কামাখ্যা তীর্থ। যেখানে কালকূট তাঁর তথাকথিত 'ভারত-আত্মা' অন্বেষণে গিয়েছেন। বলা চলে তন্ত্রতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা গভীর ও আধুনিক চিত্তের নিকট উপস্থাপন যোগ্য হয়ে বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— '' 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' এ মনে হয় কালকূট নিজেই কিছু একটা খুঁজছেন।''[৮২] সম্ভবত তাঁর এই উপন্যাসে অন্বিষ্ট বিষয়বস্তু হলো তন্ত্রতত্ত্ব।

বলা চলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে শাক্ত সাধনা বা তন্ত্র সাধনার নানা ব্যাখ্যা চলে আসছে। এদেশে হিন্দুতন্ত্র-বৌদ্ধতন্ত্র-বাউলতন্ত্র। তন্ত্রের এই তিনটি শাখা লক্ষ করা যায় আর এই তিন বিভাগের লক্ষ্যই হলো বিশেষ সাধক পদ্ধতিতে মুক্তিলাভ।

লেখক বলেছেন যে এবারের বাইরে বের হবার ডাকটা অনেক দিন আগের। আর ডাকটা এমনই যে, হঠাৎই এক শীতের দিনে ঝোলা কাঁধে নিয়ে একেবারে রেলগাড়ির কামরায়। অবশ্য এ যাত্রা যে একেবারে ঘরছাড়া ডাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা তা কিন্তু বলা যায় না, কারণ গৌহাটিতে এক রেলের কর্মচারী বন্ধু ছিলেন এবং সেই বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিতেই আসামগামী

রেলের কামরায় তাঁর উঠে বসা। এ কাহিনির কোনো বস্তু ভিত্তি আছে কিনা বলা যায় না। তবে তাঁর জীবন কথায় ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ যাওয়ার কথা থাকলেও আসাম যাবার কথা পাওয়া যায় না। ১৯৪৭ -এ দেশ বিভাগের পর চার বন্ধু মিলে বর্তমান বাংলাদেশে গিয়ে ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে কালকূট ট্রেনের কামরার মধ্যে এক ধর্মপ্রাণা নারীকে উপস্থিত করেছেন। যাঁর ব্যক্তিত্ব, বাচনভঙ্গি, দেহ সৌষ্ঠব, মার্জিত রুচি লেখকের মনকে আকৃষ্ট করেছে। ১৯৪৭ এ সমরেশ বসুর জীবন বেশ কষ্টের ভিতরেই কেটেছে। সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন প্রতিদিনকার লড়াই চালাতে হচ্ছে। তার মধ্যে আসাম গিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে উপন্যাসের চরিত্রের পক্ষে বাস্তব জীবনের লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ থাকার প্রয়োজন নেই। সমস্তটাই লেখকের কল্পিত কাহিনি হতে পারে। কল্পিত হলেও কাহিনিকে লেখক বেশ আকর্ষণীয় এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। উপরন্তু কাহিনির উপস্থাপনাও বেশ নাটকীয়। লেখক বুঝেছেন একটানা কথা বলে বর্ণনামূলক কাহিনি রচনায় সে আকর্ষণীয়তা থাকবে না। তাই ট্রেনের কামরায় বিমলা পবিত্রী মাকে উপস্থিত করে তাঁর রহস্যময় জীবন যাপনেরও ধর্মজীবনের প্রতি পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করেছেন। ট্রেনের কামরার যাত্রীদের বাস্তব চরিত্র চিত্রের বিপরীত দিকে পবিত্রী মা ও জগৎ সন্ন্যাসিনীর গূঢ় গভীর অথচ বাক্‌স্বচ্ছল চরিত্র উপস্থাপনার বৈপরীত্য গড়ে লেখক আমাদের সামনে এই রহস্যময় জীবন সাধনার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছেন। এবং ট্রেন যাত্রার শুরু থেকে কামাখ্যা পীঠে ভৈরব প্রাণতোষ বাবার আশ্রম পর্যন্ত সীমারেখার মধ্যে, লেখকের মনে সেই পবিত্রী মায়ের যে চরিত্রাঙ্কন তা তন্ত্রের মূল তত্ত্বকে গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ারই প্রয়াস বলা যেতে পারে। শুধু পবিত্রী মা নয়, তাঁর সঙ্গে আরেক যুবতী সাধিকা জগৎ সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও লেখক লক্ষ করেছেন আধ্যাত্ম প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। লেখক প্রথম থেকেই এই দুই সন্ন্যাসিনীর চেহারা, বেশবাশ, বাক্‌ভঙ্গি এবং শুচিশুভ্র উজ্জ্বলতার কারণে একপ্রকার আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। তাঁর কৌতূহল একটাই, এঁরা করেন কী, ভাবেন কী এবং কী কী চান এঁরা এই সংসারে। পবিত্রী মাকে অন্যান্য সন্ন্যাসিনী বা ভৈরবীর তুলনায় দেখে ধনীর গৃহিনী বলেই মনে হয়। তাই কালকূট তাঁকে রাণী সন্ন্যাসিনী বলেছেন। পবিত্রী মায়ের তত্ত্বজ্ঞান কথা যেমন বিভ্রান্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তেমনি আরেকটি মুগ্ধতার কারণ হলো পবিত্রী মায়ের অনায়াস, সুচারু সংস্কৃত উচ্চারণ। এছাড়াও লেখক তখন জগৎ ও জীবনের জটিল মর্ম রহস্যকে অন্তরের মধ্যে

অনুধাবনের এক সুতীব্র পিপাসা অনুভব করছিলেন। ফলে ট্রেনের কামরায় বসে বসে রমাঁ রল্যাঁর 'বিমুগ্ধ আত্মা' পড়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু ওঁর মন আকৃষ্ট হয় পবিত্রী মা ও জগত সন্ন্যাসিনীর প্রতি। ট্রেনের কামরায় এক দম্পতির মুখে লেখক তাঁর মহিমা জ্ঞাপন করেছেন। এর ফলে লেখকের পবিত্রী বিমলাকে বুঝতে সাহায্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শণেই লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যান নি। বরং চেষ্টাকৃত একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু এই রমণী তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং সহজ বাক্-আলাপে ক্রমশ লেখককে মুগ্ধ এবং আবিষ্ট করে তুলেছেন। লেখকের দূরত্ব রাখার চেষ্টা এবং ক্রমে এই আবিষ্ট হয়ে ওঠা এরই অন্তক্রমে গল্প এগিয়ে গেছে। লেখকের এ আকর্ষণ কিসের? লেখকের আত্মগত উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা শুনেছি— ''বিশ্বাসই সন্ধানের সূত্র। বিশ্বাস থাকলে সন্ধান আসে, সন্ধান থেকে উৎসর্গ, সম্ভবত বিশ্বাসের জগতের এটাই ধরণ। কিংবা কে জানে, সন্ধান করেই হয়তো বিশ্বাসকে পেতে হয়।''[৮৩]

অর্থাৎ কালকূটের এই আত্মগত চিন্তার সূত্র ধরে এগোতে থাকলে, পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁর ধর্ম্মবোধের মধ্যে অভিসারের পদক্ষেপ লক্ষিত হয়। কিন্তু লেখকের মন্তব্য অন্যরকম। উক্ত সন্ন্যাসিনীদের সমাহিত ভাব বা আচরণ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগায়, এ কোন্ গভীর বিশ্বাস জাত? কী তাঁদের বিশ্বাস। লেখকের তা জানা নেই কিন্তু দুঃখ অপমানের মধ্যে কোনো একটা বিশ্বাসের কাছে তিনি নিজেও কখনও নিজেকে সঁপে দিতে পারেননি। নিজের মধ্যে তার কোনো অঙ্গীকার তিনি দেখেন নি।

ট্রেনের কামরায় লেখকের আর 'বিমুগ্ধ আত্মা' পড়া হয়ে ওঠে না। তার পরিবর্তে কৌতূহলী কালকূট সারা রাত ধরে পবিত্রী মায়ের সঙ্গে কথোপকোথনের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। লেখকের মনে প্রশ্ন জাগে জগতের রূপ যৌবন, কণ্ঠে সংগীত সুধা থাকতেও কেন তিনি এই বয়সেই সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। কালকূট পবিত্রী মাকে প্রশ্ন করেছেন যে তাঁরা তান্ত্রিক কিনা। যার উত্তরে পবিত্রী মা বলেছেন তিনি হলেন তান্ত্রিকের সর্বসিদ্ধিদাত্রী এবং অভেদজ্ঞান মায়াবীজের মন্ত্রে শুদ্ধ, তিনি শক্তি। তিনিই হলেন বীরের শক্তি ও শিব। তিনি জগৎস্বরূপিণী, ব্রহ্মাণ্ড।

পবিত্রী মা নিজেকে প্রেমের শক্তি বলেছেন। তিনি বলেছেন সংসারে প্রত্যেক স্ত্রী বা নারী হলো সেই শক্তি স্বরূপিণী। তাই কালকূটকে উপদেশ দেন মেয়েদের সেবা করতে,

জগৎ সংসারকে নারীস্বরূপ দেখা, তাদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার না করে, মনে মনে প্রণাম জানানোর কথা। যেন কোন নারীকেই তিনি খারাপ বা ছোট না ভাবেন। এতে তাঁর ভালোই হবে। কিন্তু লেখক জগৎকে স্ত্রীস্বরূপ করে দেখার তত্ত্ব না লাভ করলেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, মাতৃঋণ কেউ কখনো শোধ করতে পারে না। প্রাণের মুগ্ধতা হলো মনুষ্য হৃদয়ের এক বড় সম্বল এবং কালকূট পবিত্রী মা ও জগতকে দেখে সেই মুগ্ধতাই বোধ করেছেন।

কালকূট বারবার অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের কথা প্রসঙ্গে তন্ত্রসাধনতত্ত্বের অতিগোপন কথাকে পবিত্রী মায়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই সাধন পথের পথিকদের শপথ করা থাকে যে— 'আপন সাধন কথা/না কহিবে যথাতথা।'তা জানেন শুধু গুরু, যিনি কিনা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন। আর জানেন যিনি সাধনসঙ্গী। যিনি কৌল শক্তির পূজা করেন। এবং অন্য কারোর কাছে এর ব্যাখ্যা করলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই পাতকে পরিণত হবে। নিজের স্বামী যদি সাধনার সাথে যুক্ত না থাকেন, তাহলে স্বামীকেও বলা যায় না। এ এমনই গূঢ় সাধনা যে গুরুর কাছে নিজেকে সঁপে না দিলে, এসব সাধনতত্ত্বের কথা জানা যায় না। পবিত্রী আরো জানান যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এত কথা বলেছেন কিন্তু অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের কথা তিনি কখনো বলে যাননি কোথাও কিন্তু সে সাধন তাঁকেও করতে হয়েছিল। সেই জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে— 'কালীই তো ব্রহ্ম রে।'

পবিত্রী মা জানান শক্তিই সব আর শক্তি মানেই নারী। অর্থাৎ যে কৌল নিজেকে সত্যিকারের শিবজ্ঞানে, শক্তির পূজা করেন, তিনিই অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ঘটাতে পারেন। শক্তি-সাধনা হল নারী পুরুষের একটি গুহ্য সাধনাতত্ত্ব। আর এই গূঢ় তত্ত্বের আভাস আমরা পবিত্রী মায়ের উক্তি থেকে পাই—

> ''ভোগ-মোক্ষ মানে হলো, ভোগের মধ্য দিয়ে মোক্ষ লাভ।... ভোগ-মোক্ষই হলো, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়... আগমোক্ত পতি শিব স্বরূপ, তিনিই গুরু, তিনিই কূলবধূদের প্রকৃত স্বামী, বিবাহিত স্বামী স্বামী নয়। কুলপূজায় বিবাহিত স্বামীকে ত্যাগ করলেও দোষ হয় না। কেবল বেদোক্ত কাজে বিবাহিত স্বামীকে ছাড়া চলবে না।''[৮৪]

এই প্রসঙ্গেই পবিত্রী মা আবার বললেন যে, প্রেমই শক্তির আধার। কামাখ্যা পীঠে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালকূট আমিন গাঁয়ে রেল কোম্পানির স্টীমার চড়ে আবার পাণ্ডু

থেকে ট্রেনে গৌহাটিতে বন্ধুর কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হন। বন্ধু রেলের চাকুরে; রেলেরই এক কর্মচারীর কন্যার সঙ্গে তার প্রণয়। সেই মেয়েটি তার ভাবী বন্ধুপত্নী। যাতে বন্ধুর প্রাক্-বিবাহ প্রণয়ে কোন রকম রসভঙ্গ না হয় সেই কারণে, বন্ধুকে রেহাই দিয়ে কালকূট নিজের মনেই ভিন দেশের প্রকৃতির কাছে নতুন অভিসারে বেরিয়ে পড়লেন।

গৌহাটি আসার দিন চারেক পরে লেখক পঞ্চম দিন ভোরবেলা গেলেন কামাখ্যা দর্শনে। যদিও যাত্রাটা খুব সহজ না। পাহাড়ের রাস্তা রীতিমতো খাড়া। চারিদিকে শ্রীফলের বৃক্ষ আর গাছের ডালে ডালে ফলের ছড়াছড়ি। লেখক রাস্তার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তির কথাও পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে, এ রাস্তা নরকাসুরের দ্বারা তৈরি। সেই দাপুটে অসুর রাজা ষোল হাজার রূপসী কন্যাকে আটকে রেখেছিলেন। তারপর কৃষ্ণের দ্বারা মুক্ত হয়ে তারা ষোড়শ সহস্র গোপিনীতে পরিণত হন। নরকাসুর ছিলেন কামাখ্যার রক্ষক কিন্তু অনিষ্ট হলো দেবী কামাখ্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে। দেবী প্রস্তাব শুনে চুক্তি করলেন যে নরকাসুকে এক রাত্রের মধ্যে একটি মন্দির, একটি পুকুর কাটিয়ে দিতে হবে এবং সমতল থেকে একটি রাস্তা পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত তৈরি করে দিতে হবে। অবশেষে নরকাসুরকে রাজি হতেই হলো। একে একে সবই যখন প্রায় শেষ, রাস্তাও তৈরী হয়ে যায় তখন, এমন সময় যামিনী শেষের ঘোষণা বেজে উঠলো মোরগের ডাকে। সুতরাং বিবাহ বাতিল। নরকাসুর রেগে গিয়ে প্রভাতের সংবাদবাহী কুক্কুটকে কেটে ফেললো। সেই থেকে ন' মাইল দূরে কুকড়াকাটা বলে একটা জায়গারই নাম হয়ে গিয়েছে।

কামাখ্যা যে এক প্রাচীনতম পীঠস্থান, সেটা নানা পুরাণেই উক্ত হয়েছে। বিশেষত 'কালিকাপুরাণ' এবং 'যোগিনীতন্ত্রে'। তবে কামাখ্যা দেবীর আরেকটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যা কোচবিহারের রাজবংশকে তাঁর দর্শন নিষিদ্ধ করেছে। সুদূরে কোন্ এক ঢাকি নাকি এমন সুন্দর ঢাক বাজাতো, কামাখ্যা দেবী একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে, সেই ঢাকের তালে তালে নাচতেন। ঢাকির মুখে এই কথা শুনে, কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ একদিন সেই নাচ দেখে ফেলেন। কামাখ্যা দেবী ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলেন, কিন্তু রাগ করে ঢাকির মুণ্ডুটা দিলেন উড়িয়ে, আর রাজাকে দিলেন অভিসম্পাত, তাঁদের বংশের কেউ কোনদিন কামপীঠ দর্শন করলে, তাঁদের বংশই চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। সেই থেকে নাকি কোচবিহার রাজবংশের কেউ আর কামপীঠে আসেন না। তবে কামপীঠের আকর্ষণকে নিয়ে মানুষের মধ্যে সম্ভবত একটি আদিম রিপুর

অনুভূতি জড়িয়ে আছে। সে বিষয়ের কিংবদন্তী আর প্রবাদের ছড়াছড়ির পাশাপাশি নানান তুক্‌তাকের কথাও প্রচলিত আছে।

কালকূট 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' নামক এই গ্রন্থে তন্ত্রসাধনার এক বীরাচারী সাধক বা সিদ্ধপুরুষের কথা বলেছেন, যিনি লেখককে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রেমই সত্য। কামাখ্যাপীঠে ভৈরব প্রাণতোষ বাবার নামেই আশ্রম। সেই প্রাণতোষ বাবার প্রশ্রয়েই কালকূট কিছু লীলা প্রত্যক্ষ করেন। প্রাণতোষ বাবা তান্ত্রিক সাধক। তাঁর ভৈরবী পবিত্রী বিমলামা। এই তান্ত্রিক সাধককে সেখানে সকলেই ভয় পায়। তিনি অত্যন্ত ক্রোধী এবং রুদ্ররূপী। রেগে গেলে ভক্তদের প্রতি কীরূপ প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ করেন তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন সেই আশ্রমে। পবিত্রী মায়ের ভিতর দিয়ে যেমন শক্তিতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্ব ফুটে উঠেছে, তেমনি তন্ত্রের শিবতত্ত্বের রূপ ফুটে উঠেছে প্রাণতোষ বাবার মধ্যে। প্রাণতোষবাবা নাড়ীশোধন, বায়ু সংযম ইত্যাদির প্রয়োগ রীতি যে মানুষের দেহমনে বিশাল শক্তিসঞ্চার করে কালকূটকে তা জানিয়েছেন। লৌকিক জগতে তাই যে অলৌকিক মায়ার সৃষ্টি করে তা বলেছেন।

কামাখ্যা পীঠের ভৈরব প্রাণতোষবাবা কালকূটের কাছে অমাবস্যায় চাঁদের উদয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন—

> ''শুধু পানপাতা, বা শুধু সুপুরি, বা খয়ের বা শুধু চুন, কোনোটাই আলাদা করে মুখে দিলে, মুখ লাল হয় না। ... সব একসঙ্গে করে চিবোলে, লাল রস হয়। ... একে বলে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ গুণগত পরিবর্তন। এখন আমি যদি তোকে বলি আলাদা আলাদা সব বস্তুগুলো অমাবস্যা, আর তার মধ্যেই লাল রসের চাঁদটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে এদের মধ্যেই রয়েছে ... এখন, ধর ওই সব পান খয়ের সুপুরি, ওগুলোকে আমি বস্তু বললাম। সমূহের আধার আর শরীরের ভিতরের নানা নাড়ীর কথা বললাম, যেগুলো একযোগে মিললে, একটা গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তফাৎটা হচ্ছে এই, লাল রসের মতো, চাঁদের উদয়টা দেখবার বিষয় না, ওটা অনুভবের বিষয়।... শরীরের মধ্যে... প্রধান তিনটি ... ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না... নাড়ীর সেই ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, তাদের মধ্যে যখন মিলন হয়,

তখন যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে চাঁদের উদয়।”[৮৫]

প্রাণতোষ বাবা বোঝার সুবিধার জন্য আরো বলেন যে চাঁদের উদয়ের যখন যোগ ঘটে, তার অনুভূতি অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব না কারণ, রং কানার মতোই চোখ থাকতেও সে এলোমেলো দেখবে। সেইজন্য সাধক ব্যতীত অন্যের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কালকূট যেমন জগৎ সাধিকার গান শুনে তার ভেতর ফুল ফুটতে দেখেছিলেন, তারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাণতোষ বাবা বলেন আসলে তাঁর মধ্যেকার যত সুখ-দুঃখের বোধ সমস্ত অনুভূতি জগতের গান শুনে আনন্দময় অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছিল। এটা একটা গভীর অনুভূতির ব্যাপার। এবং এরই এক মহান উচ্চ অনুভূতিময় অবস্থার নাম হল অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। যেটা সাধনার দ্বারা ঘটে। প্রাণতোষ বাবার কাছে কালকূটের নতুন নামকরণ হয়েছে ‘ভাবের ভাবী’। প্রাণতোষ বাবা তাঁর এই প্রিয় ভাবের ভাবীকে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রেমই সত্য। বীরাচারী এই সাধককেও কালকূটের মনে হয়েছে পরম প্রেমিক এবং সাধিকা পবিত্রী মাকে মনে হয়েছে পরম প্রেমিকা। কালকূট মুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুভব করেছেন তাঁদের সেই প্রেম ভাবকে। তান্ত্রিক সাধনার এই সম্যক প্রাপ্তি সম্পর্কে কালকূট আরো জানতে চাইলে প্রাণতোষবাবা জানান যে, এ বিষয়ে সম্যক বোঝা সম্ভব নয়। তার জন্য দীর্ঘকাল সাধনা করতে হয়। যিনি মায়ের পূজায় সিদ্ধি লাভ করেছেন কেবল তিনিই তা উপলব্ধি করতে পারেন। লেখককে তিনি মনে রাখতে বলেন, শক্তির উপাসনাও প্রেম সাধনা। কালকূট ভৈরব প্রাণতোষ বাবা এবং ভৈরবী পবিত্রী বিমলামার মধ্যে সেই সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। প্রাণতোষ বাবা কালকূটকে তন্ত্রসাধনার কথা বোঝাতে গিয়ে বাউলের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন বাউলের গানের ভেতরেই সব কথা বলা থাকে। বাউলেরও তন্ত্রসাধনার মতো প্রকৃতি সাধনা আছে। বাউলরা গাঁজার নাম করে আসলে দমের কথা বলতে চায়। তারপর প্রাণতোষ বাবা বাউলেরই গানের কলি গেয়ে ওঠেন— ‘যেজন প্রেমের ভাব জানে না। তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা?’ কামাখ্যা পীঠের আশ্রমে ভৈরব প্রাণতোষ বাবা বা ভৈরবী পবিত্রী মা এঁরা কেউই অতিমানব রূপে দেখা দেননি বরং রসের মানুষকে সব সময়ের জন্য প্রেমেই ভাসতে দেখেছেন কালকূট।

পণ্যভূমে পুণ্যস্নান : (১৯৮৬)

পাটনা বাঁকাঘাট ঘুরে সোনপুরের গৌরীশঙ্করের মেলা দেখতে হাজির হন কালকূট।

আর এই মেলা পরিক্রমার অভিজ্ঞতা দিয়েই লেখক রচনা করেছেন 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' নামক উপন্যাসটি।

এই রচনাটি প্রথমে ১৯৮৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় ভ্রমর ছদ্মনামে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থটিকে লেখক উৎসর্গ করে দেন শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের নামে।

কালকূটের রচনাবলীর মধ্যে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত, তাঁর শেষতম রচনা 'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান' এবং এই গ্রন্থটির সঙ্গে তাঁর প্রথম দিকের সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানের সঙ্গে একটা ভাব সদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেবারে তিনি ট্রেনে কোলকাতা থেকে এলাহাবাদ যাত্রা করেছিলেন, এবারে এলাহাবাদ থেকে ট্রেনে চড়ে শোনপুরে যাত্রা। কুম্ভমেলায় যাচ্ছিলেন সেবারে আর এবারে আসছিলেন শোনপুরের মেলায়। সেবারে যাত্রা মানুষ দেখতে আর এবারে যাত্রা মানুষকে কী রকম পশুর মতো কেনা বেচা হয়, তাই দেখতে। আর পূর্বের মতো এবারেও মেলায় পৌঁছাবার আগেই ট্রেনের সহযাত্রীদের সঙ্গে ঘটে যায় কালকূটের হৃদয়ের নিবিড় নৈকট্য। এই গ্রন্থটি প্রকাশকালে সমরেশ বসু নামে তাঁর যে যে গ্রন্থ প্রকাশ পায় সেগুলি হলো—'তিন পুরুষ', 'দশ দিন পরে', 'জবাব' এবং যে ছোটগল্পগুলি প্রকাশ পায় সেগুলি হলো— 'বিবেকবান ভীরু', 'আমি তোমাদেরই লোক' ইত্যাদি।

কালকূট এবারেও গ্রন্থের শুরুতে ভ্রমণে পা বাড়াবার সেই চির পরিচিত কারণকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দেশ জুড়ে নানা জায়গায় নানা লীলা। কেবল যে পালা পার্বণের মেলার ডাকে ছুটে যাওয়া, তেমনটা ঠিক বলা যায় না। কোন প্রান্তের কোথা থেকে কখন যে ডাক আসবে, তাও আগে থেকে জানান দেওয়া থাকে না। বন-পাহাড়-সমুদ্র, নদ-নদী-খালে-বিলে-ঘেরা গ্রাম, নগরে-শিল্পাঞ্চলে, নির্জনে-ভিড়ে, সবখানেই ডাক পড়ে। এই হাতছানির ডাক আসে পশু পাখির কাছ থেকেও। লেখকের ভাষায় রূপের হাটের ডাক যাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে যায়, সে কোনদিন কৈফিয়তের জবাব দেবার দায় মানে না। সেই রূপের হাটের সঙ্গে তাঁর জীবনচর্চার যোগ আছে। এমনকি সেই রূপের হাটে তাঁর স্বরূপের সন্ধানও চলে। যদিও বিশ্বপ্রকৃতির রূপের হাটে স্বরূপের সন্ধান এত সহজ নয়, তাইতো কালকূটের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই এই সন্ধান প্রচেষ্টা নিরন্তর চলতে থাকে।

বাইরের ডাক সে যেখান থেকেই আসুক না কেন তা অনায়াসেই কালকূটের ভেতরে

খুশির উল্লাস তৈরি করে। তিনি জানেন যে, এ দেশের সব মেলাই ধর্মকে ঘিরে। শাস্ত্র পুরাণ দেবদেবীর মাহাত্ম্য যে জায়গায় নেই, কোনো মেলাই সেখানে জমে না। মূলত বেশির ভাগেরই অবস্থান হয় কোনো পুণ্যতোয়া নদীর কূলে। আর নদী যদি না-ই থাকে, জলাশয় পাবেই পাবে। আসলে ধর্মের যোগটা উপলক্ষ যদিও সেই উপলক্ষে নিশ্চয়ই মানুষের পুণ্যসঞ্চয়ের সাধনাটা আগে। সেই কারণেই তাঁর আসা। কিন্তু সেই সমাবেশের রূপের হাটে যে বৈচিত্র্য তার দর্শনের মাধ্যমে পুণ্য অর্জনই হলো কালকূটের উদ্দেশ্য। তাই বার বার এক নতুন রূপের হাটে যাত্রা করা তাঁর লক্ষ।

এলাহাবাদ থেকে সোনপুরের হরিহর ছত্রের মেলায় যাওয়ার পথে ট্রেনে সহযাত্রী হিসাবে লক্ষ্মৌয়ের এক খানদানি রইস জমিদার সিংবাহাদুরজীর সঙ্গে পরিচয় হয়। যদিও বিলুপ্তির পথে যাওয়া বাপ-ঠাকুরদার আমলের জমিদারীর অবস্থা বোঝাতে সিংজী বলেন, সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন সব কিছুর ছায়াই লম্বা দেখায়।

কালকূটের কাছে জীবনের অবস্থাকে নিয়ে এমন তুলনা অভিনব মনে হয়েছে। ঠিক যেন বিষণ্ণ কাব্য। অথচ এর নির্মম বাস্তবটাও তাঁর মর্মে গেঁথেছে। যার অর্থ, সূর্যাস্তের দীর্ঘছায়া অচিরেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

সিংবাহাদুরজীর সমস্ত পরিবারের কাছে কালকূট শুধু কলাকার বা শিল্পী হিসাবেই পরিচিত নন, তাঁর মুখ্য পরিচয় তিনি হলেন 'মিঠাইচোর' অর্থাৎ যিনি কিনা হৃদয়সুধা হরণ করে পালিয়ে বেড়ান। কথাটার আসল অর্থ 'প্রাণকাড়ানো'। অথচ, আখ্যা 'চোর'। কথাটার ভেতর একদিকে যেমন প্রীতি আছে তেমনি ভাষায় চাতুর্য ও প্রাণের গভীরতাও আছে।

হরিহরছত্রের মেলার মূল আকর্ষণ হলো সেখানে বিস্তর আর বহুরকম পশু পাখির আমদানি হয় এবং সেটাই কালকূটের কাছে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সোনপুরের মেলা, ভারতের এক নতুন রূপের হাটের মেলা। একেবারে নিছক ধর্মীয় বা কুম্ভমেলার মতো মেলা সেটা না।

কালকূট প্রয়াগের আমল থেকে সোনপুরের দিনগুলোর সুদীর্ঘ সময় পেরিয়ে যে কীর্তি অর্জন করেছেন, সেই খ্যাতির বিড়ম্বনায় স্থানীয় বাঙালি সমাজ থেকে শুরু করে নৈহাটির পরিচিত মেয়ে রুণু ওরফে অলকা তাঁর সান্নিধ্য প্রত্যাশা করলেও বাউলমনের কালকূট সবার ধরাছোঁয়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েন মেলা পরিসরে। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোহরণ করে পবননন্দন ঝা ওরফে খাট্টা নামের এক ঘর পালানো কিশোর, যে ট্রেন থেকে সিংবাহাদুরজীর দলে

ভিড়েছে। লেখক এর সম্বন্ধে বলেছেন, পিতৃহীন ঘরছাড়া বালক, মা ভাই বোন, সংসারের কোনো আকর্ষণ নেই, ও কার হাতছানিতে ছুটে চলেছে। নিজেরটাও তিনি কোনোদিন জানেননি। 'অতিথি'-র তারাপদ বিশ্ব প্রকৃতির ডাকে যে চিরকাল চলেছিলো সংসার তাকে কোনোদিন ফেরাতে পারে নি। তিনি মনে করেন—

> ''আজ ভারতের এই বিচিত্র বিস্ময়কর রূপের হাটে দাঁড়িয়ে একটা কথা জানি। বাইরের চিরকালের ডাকের মধ্যেও, সংসারের বহু বাহু আমাকে বারে বারে ধরে রাখতে চেয়েছে। সেইসব বাহুর আলিঙ্গনের মত্ততায় খেয়াল থাকে না, সুখের থেকে দুঃখ আর দীনতা বড় বেশি। এখানেই আমার আত্ম-পরিচয়ের অন্ধ কষ্ট। বাইরের ডাকের সাড়ায় আমার মুক্তি। আমার আত্মানুসন্ধানও বটে। কিন্তু এই মৈথিলি ব্রাহ্মণ বালক, ওর কী ভবিষ্যৎ?''[৮৬]

সোনপুরের মেলায় সব সময়ের সঙ্গী পবন সব কিছু তার নিজস্ব রীতিতে কালকূটকে দেখিয়েছে ও শুনিয়েছে, বাদ পড়েনি কিছুই। সোনপুরের মেলার বাস্তবচিত্র, জীবজন্তু থেকে শুরু করে নারী কেনা বেচার যাবতীয় গূঢ়রীতি, মেলার বৈশিষ্ট্য, সমবেত নরনারীর জান্তব ক্রিয়াকলাপ, নেশা ও উৎকোচ গ্রহণের নোংরামি, নানাবিধ বাণিজ্যিক প্রয়োগে নারীর ব্যবহার থেকে শুরু করে পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত। মেলায় মানুষ বিক্রি হতে দেখে কালকূটের অভিব্যক্তি—

> ''এটা উনিশশো আটষট্টি সাল। এ এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। চারশো বছর আগের পর্তুগীজ হানাদারদের সময় অতিক্রান্ত। পর্তুগীজ বম্বেটেরা এক সময়ে আমাদের অরাজকতা কাপুরুষতার সুযোগ নিয়ে, পৃথিবীর হাটে হাটে এ দেশের মানুষ বিক্রি করে দিত। আজ শুনছি, সোনপুরের পৃথিবী বিখ্যাত পশু পাখির মেলায়, মানুষও বিক্রি হয়!''[৮৭]

কালকূটের আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'অমৃত বিষের পাত্রে'র নায়িকা রঞ্জিতা রিজভির মতো বেদনায় বয়ে যাওয়া ও বিদূষী নারী কুসুমের সঙ্গে পরিচিত হই। এই কুসুম চৌধুরী পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছে। সোনপুরের হরিহরক্ষেত্রের মেলার ঐতিহাসিকতা ও পুরাণাশ্রিত কিংবদন্তী বলতে গিয়ে কুসুম তার নিজের জীবনের বেদনামিশ্রিত করুণ ইতিহাস

শুনিয়েছে কালকূটকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফিউডাল ধাঁচের মধ্যে নারীদেহ যে কী রকম পাইকারী ভাবে বিক্রয়যোগ্য পণ্যসামগ্রী হয়ে ওঠে তার অন্যতম উদাহরণ কুসুমের মতো মেয়েরা। গঙ্গা ও গণ্ডকের সঙ্গম স্থলে হেমন্তকালের পূর্ণিমা তিথিতে সোনপুরের মেলায় না গেলে কালকূটের কাছে অজানা থেকে যেত, কুসুমের মতো বিদূষী নাগরিকাও পুরুষের চোখে পণ্য। তা না হলে পাটনার মতো আধুনিক শহরের পুরুষেরা কী করে ধর্ষিতা কুসুমকে ভোগ করার দাবি জানায়। কুসুম সোনপুরের মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে, এই মেলা এখনো অদ্বিতীয়, এরকম মেলা আর কোথাও হয় না। কতকাল আগে এর শুরু তার হদিস ইতিহাসের পাতা থেকে মেলে না। এই হরিহরছত্রের কিংবদন্তী, আর কার্তিক পূর্ণিমাতে গণ্ডক গঙ্গার সঙ্গমে স্নান কোন প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছিল, পুরাণে তারও কোনো খোঁজ মেলে না। এ জায়গাকে 'হরিক্ষেত্র' বা 'দদরিক্ষেত্র' বলা হতো। অনেকে এই স্থানকে 'দেবঘাট'ও বলে থাকেন। আদিতে লোকে জানতো ভগবান শ্রীহরি, তাঁর গোধনসমূহ অগ্রে করে এখানে এসেছিলেন, আর শূলপাণি হরের সঙ্গে গোধন সব রক্ষা করেন। প্রাচীন বিশ্বাস মতে অনেকেই মনে করেন, সেই হরি আর হরের গোধন রক্ষার কাল থেকে দেবতারা এখানে বিচরণ করেন। এ স্থান যে হিন্দুদের পুরনো দেবস্থান তা হরিহরক্ষেত্রের লীলা থেকে অনুমান করা যায় কিন্তু একে কেন্দ্র করে যে বিরাট পশুমেলা হয়, তার শুরুর কালটা ইতিহাসে উল্লেখ নেই। শুধু একটা কথাই জানা যায়, এ মেলা আগে হতো হাজিপুরে। অওরংজেবের আমলে, হাজিপুর রামচুরা অঞ্চল থেকে মেলা সোনপুরে চলে আসে। তখন তাতার দেশ থেকেও এখানে লোকে বাণিজ্য করতে আসতো। অবশ্য সোনপুরের অন্য ইতিহাসও আছে, সেই ইতিহাসে গণ্ডক নদীর নাম ছিল সদানীরা।

কালকূট সোনপুরের মেলা দেখেছিলেন উনিশশো আটষট্টি সালে এবং পুস্তকের আকার দেন ছিয়াশিতে। এই বই লিখতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, ভারতে মেয়ে বিক্রি হয়, বিক্রি করে বাবা-মা-স্বামী-ভাই। অনেক সময়, স্ত্রীলোক স্বয়ং নিজেকে বিক্রি করে বা অসদ্ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মেয়েদের পাচার করার ঘটনাও আমরা খবরের কাগজে পড়ি কিন্তু এসবের সঙ্গে সোনপুরের মেলায় নারী বিক্রয় ঠিক এক জিনিস নয়। সেখানে মেয়েদেরকে ঠিক গৃহপালিত জীবের মতোই বিক্রি করা হয়। যদিও গ্রাম ভারতের মানুষের কাছে এটা কোনো নতুন সংবাদ না। লেখক তাঁর বিশেষ পরিচিতের কাছে জেনেছেন যে পরবর্তীকালেও সোনপুরের মেলায়

অবাধে মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ এই পশুপাখি বিক্রির মেলায় হাতি ঘোড়ার মতোই বাবা-মা-স্বামী তাদের মেয়ে-বউদের বিক্রি করতে আসে।

মেলার অষ্টম দিনে মেটেলির কনজারভেটর দীনেশ পুরকায়স্থ সিংবাহাদুরজীর হস্তিযুগল লছমীপিয়ারী আর সূরযকে এক লাখ টাকায় কিনে নিয়ে গেলেন। সিংবাহাদুরজী প্রস্তরবৎ হয়ে থাকলেও তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মদেবী ও পরিবারের আর সদস্যরা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেন আর ক্ষীয়মান ঐশ্বর্যের রূপ অস্তসূর্যের দীর্ঘতর ছায়ার কালিমার মতো দীর্ঘতর হয়। এই বিষাদঘন পরিবেশ থেকে কালকূট সমস্তদিন পালিয়ে বেঁচেছেন। এরপর একসময় মেলা থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কালকূট দেখেন মেলায় ভাঙন ধরেছে। ক্রয়যোগ্য পশু ও মানবী অধিকাংশই বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। বিশাল সোনপুরের মেলা অনেক চোখের জলে আর দীর্ঘশ্বাসে যেন হাহাকার করছে। মহা-বাণিজ্যের মেলা, সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ জীবের। অথচ, আনন্দর ধারা চুঁইয়ে আসছে কোন্ ব্যথার অতল থেকে। এই বিস্ময়ের তুলনা নেই।

পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ : (১৯৮৮)

এই গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে নভেম্বর ১৯৮৮ -তে। এই বইয়ে অরুণ মিত্র এবং সুমন চট্টোপাধ্যায়ের দুটি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থ মধ্যে ১৯৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ১২ই ফেব্রুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' মেলা থেকে কালকূট যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রতিবেদন দুটি মুদ্রিত হয়েছে অরুণ মিত্রের ভূমিকার পরে। অতঃপর 'অমৃতের সন্ধানে সমরেশ' শীর্ষক একটি রচনায় সুমন চট্টোপাধ্যায়, বত্রিশ বছর পরে কালকূট যখন ধরিত্রী বসু ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুনরায় কুম্ভমেলায় যান, তখনকার কালকূটের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি লেখেন। এরপর ন-টি কিস্তিতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কালকূট প্রেরিত প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছে ৯ মার্চ ১৯৮৬ থেকে ১৭ইম এপ্রিল ১৯৮৬ পর্যন্ত।

বত্রিশ বছরের অতীতকে পেছনে ফেলে এসে কালকূট দ্বিতীয়বার হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে যাওয়ার সূচনায় বলেছেন—

> ''... আমার অমৃতের সন্ধানকে যদি কেউ ঐশী দৈবী ইত্যাদি নানা ভাষায় ভূষিত করতে চাও, কর। কিন্তু আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

> আমি সেই থেকে অমৃতের সন্ধানী। অথচ, সেই সন্ধানেই ঘুরতে ঘুরতেই, প্রয়াগের প্রথম আহ্বানের চিত্রটি ভেসে উঠতে লাগলো। সেই চিত্রে আমি নিজের মুখও দেখতে পেয়েছিলাম। সেই আমি কোথায়! 'মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', এই পরম তত্ত্বটি গভীর সত্যের সন্ধান হয়ে দাঁড়ালো। লেখক আরো জানান নিজেকে জানা মানেই, নিজেকে খোঁজা। ভেবেছিলাম, আত্ম আবিষ্কারের এই তত্ত্বটির সন্ধান দিয়েছে, পাশ্চাত্ত্যের চিন্তার আধুনিকতা। তা সত্যি না। 'মনো ব্রহ্মোতি ব্যজানাৎ'। এই প্রাচীনতর ভারতের দান আমি প্রয়াগেই পেয়েছিলাম। কেবল জানিনে, সকলের প্রতি আমার বুকে আর কপালে রাখা জোড়া হাতের নমস্কার, কবে নিজের প্রতি ফিরবে। নমোমাহত্য। আর সেই দিনটির স্বরূপই বা কী!"[৮৮]

শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর 'কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে' নামক গ্রন্থে কালকূটের এই গভীর চিন্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন—

> ''আত্মানুসন্ধানের অর্থই সর্বশক্তিমানের সন্ধান বা অমৃতের সন্ধান। আত্মের মধ্যে সমগ্রের স্বরূপকে অনুধাবনের আকাঙ্ক্ষায় লেখক দ্বিতীয় যাত্রার প্রারম্ভে বলতে পারলেন— 'সেই নমস্কার কবে নিজের প্রতি ফিরবে।' এই তো ভারতীয় হিন্দুধর্মের আদ্যকথার মর্মবাণী—'আত্মানং বিদ্ধি'।"[৮৯]

১৩৬১ বঙ্গাব্দের মাঘে কালকূট সেই যে প্রথমবার অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন তারপরে, সেই সন্ধানী মনটা আর কোনো দিনই ঘরে ফিরতে পারে নি। যদিও কাজের মানুষটা তাঁর সংসারের দায়ভাগ একটুও ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু রূপমুগ্ধ অমৃতের সন্ধানীকে সারাটা কাল সেই সন্ধানেই খুঁজে ফিরতে হয়েছে। অনেক গ্রাম জনপদ আর ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথে ফিরতে ফিরতে অমৃতের সন্ধানী কালকূট তাঁর আকণ্ঠ তৃষ্ণাকে মেটাবার চেষ্টা করেছেন। কারণ এরই মধ্যে তাঁর নিজেকে সন্ধানের পালা চলতে থাকে। আর তাই ১৩৯২ -এর বসন্তে, তিনি আবার নতুন নিমন্ত্রণের ডাক শুনতে পেয়েছেন। ডাক এসেছে গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভের লক্ষ হাতের হাতছানিতে; লক্ষ মুখের হাসির আমন্ত্রণে। বহুকাল পরে, বহুপথ ঘুরে, আবার

সেই পূর্ণকুম্ভ। চৈত্রের সংক্রান্তিতে গঙ্গাদ্বারের গঙ্গায় অমৃতের উদ্ভব হবে, তাই সারা ভারতের অমৃতের প্লাবণের উচ্ছ্বাস, স্রোতে বইবে। ইতিমধ্যে, এই নতুন করে, পূর্ণকুম্ভ যাত্রার গঙ্গাদ্বারের তটে লেখক এতদিনের পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব করে নিচ্ছেন, তাঁর ভাষায়—

> ''কেবল জানিনে, হিসেবটা কোনো কালেই এ জীবনে মিলবে কিনা। কিন্তু আর তো এমন করে নিজের অপরিচয়টাকে নিয়ে ফিরতে পারিনে। অমৃতের আকণ্ঠ তৃষ্ণার মতোই এই অপরিচয়।—আমার অন্বিষ্ট অমৃতেই কি নিজেকে দেখতে পাব? অমৃতে আমাকে নিয়ে চলো। এই প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা—অমৃতং গমন।''[৯০]

গঙ্গাদ্বারের পূর্ণকুম্ভ সম্পর্কে কথিত আছে যে বারো বছর অন্তর এই মেলা হয়ে থাকে, এবং বৃহস্পতি যখন কুম্ভরাশিতে আর সূর্য যখন মেষ রাশিতে থাকেন তখন হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়। প্রয়াগ, উজ্জয়িনী আর নাসিকেও কুম্ভযোগ হয়, কিন্তু হিসেবে দেখা যায় প্রতি বছরেই, এই চার জায়গায় যোগের হিসেবে দু-তিন মাসের হেরফের হয়ে যায়।

'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' গ্রন্থটি কালকূটের দ্বিতীয়বার কুম্ভমেলায় যাত্রা ও অভিজ্ঞতালাভের প্রতিবেদন স্বরূপ। তবে সেই চুয়ান্ন আর এই ছিয়াশি সালের মধ্যে ফারাক রয়ে গেছে বিস্তর। লেখক মনে করেন, যে হিন্দুস্থান সেই অতীতে তার ধর্ম, মানুষ, কারু ও চারুকলা শিল্প ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিয়ে যে মহামেলার সৃষ্টি করেছিল, সেই মহামেলাকে বর্তমান ভ্রমণে তাঁর মনে হয়েছে বিষাদভূমি। বত্রিশ বছর আগে শুধুমাত্র কাঁধে একটা ঝোলা আর পকেটে কিছু পারানির কড়ি নিয়ে যে বাউলপ্রতিম শিল্পী প্রয়াগে মহামানবের মহামিলন তীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই শিল্পীর অনেক রূপান্তর দেখতে পাই পরবর্তী পূর্ণকুম্ভ যাত্রায়। যার স্বপক্ষে লেখকের এই উক্তিটির কথা বলতে পারি—

> ''...প্রয়াগে লক্ষ চোখের আরশিতেও নিজের যে মুখটি দেখেছিলাম, আজ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে, লক্ষ চোখের আরশিতে নিজের সেই মুখটিকে তো খুঁজে পচ্ছিনে। কেবল প্রয়াগের সেই লুলা বলরামের গানের কলি মনে পড়ছে : 'তুমি কে-এ-এ-এ-এ?/বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে'।''[৯১]

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কালকূট জীবিতকালেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

যে-যুবক লেখক প্রথমবারের প্রয়াগে সারা মেলা জুড়ে একাকী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, এবারের মেলায় সেই ভ্রমণপিয়াসীর পায়ে ছিলো নিষেধের বেড়া, ছিলো খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শৃঙ্খল। সর্বোপরি তাঁর দৈহিক অসুস্থতা তাঁকে জনসমুদ্রে গা-ভাসাতে দেয়নি। অতএব বাধা পেয়েছেন প্রতি পদে পদে। তাই হয়ত ব্যথিত হৃদয়ে মোচড় দিয়ে উদগত দীর্ঘশ্বাস চোখের দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ ঝাপসা করে দেয়। অস্ফুটে বেরিয়ে আসে—

> ''... কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি? আমার দু'পাশ দিয়ে যে বয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে, তার অনেক নামের এক নাম গঙ্গা। মহাকালেরই প্রতিরূপ, সে চলেছে নিরন্তর। আর এই যে আমার চারপাশে নানা বয়সের নরনারী, নানা বেশ, গৃহস্থ, সাধু, সাধুনী, ব্রহ্মকুণ্ডে মহাবেগ মহাকালের মতো তারাও নিরন্তর। আমিও নিরন্তর। সেই নিরন্ততার মধ্যেই রয়েছি, আমার কেশের রুপোলি ঔজ্জ্বল্যে, ব্যথার শিখরে শুভ্র হাসির গর্ব। মুখের শীর্ণতা ও রেখায় কেবল ফেলে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতার শক্তি সঞ্চয় হয় না। পেয়েছি গভীরতর জিজ্ঞাসার সুধা মাখানো আর্তি। ... দেখছি, সময় চলে যাচ্ছে তার দুরন্ত স্রোতে, কালের সব চিহ্ন তার প্রবাহে নিয়ে চলেছে। সময় সময়। শুনছি যে, 'আমার নাইরে সময় নাই।''[৯২]

এই গ্রন্থে সংকলিত অরুণ মিত্র ও সুমন চট্টোপাধ্যায়ের রচিত দুটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে আমরা পৃথক দুই কালের কালকূটের দুটি অসম অবস্থার চিত্র ফুটে উঠতে দেখি। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' এবং 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ'—নামক গ্রন্থ দুটি পড়লে পাঠকেরা কিছু পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন। যেমন আগের বইয়ে লেখক প্রায় সব সময় নেপথ্যে থেকেছেন কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থে তাঁকে প্রায়শই সামনে লক্ষ করা যায়। আগের বারের মেলায় তাঁর দেখা নর-নারী পাঠক সমাজকে আনন্দ-বেদনায়, আবেগে-বৈরাগ্যে ও আশা-নিরাশায় আন্দোলিত করেছিল কিন্তু এবারের প্রতিবেদন পাঠে অনেকেরই মন ভরেনি। অবশ্য ধ্রুপদী সাহিত্য 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র মতো, কালকূট যদি প্রয়াণের পূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'হরিদ্বারের কুম্ভমেলা সংক্রান্ত' প্রতিবেদন থেকে, লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন করে বই লিখতেন, তাহলে হয়তো সেটিও কোনো চিরায়ত সাহিত্যের জন্ম দিতে পারতো।

পুরাণে পাই সমুদ্র মন্থনে কালকূট গরলের উদ্ভব হয়ে দেবাসুরের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ছিল। মহাদেব সেই গরল পান করে গলাতেই বিষ আটকে রাখেন। তাই তিনি নীলকণ্ঠ। কিন্তু লেখক কালকূট ঠিক কোন্ অমৃতের সন্ধানে নিজের প্রাণে হলাহলের তীব্র যাতনা নিয়ে ফিরছেন, বিষের জ্বালা জুড়াতে তা পরিস্ফুট হয়নি। হয়তো সেই জ্বালা জুড়োবার সঙ্গেই রয়েছে তাঁর আত্মানুসন্ধানের পথে ফেরা। গঙ্গাদ্বারের গঙ্গায় লক্ষরূপের হাটে দাঁড়িয়ে তিনি অমৃতের স্বাদ পান। লেখকের ভাষায়—

> ''... এই যে আমার দেশ, আমার অপরূপ রূপসী জননী। যেখানে আমার গর্ভ-ধারিণীর মুখের সঙ্গে সব মুখ একাকার হয়ে গিয়েছে। এই মহান রূপে আমি মুগ্ধ। কী যে অহঙ্কার, বুঝিয়ে বলতে পারি না।... কিন্তু আমার ভিতরের অন্ধকারে যে বিষের মন্থন চলছে। আমি এই লক্ষরূপের হাটে, এই অমৃতযোগে, আমার সেই বিষমুক্ত জীবনের সন্ধান করছি। আমাকে আমার জগৎ দাও। বিশ্বাস দাও। উৎসর্গের শক্তি দাও।''[৯৩]

খ) প্রাকৃতিক পটভূমি :

কালকূট এবারের ভ্রমণ যাত্রায় তাঁর বৈরাগী মনকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন অরণ্যভূমির দিকে। তাঁর ভ্রমণের উৎসুকতা অরণ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে নি। নিবিড় অরণ্যের আমন্ত্রণে স্বগতোক্তির স্বীকারের মাধ্যমে— 'মন চলো বনে'— এই কথা শুনিয়ে বনভ্রমণের পথে পা বাড়ালেন।

কালকূট সাহিত্যে লক্ষ করা যায় কালকূট মাত্র একবারই অরণ্য ভ্রমণ করেছেন। তবে তাঁর এই ত্রয়ী 'আরণ্যক' গ্রন্থে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিণত মানসিকতার পরিচয় পাওয় যায়।

অরণ্যের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অরণ্য প্রেমিক লেখক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে গভীর মনস্কতায় অরণ্য প্রবেশ করে গভীর অরণ্যের মধ্যেকার চিরন্তন মহাজীবনের অশ্রুতপূর্ব সুর শুনিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। লেখকের 'আরণ্যক' নামক গ্রন্থে অরণ্যের কৈশোর যৌবন জরার ইতিহাসের বাণীবদ্ধ মর্মধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। যার ফলে পাঠকেরও নিজেকে অরণ্য সত্তায় একাত্ম করে ফেলতে অসুবিধা হয়

না, সমস্ত কিছুর মধ্যে মিলে মিশে অনুভূতি হয় এক ও অভিন্ন। লেখকের রোমান্টিক অরণ্য প্রেমের মাধ্যমে চরিত্রগুলি যেন অরণ্যের সহজাত আবেগেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যেন চরিত্রকে লেখকের ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করতে হয় না। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''...বিভূতিভূষণ অরণ্যকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন তার বিশল্যকরণী ভূমিকায়, আস্থা স্থাপন করেছেন সে ভূমিকার চিরন্তনত্বে। বিভূতিভূষণের বনশ্রীরাগ মহাজীবনের কথা বলে।''[৯৪] অন্যদিকে বুদ্ধদেব গুহের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি অরণ্যের শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-বর্ণকে তার মধুর রূপকে নিয়ে একটি মিষ্টি গল্পের চারিদিকে আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেন।

কিন্তু কালকূট এই দু'জন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর সমরেশ নামে লিখিত 'দুই অরণ্য' স্পষ্টতই ঘোষণা করে অরণ্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল অন্য অরণ্যের কথা। সভ্যতার পাঁজরে অবদমিত আরেক অরণ্যকেও তিনি ভোলেন না। অরণ্যের গভীর কথায় ছিল বিভূতিভূষণের কান আর অরণ্যের জটিল কথায় সমরেশের। যদিও সেই জটিলতার প্রকাশ আমরা কালকূটের লেখাতে পাইনি। সেখানে তাঁর স্বতন্ত্র্য পদক্ষেপ স্পষ্ট। ড. নিতাই বসু তাঁর 'কালকূট সমরেশ' নামক গ্রন্থে বিভূতিভূষণ ও কালকূটের প্রকৃতি দৃষ্টির কিছু মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন—

> ''কিন্তু বিভূতিভূষণের সঙ্গে কালকূটের মৌলিক পার্থক্য আছে—বিভূতিভূষণের কাছে মানুষ প্রকৃতির একটা অংশমাত্র, কালকূটের কাছে মানুষ জীবনজগতের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। বিভূতিভূষণ নিজের অস্তিত্ব ভুলে প্রকৃতি উপভোগ করেন। কালকূট প্রকৃতি উপভোগ করতে গিয়ে নিজেকে মোটেই বিস্মৃত হন না কারণ প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের নৈকট্য অত্যন্ত জরুরী। প্রকৃতির বিস্ময় বিভূতিভূষণকে সর্বদা নির্বাক ও ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলে, প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য কালকূটকে প্রেমিক বানিয়ে তাকে মানুষের কাছে টেনে আনে।''[৯৫]

অতএব অরণ্য রসিক বিভূতিভূষণের মতো কালকূট স্বনামে ও ছদ্মনামে বিরল অরণ্যপ্রীতির নানা পরিচয় দিলেও এবিষয়ে তাঁকে কখনও বিভূতিভূষণের উত্তরাধিকারী বলা যায় না। তবে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভানুমতীর কথা মনে

পড়তে পারে কালকূটের 'বনের সঙ্গে খেলা'র সুরসতিয়া চরিত্রের দেখা পেলে। তবে ভানুমতী চরিত্র যে অর্থে অরণ্যবালা, সুরসতিয়াকে ঠিক সে-অর্থে অরণ্যবালা পরিচয় দেওয়া যায় না। কারণ কালকূট জানেন যে, এখন আর ভানুমতীকে কোথাও পাওয়া যাবে না, বর্তমান দ্রুত পরিবর্তিত সভ্যতার ছাপ সুরসতিয়াকে আদিম প্রাণীন বেগের মধ্য দিয়ে সভ্যতার আধুনিক প্রবেশ দ্বারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ যার চোখে এখনো অরণ্য সরলতা, দেহে নদীর ঢেউ, গলায় অরণ্যের ভাষা। শম্ভুনাথ চক্রবর্তী অরণ্য প্রেমে একীভূত আত্মহারা লেখকদের মধ্যে গুণমানের নিরীক্ষায়ণে উপলব্ধি করেন বিভূতিভূষণ, কালকূট ও বুদ্ধদেব গুহ-র অরণ্য-চেতনার দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর মতে বুদ্ধদেবকে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, আর কালকূটের 'আমি'কে ভাবতে হয়, এবং বিভূতিভূষণ যেন অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা।

তিনি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আরও বলেন—

> ''মানুষ ফুল দেখে। দেখে আনন্দিত হয়। কিন্তু কটা মানুষ ফুল ফুটতে দেখে? অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা, সেই মানুষটি, রাত্রি শেষের আঁধারে ফুল গাছের কাছে একাকী অপেক্ষা করে, কুঁড়ি থেকে পুষ্পের বিকাশ দেখে পাগল হন। আরণ্যকেরই দ্বিতীয় সত্তায় তিনি যেন বৃহদারণ্যকের ঋষির মতো, বনস্পতির বৈঠকে মজলিস জমান। সংরক্ষিত বনের ঠিকাদার ইজারাদারদের দেখলে তিনি হন ভীত, সন্ত্রস্ত। অরণ্যের আঘাতে সেই মানুষ হন আহত।''[৯৬]

তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কালকূট তাঁর একবারমাত্র বনভ্রমণের পটভূমিকায়, তিন-তিনটি অরণ্য বিষয়ক গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রের ভাষায়, নির্দ্বিধায় আরণ্যক প্রকৃতির মহাজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, ঐ একটি মানুষকেই স্মরণ করেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে— ''স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।''[৯৭]

অরণ্যের পটভূমিকায় কালকূট লিখিত মোট তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। ১৯৭২-১৯৭৪ সালের মধ্যে লেখা হয় — 'মন চলো বনে' 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন'। এই বই তিনটিতে ভ্রমণকারী কালকূট মাঝে মধ্যেই বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ এনেছেন। অরণ্য প্রেক্ষাপটে রচিত এই তিনটি গ্রন্থে বনভ্রমণের উপর্যুপরি নয়টি দিনের ঘটনাবিন্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এও বলতে হয় মাত্র এই নয় দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক যে আরণ্য চেতনার

দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা যেকোন অরণ্যপ্রেমিকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জরাইকেলা থেকে সুবিস্তৃত সারেণ্ডারেঞ্জের বিশাল প্রদিক্রমার ক্ষেত্রে কালগত বিন্যাসটা ঠিক এইরকমভাবে করা যায়—

১. মনচলো বনে— জরাইকেলা থেকে বনপথে ছোট নাগরা পর্যন্ত (মোট চার দিন)।

২. বনের সঙ্গে খেলা— এদেলবা গ্রাম পর্যন্ত ভ্রমণ এবং অবস্থান (৫ম দিন থেকে ৬ষ্ঠ দিনের মধ্য পর্যন্ত)।

৩. প্রেম নামে বন— সিংজীর সঙ্গে বনপথে থলকোবাদের বন বাংলো পর্যন্ত (৬ষ্ঠ দিনের মধ্যাহ্ন থেকে ৮ম দিনের শেষ পর্যন্ত)।

এবং থলকোবাদ বন বাংলো থেকে ছোট নাগরা হয়ে কোলকাতামুখী (নবমদিন)।

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কালকূট 'রচনা সমগ্র'কে শ্রেণিবিচারে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে অরণ্য পর্যায়ের লেখাগুলিকে তিনি 'বিচিত্রের সন্ধান' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে যে পটভূমিকা এ রচনাগুলিতে বিচিত্রতর ছায়াপাত করেছে, তা কি শুধুই ছায়া, শুধুই পটভূমিকা মাত্র? বরং বলা চলে লেখকের মনোনীত পটভূমিকার সংস্পর্শে অভিজ্ঞতা লব্ধ ব্যক্তিপাত্রগুলো একটা নতুন স্তরে গিয়ে উন্নীত হয়। পট ও পাত্রের যুগল অন্বয়ে রচনাগুলি স্বাদে হয়ে ওঠে বিচিত্র ও অভিনব। তবে লেখকের ভাষায় বিচিত্র বলতে উঠে আসে অনেক বিচিত্রের মধ্যে তিনি মানুষের চেয়ে বিচিত্র আর কোনো কিছু দেখেননি। সেই বিচিত্রের মাঝেই তাঁর অপরূপের দর্শন ঘটেছে। তাই তো লেখক 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' বলে বেরিয়ে পড়েন গ্রাম-নদী-অরণ্য-প্রান্তরে, এবং মানুষের মনের গহীনে ডুব দিয়ে অন্বেষণ চালান প্রতিনিয়ত। অরণ্যপ্রেমী কালকূট তাঁর তিনটি গ্রন্থে বনভ্রমণের সামগ্রিক বর্ণনা দিতে গিয়ে যে যে বনবালা নায়িকাদের নিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে নিজ নিজ স্বকীয়তায় উত্তরোত্তর পরিণতির পথে অগ্রসর হতে দেখা গিয়েছে। যেমন বন পরিবেশে কিশোরী তিপুকে এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে মনে হয়েছে, কিশোরী তিপুর সান্নিধ্যই যেন 'বনের সঙ্গে খেলা' তে যুবতী সুরসতিয়ার মধ্যেকার নিষ্পাপ মাধুর্য হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সেই মাধুর্যের ঐশ্বর্য আশ্রয়টি-ই, লেখকের অবচেতনে নাগরিক মনের সাড়ায়, নার্স তৃপ্তি ভৌমিকের মানসে, বনের প্রেমে, নিঃশর্ত নিষ্কলুষ ভাবনায় 'প্রেম নামে বন' এর পটভূমিকায় পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য লেখক তাঁর স্বভাব সুন্দর নির্লিপ্ততার মাধ্যমে এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

গিরিপদমূলে ছড়িয়ে থাকা জনপদ ও অরণ্যভূমিতে এসে লেখক যেন মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন। আমরা এখন জরাইকেলা থেকে থলকোবাদ পর্যন্ত, বিচিত্রের পিপাসায় আর্ত আরণ্যক কালকূটের অরণ্য ভ্রমণের তিনটি গ্রন্থের ঘটনা পারম্পর্যকে আলোচনা করব—

মন চলো বনে : (১৯৭২)

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের 'উল্টোরথ' পূজা সংখ্যায়। 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে তিনি স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন। যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে কালকূট স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

এবারের যাত্রায় লেখকের বিবাগী মন অরণ্যের হাতছানিতে ডানায় বেগ পেয়েছে। শুরুতেই তিনি বলেছেন এমন ভোজনও কখনো ঘটে যখন জঠর জ্বালা জ্বলে না কিন্তু জিভ স্থূল স্বাদের কথা ভুলে যায়। অথচ প্রাণভরে থাকে ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা, ক্ষুধার হাহাকার। তখনো কিন্তু সেই প্রাণভরে কথাটা 'খাই খাই'। কী খেলে প্রাণ ভরবে সেই আহারের চিন্তা থাকে। এবার বনের ডাক সেই প্রাণ ভরানোর ভোজনের ডাক। তাই কালকূটের যাত্রা শুরু অরণ্যভূমি জরাইকেলার পথে, বিহার ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চলে। গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে রেলগাড়িতে মেদিনীপুর জেলাটি পার হতে হবে, যেখানে মাটি তার কালো রঙ ছাড়িয়ে ক্রমে লাল হয়েছে, যেন সমুদ্রের ঢেউ আছে ভূমিতে, সেখানেই এগিয়ে যেতে হবে। রেলের কামরাতে লেখকের সহযাত্রী হয়ে চলেছে ভিন্নতর ভাষাভাষীর মানুষেরা, তার সঙ্গে যশোরিয়া টানের ভাষাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। তবে রাত পোহাবার পর থেকে ধলভূমগড়ের প্রকৃতি সেই যে লেখকের চোখ টেনে নিয়ে গিয়েছে, তাকে আর রেলগাড়ির খুপরিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। তিনি ভাবেন— ''... এত মুগ্ধতা কেন! চোখের তারায় তো অনেক দিনের দাগ, তবু এত অবাক চিক চিক কেন! সংসারের এত বিস্ময় ছড়ানো, আর ধলভূমগড়ের প্রকৃতি এমন করে মজিয়ে দিলে চলে! বিজ্ঞ বিবেচকরা হাসবে যে! শিশু তো না!''[৯৮]

ট্রেনের ভেতরে আশেপাশে আরো অনেক লোক। দু-পাশের বেঞ্চির মাঝখানে, লটবহর নিয়ে অনেকেই বসে গিয়েছে। দেখলেই অনুমান করা যায়, এরা এই বনদেশের নরনারী। যাত্রা তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে তাই লটবহরের মধ্যে, বাক্সো-প্যাঁটরা বলে কিছু নেই। বেশীর

ভাগই বোঁচকা-বুঁচকি, পোঁটলা-পুঁটলি। এদের দেখে লেখকের মনে হয়েছে যেন পৃথিবীর সরলতম নিষ্পাপ নরনারী, স্বাস্থ্যে যাদের কৃষ্ণ সূর্যের ছটা, অরূপ যৌবন প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সভ্যতার যা সুন্দর, সেই লজ্জা এখানে পাপ। হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে, রাত্রের দিকে ট্রেনের কিছু দৌড় থাকলেও দিনের বেলা তার দৌড় অনেক কম। তবে ক্রমে প্রকৃতি নয়ন-ভোলানোতে পরিণত হয়েছে। বনের নিবিড়তা বেড়েছে। সব থেকে যেন অবাক করেছে, তা হলো রঙ। এত বর্ণ, তিনি কোথাও দেখেননি নাম না জানা গাছ, নাম না জানা ফুল। তিনি অবাক হন এ মৃত্তিকার রসের ধারায় কী জাদু ছড়ানো রয়েছে! যেন রঙের ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছে। ঐ ট্রেন যাত্রার পথে কালকূটের সঙ্গে এক বাঙালি পরিবারের পরিচয় হয়। পরিবারের কর্তা গাঙ্গুলীমশাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ টাটানগর থেকে ফিরছেন জরাইকেলার বাসস্থানে। তাঁর বড় ছেলের একটি সামান্য মুদি-মনোহারির দোকান রয়েছে টাটানগরে, সেখানেই সপরিবারে গিয়েছিলেন। অতি সাধারণ জীবন-যাপনের যে ছাপ গাঙ্গুলী পরিবারে রয়েছে তার সহজতায় লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় লাগে না। তবে ধীরে ধীরে পরিচয়ের সূত্রপাতে লেখক জানতে পারেন অরণ্য রসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই জরাইকেলার অরণ্যে এসেছিলেন এবং পাশাপাশি গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। বলা যায় বনসাহিত্যের সৃষ্টি রাজ্যের যিনি রাজা, সেই রাজা গাঙ্গুলী মশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন, খাওয়া-দাওয়া-গল্প করেছেন একসঙ্গে। ভাবতেই যেন লেখকের রোমাঞ্চ লাগে। গায়ে কাঁটা দিয়ে এক অন্য অনুভূতির লহরী সৃষ্টি করে। যে গাঙ্গুলীমশাই বনের প্রাক্তন ইজারাদার জীবনে অনেক কিছু দেখে ও ঠেকে শিখেছেন, সেই তিনিই যখন বিভূতিবাবুর অরণ্যপ্রেমের বর্ণনা দেন তখন মনে হয় গাঙ্গুলীমশাইয়ের আটপৌরে ভাষাকেও ছাপিয়ে রাখবার মতন। যেমন—

> ''বাঁড়ুজ্যেমশাই মানুষটিও যে বড় ভালো প্রাণ খোলা ঋষির মতো মানুষ... উঁচু টিলার দিকে তাকিয়ে কী যে দেখতে পেতেন, কে জানে। ... মনে হতো যেন, সেই টিলার ওপরে কোনো দেবতাকে দেখতে পেয়েছেন। ... জরাইকেলার অনেক লোকই দেখেছে। গোটা সারেণ্ডা বনটা যে আঁতিপাতি করে দেখেছেন। অমন বনপাগল মানুষ দেখিনি!... মায়েদের দেখেছেন তো ছেলে কোলে করে, তার গোটা

শরীর আঁতিপাতি করে দেখে, কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জড়ুল, কোথায় একটা ফুসকুড়ি, দেখতে দেখতে মায়েদের... কেমন যেন ... চোখ জুড়িয়ে যায়, বিভূতিবাবুর কাছে বন ছিল সেইরকমের। সব একেবারে হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।"[৯৯]

লেখকের মনে হয়েছে বন ভালবাসার এমন তুলনা আর কখনো তিনি শোনেননি। তাঁর মনে এখন একটি সুখ, একটি সান্ত্বনা যে তিনিও চলেছেন সেই জরাইকেলায়। সেই গভীর সারেণ্ডা বনের পথে পথে, ছায়ায় ছায়ায়, ঝরণার ধারে, পাহাড়ী নদীর কূলে কূলে। আর আমন্ত্রণ পেয়েছেন গাঙ্গুলীমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার, যে তীর্থক্ষেত্রে পদার্পণ ঘটেছিল অরণ্য ঋষির।

ট্রেনের কামরাতেই বসে গাঙ্গুলী মশাইয়ের কাছ থেকে লেখকের শোনা হয়ে যায় কোয়েল নদীর কথা, নদীর মিষ্টি ও স্বাদু মাছের কথা, এবং কোয়েলের সোনালী চরের 'সোনা খোঁচার' গল্প। সব মিলিয়েই অরণ্য প্রেমী কালকূটের মন অধীর হয়ে ওঠে চাক্ষুষ দর্শনের জন্য। গাঙ্গুলী মশাইয়ের মুখে সারেণ্ডা অরণ্যের নিসর্গ বর্ণনা ও সোনাখোঁচা' নামটি শুনে কালকূট বিস্মিত হয়েছেন—

''যে মানুষেরা শিল্পী বা কবি আখ্যায় ভূষিত হয়নি, তাদের মুখ দিয়ে এমন একটি আশ্চর্য নাম! আসলে কথাশিল্পী সবাই, তার ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে সকলের মুখে। যার কানে বাজে, বাজবার মতো করে, সে তখন হয়ে ওঠে চিহ্নিত রূপকার হয়ে। শ্রবণের থেকে মহৎ কী আছে!"[১০০]

বিশ্ব কবিও একস্থানে বলেছিলেন যে যদি শ্রুতি আর দৃষ্টি এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা তাঁকে হারাবার হতো তাহলে তিনি দৃষ্টি হারাতে রাজি হতেন, শ্রুতি নয়। কালকূটেরও যেন ঠিক এমনটা করেই বলতে ইচ্ছা করে, বিশ্বচরাচরের যে মহাসঙ্গীত নিরন্তর বেজে চলেছে, শ্রুতি না থাকলে তার কোনো রহস্যই ধরা যায় না। পতঙ্গের পাখা ঝাপটা থেকে শুরু করে, সবই যে শব্দে বাজে।

লেখকের আপাতত গন্তব্য হলো কলকাতাবাসী নাট্যকার ও ঔপ্যনাসিক বন্ধু বলরামের জরাই কেলার বাসা। যদিও বন্ধু সঙ্গে আসেন নি, তবে তাঁরই পরিচয় সূত্রে এই আগমন। গোপাল ও নিতু হল বন্ধুর ছোট ভাই। গোপাল জরাইকেলায় পৈতৃক ব্যবসায়ে রত। জরাইকেলা

স্টেশনে নেমে কালকূট গাঙ্গুলী মশাই ও তাঁর পুত্র শিবু এবং কন্যা তিপুকে দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, স্টেশনে নিতে আসা নিতুর সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেলেন। যাওয়ার পথে স্পষ্ট শুনতে পেলেন ঝিঁঝিঁর ডাক, লক্ষ করেছেন আঞ্চলিক নরনারীর চলাফেরা, আকৃষ্ট হয়েছেন বনগাঁদা বনশিউলির মতো অনেক বনজ মনোহরণকারী ফুল দেখে। ফাল্গুনের বাতাসে পেয়েছেন কেঁদু ফুলের মিষ্টি তীব্র গন্ধ। যা কিনা গরিব বনজ অধিবাসীদের ক্ষুধা মেটায়। তবে লেখকের বনপিয়াসী মন একটু থমকে যায় সেই সব বন্য প্রাণীর কথা শুনে যাদেরকে তাঁর শহুরে চোখ চিড়িয়াখানার ভেতরে দেখেই অভ্যস্ত চিরকাল। যদিও নিতু আশ্বাস দেয় তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।

উনিশ-কুড়ি বছরের চঞ্চল ও বুদ্ধিমান নিতুর কাছ থেকে লেখক জানতে পারেন জেমার কথা। যে জেমা আদিবাসী যুবতী রমণী। বাড়ির সমস্ত ঘরকন্নার কাজ ও তদারকিতে সেই কর্তৃ। ওর জন্ম নিতুদের বাড়িতেই। জেমার বাবা-মা এই বাড়িতে প্রথম থেকেই কাজে নিযুক্ত হয়। নিতুদের ভাইবোনেদের মধ্যে অনেকেই এই বাড়িতে জন্মেছে। ফলে জেমা ছেলেবেলা থেকেই এদের সাথে সমবয়সীর মতো বেড়ে উঠেছে। তাই ওর কথাবার্তা চালচলন রান্না সবই নিতুদের ছাঁচে ঢালা। জেমার বাবা-মা মারা গেলেও জেমা তার ভাইবোনদের কাছে না গিয়ে নিতুদের সংসারে ওদের বোনের মতোই থেকে গেছে। যদিও সুশ্রী, কর্মনিপুণা জেমার বিয়ে হয়েছিল ওদেরই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু জেমার স্বামীর একটু বেশি নেশা করা (হাঁড়িয়া বা পচুই খাওয়া) বা খ্রীষ্টান হতে চাওয়া কোনওটাই পছন্দ না হওয়ায়, নিতুদের বাড়িতে সে ফেরৎ আসে। সেই থেকেই এ বাড়িতে জেমা রয়ে গেছে। তবে মোটর মেকানিক সুরীনকে জেমা পছন্দ করে, সুরীনের মাতৃহারা দুই সন্তানকে রেললাইন পেরিয়ে প্রতিদিন একবার দেখে আসে জেমা। অন্যদিকে নিতুরা বোনের মতো ভালোবাসার পাশাপাশি জেমা নামে ওঁরাও মেয়েটিকে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার চোখেও দেখে। ইতিমধ্যে লেখকের মধ্যেও যেন এই একই অনুভূতি চুঁইয়ে ঢুকেছে। লেখকের ভাষায়—

> ‘‘মানুষ মানুষ করলাম এত, তবু মানুষ বোঝা কী দায়! শেষ কোথায় আছে? নেই বোধ হয়। তাই এই বনের ডাকে ছুটে এসেও, মানুষ প্রকৃতির রূপে মন ভুলে যায়। আবেগ? হতে পারে, কিন্তু মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। কাকে যে প্রণাম করি, জানি না।’’[১০১]

মেয়ে ডাক পাখিকে ফাঁদের টোপ হিসাবে ব্যবহার করে কীভাবে ফাঁদওয়ালা ডাক পাখি শিকার করে সে কথা ভাবতে ভাবতে লেখক নিতুর সঙ্গে এমন এক স্থানে থমকে দাঁড়ালেন যেখানে মনে হয় সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে শুধু আগুনের শিখা, সে আগুনের শিখার অগ্নিঝলক যেন গায়ে এসে লাগছে। তা যেন প্রতিটি রোমকূপের ভিতর দিয়ে মিশে যায় রক্তে রক্তে। যেন সমস্ত অনুভূতির মধ্যে একটা দাবানলের গোপন উল্লাস। অথবা যেন অগ্নিসুধায় মাতাল হওয়া। এমন করে কে আগুনের শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে! নিতুর কাছে লেখক জানতে পারলেন এটি হল কুসুম গাছ। এ গাছের সবই নতুন পাতা। তিনি অনেক গাছের ফুলের ঝলক দেখেছেন, কিন্তু নতুন পাতার এমন আগুনের শিখার সমারোহ তিনি দেখেন নি। মুগ্ধ লেখকের ভাণ্ডারেও যেন এ কুসুমের অগ্নিশিখা বর্ণনা করার ভাষা পর্যন্ত নেই।

গাঙ্গুলি মশাইয়ের কাছে লেখক শুনেছেন গাছ তো প্রাণী। যে তাকে মেরে খায় তার অভিশাপ লাগবেই। খুন হওয়ার কষ্ট সকলেরই সমান থাকে। এই প্রাণী হত্যার দায়ে বনের ইজারাদারদের বংশে নাকি কখনো সুখ হয় না—মহাপাতকের কাজ তো। মুহূর্তের মধ্যেই লেখকের চোখে সমস্ত বনভূমি যেন এক নতুন রূপে জেগে ওঠে। গাছেরও যে প্রাণ আছে এমন কথা তাঁর জানা ছিল, কিন্তু সে প্রাণের মর্ম জানা ছিল না। সে যে নিহত হয়, কষ্ট পায়, অভিশাপ দেয়, এমন করে কথাটা কোনোদিন মনেও আসেনি। গাঙ্গুলিমশাইয়ের মাথায় একসময়ে জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ভূত চেপেছিল, তিনি তা নিয়েও ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য সব কাজ তো সবাইকে দিয়ে হয় না তাই মুনাফা না হওয়া সত্ত্বেও লোকসান পূরণ করতে হয়েছে। এখন তিনি কিছুটা বিমর্ষ, এক ভিন জগতের কথা লেখকের কাছে বলেন বর্তমানে চোর ডাকাত না হলে হয় না কারণ ডাকাতি করতে পারলেই ইজারাদারি চলে। কর্তাদের ঘুষ খাওয়ানো বেআইনি ভাবে চুরি করে গাছ কাটা যায়। সরকারের ক্ষতি হলে হোক। সৎপথে ইজারাদারি চলে না। তাহলে লোকসান দিয়ে মরতে হবে।

এ-হেন গাঙ্গুলীমশাই অরণ্য সংক্রান্ত কথাবার্তার মধ্যদিয়ে লেখককে বারবার বিস্মিত করে তুলেছেন। তাঁর বনজ জীবনের আদর্শের ভেতর দিয়েই লেখক যেন বনের প্রেমে মেতে ওঠেন।

এরপর কিশোরী সরল বনবাসিনী তিপুকে সঙ্গে নিয়ে কোয়েল নদীর পথে চলেছেন লেখক, তিপুর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন কত নাম না জানা গাছও ফুলের নাম। যাত্রাপথে রয়েছে

বন বৈচিত্র্যের বিভিন্ন পরিবেশ, কবরস্থানের ভীতি, ফাগুনের বাতাসে কাশবনের দোলন, কোয়েলের চরে-জলে বড় বড় পাথড়ের চাংড়া যেন আরণ্যক চেতনার সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। গভীর বন ও পাহাড়ের ভিতর থেকে কোয়েল নদী নেমে এসেছে একটা বাঁকের মুখ থেকে। আকাশ এত বড়, উদার, সব মিলিয়ে কেমন একটা গভীর গাম্ভীর্য বিস্তৃত। যে গাম্ভীর্যে ভ্রূকুটি নেই, বরং ধ্যানের মহিমা বিরাজ করছে। আর কোয়েল নদীর দু'পাশে যেন সোনালী চর জেগে উঠেছে, চওড়া চরের ইস্পাতস্বিনী নদী। যাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে এক চঞ্চল কিশোরী। কোয়েলের জলে যে সোনার কনা ভেসে আসে সেই সোনার খোঁজে, বনবাসীরা সারাদিন কোয়েলের তীরে বালি খুঁচিয়ে বেড়ায়। অথচ সারাদিনের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ 'সোনা খোঁচারা' পায় মাত্র এক আনা। এমন বঞ্চনাময় আদিবাসী দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা লেখককে অবাক করে।

কোয়েলের জলে নেমে তিপু ও লেখকের আচরণ, সরলতায় মোড়া। অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে কিশোরী বনবালা তিপুর লজ্জারুণ হাসি মাখানো প্রশ্ন—আমার আমাদের কথাও লিখবেন? নীল পাহাড়, বর্ণাঢ্য বন, কোয়েলের স্রোত, মাথার ওপর উদার নীল আকাশ আর লজ্জার ছটা মুখে তিপু—সব মিলিয়ে যেন এক স্বর্গীয় মুহূর্ত। তাই লেখককেও বলতে হয় যে, তিপুর কারণেই বনভ্রমণ সার্থক। লেখকের বক্তব্যে 'মন চল বনে'-র প্রেক্ষাপটে, তিপুর ভূমিকা গভীর বনে প্রবেশের তোরণ হিসাবেই দ্যোতিত হয়েছে। যে তোরণের চিত্রে কিশোরী সুলভ লজ্জা আছে। যুবতী সুলভ নিষিদ্ধবোধ এখনো জাগে নি। সেই জন্যই সহজ আর অনায়াস। তার সঙ্গে মিশে আছে বোধ হয়, প্রকৃতির ছোঁয়া।

আর এই অরণ্য পটভূমিতে লেখক নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

> ''... চুপ করে একটু বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। ধ্যান না, জপ না, যে-কথা হতে চায় না নানা কাজের মধ্যে, সেই কথাটা সেরে নিতাম। নিজের সঙ্গে দু-কথা। ... যে-জীবনটা কাটাই, বারো মাস যা নিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে—সে-ই সব সত্য না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে এই বনের হাতায়, অসীম আকাশের তলায় একবার নিজেকেই দেখতে ইচ্ছা করে। যে-আমি আমাকে ছেড়ে উদাস হয়ে বেড়ায়।''[১০২]

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ কালে তিপু ও নিতুর সঙ্গে লেখক আসেন আরেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে। যাঁর নাম উইলিয়াম সাহেব অদ্ভূত রকমের এই সাহেব মানুষটি। যিনি এক কালে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার ছিলেন এবং সেই সুবাদে বনকে ভালোবেসে তিনিও বনের মনের অভিন্নতায় এক হয়ে যান। তাঁর মেমসাহেব ও সন্তান এই বন্য প্রিয়তা, অসহ্য বর্বরতা মনে করে, ত্যাগ করে বিলেতে চলে গেছে। তবে যাওয়ার আগে গভর্ণমেন্টের কাছে উইলিয়ামের নামে অনেক কিছু নালিশ করে গিয়েছে, ফলে সাহেবের চাকরি চলে যায়। যদিও সাহেব তার জন্য কিছুই বলেন নি। চাকরি ছেড়ে জরাইকেলায় একটা করাতকল নিয়ে বসেছেন। প্রথম মুণ্ডা-বৌ মরে গেছে, তার কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে। আবার একটা বিয়ে করেছেন। বৃদ্ধ উইলিয়ামের কিশোরী মুণ্ডা-বৌ-এর নাম সুনি। সাহেব এও জানান যখন তিনি মেশিন কোম্পানীকে ভাড়া ঠিক মতো দিতে পারবেন না, তারা মেশিন তুলে নিয়ে গেলে, তিনিও একদিন কোয়েলের চরে সোনাখোঁচা হয়ে যাবেন। মুণ্ডা ভাষী সাহেব ও তাঁর মুণ্ডা বৌ মদগমের রসে, চকচকে চোখে মুখে সন্তানদের প্রতি প্রেম আর স্নেহের ঔদার্য্যে যেরূপ অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে, তা লেখককে মুগ্ধ করেছে। সংসারের এমন অভূতপূর্ব দুর্লভ দৃশ্যের সামনে বসে লেখক যেন সব ভুলে যান।

সাহেবের ওখান থেকে ফেরার পথে নিতুর দাদা গোপাল লেখককে ইজারাদার অজিত সিংজীর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সিংজী ও মোহনবাবু আলোচনার মাধ্যমে লেখকের বনভ্রমণের কর্মসূচী তৈরী করলেন। সারেণ্ডাবনের ছোটনাগরা, এদেলবা, থলকোবাদ ইত্যাদি যে সমস্ত স্থানে গাছ কাটা হবে, সেই সব বনাঞ্চলে লেখক সিংজীর আস্তানায় থেকে বন পরিভ্রমণ করবেন। যাত্রাকাল ঠিক করে লেখক যেখানে উঠেছেন সেখানে ফেরেন।

রাত পোহাতে পরের দিন বনের গভীরে যাবার আয়োজন চলতে লাগলো, অবশ্য লেখকের তেমন কিছু করার ছিল না। নিতু আর মোহনবাবু মিলে প্রায় দু'সপ্তাহের জন্য রান্নার সামগ্রী কিনে নেন। কারণ বনদর্শনে গভীরে প্রবেশ করলে, তথাকথিত সভ্যজগতের আর কোনো চিহ্ন নেই। তিপু এসে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথা জানিয়ে লেখককে নিয়ে সাম্‌টা নালার ধারে গিয়েছে। বনের এই গভীর স্থানটা হল বন্য পশুদের জলপানের স্থান। কল্‌কল বয়ে চলা নালা, এক এক জায়গায় প্রায় কাচের মতো স্থির। তিপু জানায়, স্থির মানেই জল সেখানে গহীন। এই পরিবেশে লেখকের যেন একটু গা ছম্‌ছমিয়ে ওঠে। এরপরে বনজ নানা

গাছ ও ফুলের নাম জানতে জানতে লেখক কয়েকগুচ্ছ রাজারাণী ফুল ছিঁড়ে তিপুর সম্মতিক্রমে খোঁপায় পরিয়ে দেন। তা দেখে কয়েকটি বনবালা সরু গলায় সমবেত ভাবে গান গাইতে শুরু করে দেয়। যে গানের ভাষা লেখকের কাছে দুর্বোধ্য হলেও তিপু বুঝতে পেরে, লাজে লাজানো মুখ নিয়ে ওদের দিকে পাথর তুলে তেড়ে যায়। আর লেখকের কাছে কিশোরী তিপুর কোপ, এ সবই যেন অধরা থেকে ধরার মধ্যেই আছে। তাই কালকূটের ভাষায়—

> ''কিন্তু আমি তো আমি-ই, আমার মন খুশিতে টলটলানো। এই বনের সংসারে, আমি এক নবজাতক। তিপু আমার ধাত্রী। আমি তো জানি, ওর চোখে-মুখে এই যে লজ্জার ছটা, সেটা প্রকৃতির আপন ধর্মে রঙ ফেরানো। হৃদয়ের অকলুষ স্পর্শ আমাকে সতেজ করেছে।''[১০৩]

তিপুকে নিয়ে লেখক কোয়েলের জলে স্নান করে, অসামান্য তৃপ্তিতে তিপুদের বাড়িতে আয়োজিত নিমন্ত্রণ পর্ব সেরে বন্ধু গৃহে ফিরে আসেন। তিপুর সান্নিধ্যে বনভ্রমণের স্মৃতি লেখককে ধনী, সুখী এবং ঋণী করে তোলে।

তৃতীয় দিনে সকালেই জরাইকেলায় সবাইকে বিদায় জানিয়ে, লরিতে চেপে লেখক গহীন বনে যাত্রা করেন। সঙ্গে চালক মোহনবাবু ও সুরীন। লরি একসময় পাহাড়ের ওপরে উঠতে আরম্ভ করে, গতি হয়ে পড়ে শ্লথ। পথ বৃত্তাকার বা অর্ধবৃত্তাকার। অরণ্য ক্রমে ক্রমে নিবিড়তর হয়ে ওঠে। নোয়াডিহির পাহাড়ী জঙ্গল যেন অন্ধকারে গ্রাস করে, বাতাস নেই, ঠাণ্ডা বেশি, আর পাশাপাশি কোয়েনা নদীর কল্‌কল্‌ শব্দ পাওয়া যায়। এটি কোয়েলের শাখা। বনের গভীরে কোথাও কোথাও কেবল রক্ত কুসুমের গাছ যেন সমস্ত জগৎ সংসারকে লাল করে দিয়েছে। বড় বড় গাছে পাতা নেই, কেবল নানা ফুলে ভরা, মাটির রঙও এত বিচিত্র, বিচিত্রতর যে বর্ণের হিসাবে সাতটা রঙকেও ছাপিয়ে যায়। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়ে টক্‌টকে লাল রঙ, আয়নার মতো মসৃণ, যেন শহরের মোজাইকের মতো চক্‌চকে্। ঝাপসা প্রতিবিম্বও দেখা যায়, যা কিনা প্রাগৈতিহাসিক বিশাল দেহধারী হাতির দল গা ঘষে করেছে। দেখে লেখকের ভেতরে এক রোমাঞ্চের আবেশ সৃষ্টি হয়। যাত্রাপথে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বনবালাদের সুনিপুণ বর্ণনাচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। মোহনবাবু লরিতে তিনজন বনবাসীকে তুলে নেন যারা তাঁর ইজারাদারিতে গাছ কাটে। শুক্রম,

তার বৌ সোমারি আর শালি সুরসতিয়া। লেখক এদের সরল, মধুর ব্যবহার ও কথাবার্তায় ভীষণ খুশি হন। লেখকের মনে হয় বনবালা দুটির বয়স যাই হোক, মন্দিরের নারীমূর্তির কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়। লেখক যেন গহীন বনের স্বরূপকে সুরসতিয়ার কথাবার্তা, দেহরূপ ও চোখের ভাষার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করেন। সেই আবিষ্কার বাণী বেজে ওঠে অপূর্ব এক সত্যের মধ্য দিয়ে—

> ''...সুরসতিয়া তার ডাগর কালো চোখের কোণে বারে বারে আমার দিকে দেখছে। দিদির দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন হাসির মধ্যেও নিঃশব্দে কোনো কথা বলাবলি হচ্ছে। সুরসতিয়া আমাকে ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে? উইলিয়াম কি এমনি চোখের টানেই মুণ্ডা হয়ে গিয়েছেন? সুরসতিয়া যেন এই গভীর বনের এক উল্লাস আমার রক্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।''[১০৪]

লেখককে ছোটনাগরায় নামিয়ে দিয়ে সুরসতিয়া সোমারি শুক্রম-সুরীন ও মোহনবাবুর দল চলে যায় এদেলবায়। ছোটনাগরায় অজিত সিংজীর বনবাংলোতে লেখক রতনের জিম্মায় থাকেন। লেখক কেবল নিজের চোখ দিয়েই বনজ প্রাণীদের দেখেন নি বরং রতনের অভিজ্ঞতাও তাঁকে বন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছে—

> ''আসলে বনের রাজ্যে, মানুষের আধিপত্য তারা ভালবাসে না। মানুষকে বিশ্বাস করার কারণও, তাদের প্রকৃতিবোধ থেকে কখনো ঘটেনি।... পশু বলতে পারি, কিন্তু বন তাদের আশ্রয়। জীবনের এটাও তো অভিজ্ঞতা, বন কেবল চোখ ভুলিয়ে, মন ভাসিয়ে, অনুভূতির মধ্যে এক অনির্বচনীয় গভীর অনিন্দ্যবোধের সৃষ্টি করে না। মৃত্যু তার ফাঁদ পেতে বসে আছে নানা খানে।''[১০৫]

কালকূট একাকী বনদর্শনে গিয়ে কিছু বনবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে অজানা তথ্য পেয়েছেন। অবশেষে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেছেন কোয়েনার স্ফটিক জলস্রোতের কাছে। বড় বড় পাথরের টুকরো ভর্তি। দু-পাশে ঘন বন, নিচে কোথাও সূর্যের আলো পড়েনি। ছায়া অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ বিচিত্র স্বরে একটানা ডাকছে। কোয়েনা পার হয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো স্থানে এগিয়ে গিয়ে প্রায় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে পেলেন অবিশ্বাস্য এই জন্যে মনে হল এরকম পোশাকের

মেয়ে ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু এমন নিবিড় বনে দেখা যায় কী না লেখক জানেন না। একটি বাঙালি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে, নাম তৃপ্তি ভৌমিক। ছোট নাগরার ব্লক ডেভেলপ্‌মেন্টের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একমাত্র নার্স। যেখানে না আসেন কোনো ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্র। মাসে একদিন অরণ্যের বাইরে গিয়ে বড় জামদা থেকে মাইনে আনতে হয়। তারপর সারামাসের খাদ্যসামগ্রীও কিনে আনতে হয়। সরকারি গাড়ির ব্যবস্থা না থাকাতে ইজারাদারদের গাড়িতে যেতে হয়, কিন্তু বর্ষাকালে তাও পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। সেই সময়টায় বনের কাজকর্ম বন্ধ। তৃপ্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার প্রতি লেখকের এক গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তৈরি হয়। কারণ দমদমের বাসিন্দা পিতৃহীনা তৃপ্তি মা ও ভাইবোনের ভরণপোষণের জন্যই নাগরিক সভ্যতা থেকে নির্জনে একাকী বাস করে যাচ্ছে। যেন তৃপ্তি নিজেই গভীর জঙ্গল থেকে দমদমের জীবনস্রোতকে বহমান রাখছে।

ক্রমশ অরণ্যকে চেনার পাশাপাশি লেখক ছোট নাগরার ভৌগলিক পট ও ইতিহাসকে জানার চেষ্টা করেছেন। সেই কাহিনি তৃপ্তির কাছেই শোনা। যা শুনে তাঁর মনে হয়েছে—

> ‘‘আমি যেন চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেলাম, অমসৃণ পাথরের থামে মশালের আলো জ্বলছে। রাজবাড়িতে উৎসব হচ্ছে, বনের রাজার আরণ্যক উৎসব। এই রকম বড় বড় নাকাড়া বাজছে, খালি-গা পেশিবহুল বলিষ্ঠ পুরুষ। যার গম্ভীর শব্দ পাহাড়ে জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।’’[১০৬]

নিবিড় বন্ধুত্বের দাবীতে ছোটনাগরার চতুর্থদিনে তৃপ্তি ভৌমিকের অরণ্য আবাসে লেখক নিমন্ত্রিত হন। বনের গভীরে লেখকের পাশে তৃপ্তির উপস্থিতি এক মুগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে। তৃপ্তি অনেক নাম না জানা শব্দের অর্থ করে দেয়—বরু মানে পাহাড়, শারজং মানে শাল গাছ। বনবাসীদের আরাধ্য বোঙা, এদের দেবদেবী বলে কিছু নেই সবই অপদেবতা বা অপদেবী। মারাং হোরো মানে হাতি ইত্যাদি। লেখককে নিয়ে বেশ উঁচু ‘তারা’ মাচা (হাই ভিউফাউণ্ডার) তে উঠে অনেক কিছু চিনিয়ে দেয় তৃপ্তি। যেখানে উঠে লেখকের মনে হয় যেন তিনি পৃথিবী ছাড়িয়ে কোনো এক দূর জগতে এসে পড়েছেন। চারিদিকে নানা বর্ণের ছটা। তার মধ্যে নীল আর সাদাই বেশি। বনকে নীল দেখায়। সবুজেরও যে কত বর্ণবাহার, না দেখলে তা একেবারেই বোঝা যায় না।

চতুর্থ দিনের শেষে পঞ্চম দিনের সকালেই লেখকের যাত্রা যাবেন এদেলবার জঙ্গলে। পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী সিংজীর লোক বদরিকাপ্রসাদ জীপ নিয়ে হাজির। নিঃসঙ্গ-নির্বাসিত তৃপ্তির মধ্যেও লেখকের সঙ্গে এদেলবায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায় কিন্তু যাত্রামুহূর্তে বিষণ্ণ তৃপ্তি জানায় একটি মুণ্ডা প্রসূতি বউয়ের শুশ্রুষার জন্য যেতে পারবে না, তবে পরে গিয়ে এদেলবায় দেখা করবে। গ্রন্থ শেষে কালকূটের জীপের ইঞ্জিন গর্জে উঠলো। তৃপ্তি রক্তকুসুমের রক্তাভায় দাঁড়িয়ে। ধুলো উড়িয়ে জীপ গাড়ি বাঁক নিয়ে, গভীর বনের চড়াইতে উঠতে লাগলো।

বনের সঙ্গে খেলা : (১৯৭৩)

১৯৭৩ সালের পূজা সংখ্যায় 'নবকল্লোল' পত্রিকায় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে এটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লেখক উৎসর্গপত্রে স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মরণে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

লেখক বদরিকা প্রসাদের জীপে করে চলেছেন সারেণ্ডা খণ্ডের জঙ্গলে, এবারের লক্ষ এদেলবা গ্রাম। মুণ্ডা ভাষায়, এদেল মানে শিমুল, আর বা মানে ফুল— অর্থাৎ শিমুলফুল। গ্রামের এমন নাম শোনা মাত্র লেখকের অনুভূতির মধ্য দিয়ে একটি স্বপ্ন যেন বিস্তার হলো—

> ''গ্রামের নাম কী? না শিমুলফুল। বাঙলার অনেক গ্রামের অনেক জায়গার, অনেক মিষ্টি নাম শুনেছি..। তেমন মিষ্টি নামের সংখ্যা বিস্তর। কিন্তু ভারতের এই নিবিড় গভীর অরণ্যের একটি গ্রামের নাম শিমুলফুল, শুনেই হঠাৎ মনের মধ্যে, বিস্ময় খুশি ঝলকের সঙ্গে রঙ চলকে ওঠে। প্রাণে বেজে ওঠে দুটি কলি—
> শিমূল পাগল হইয়া মাতে অজস্র ঐশ্বর্যভার তার দরিদ্র শাখাতে।''[১০৭]

লেখকের ঘরছাড়া প্রাণ এখন অরণ্যের ডাকে পাগল। বনের ডাকে লেখক মন বলে ওঠে—

> ''...আমার একটা ধ্যান আছে, খেলা। অরণ্য আমাকে খেলতে ডেকেছে, তার নিবিড় গভীর রূপসাগরে। এ খেলার নিয়মকানুন, সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানবো। জানতে জানতে খেলবো। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে আমি তেমনি করে

খেলবো... আঘাত যদি লাগে, চোখের কূল ছাপিয়ে আসে জল,
খেলার কানুন মেনে চলবো।"[১০৮]

যাত্রাপথে একটি অপূর্ব দৃশ্য লেখককে বিমোহিত করে, অরণ্য রহস্যের তাৎপর্যে তাঁকে মুগ্ধ করে তোলে, সেটি একটি নয়ন ভোলানো ময়ূর, যাকে স্পর্শের জন্য লেখক মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অধর সেই ময়ূরের দিকে তাকিয়ে নিজের বালখিল্যতায় নিজেই হেসে ওঠেন। কেন এই ধরাবাঁধার খেলা? বনের এই অঙ্গনে, এই যে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাদ্য খুঁজছে, এটাই আসল রূপ। যার যেখানে ঠাঁই।

বনের গভীর নিবিড়তার সঙ্গে সঙ্গে তার আশ্চর্য অপরূপ রং যেন চারপাশ থেকে ঝলকে উঠছিল। বনের রঙের যেন কোনো শেষ নেই। একলা কুসুমই তার আগুন রঙ নিয়ে যেন বনের মধ্যে দাবাগ্নি জ্বেলেছে। গাছে গাছে নানা বর্ণের ফুলের অন্ত নেই। পাতাবিহীন শাখায় হলুদ, নীল, সাদা, বেগুনী, লাল ফুলে ফুলে ভরা। আর অবাক করে দেয় পাহাড়ী মৃত্তিকা, যার এক এক জায়গায় এক এক রকম রঙ। হলুদ, নীল, লাল, ধূসর, সাদা প্রভৃতি। বন্য হাতি সম্পর্কে লেখক বদরিপ্রসাদের কাছে জানতে পারেন নানা রকমের তথ্য। হাতির মেজাজের কথা কিছু বলা যায় না, সামনে মানুষ পড়লেই যে আক্রমণ করবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। অনেক ক্ষেত্রে শান্ত হয়ে চলে যায়, আবার আক্রমণ করলে ভারী শরীর নিয়েও দ্রুত দৌড়াতে পারে। এরকম অবস্থা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে কালান্তক। তবে জঙ্গলের মানুষেরা খুব সাবধান, হাতির সামনে হঠাৎ পড়ে গেলে, কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, সেটাও তারা ভালো জানে। এদেলবা-তে পৌঁছে লেখকের প্রতিক্রিয়া ঠিক এইরকম—

"সমস্ত জায়গাটিকে অনেকটা তপোবনের মতো লাগছে। তপোবনই বলতে হবে। তপস্বী তপস্যায় বসে গেলেই হয়। ডানদিকে কোয়েল ওপারে রক্তিম আর কালো পাথরের পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, আর পাথরের খাঁজে খাঁজে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে বিশাল মহীরুহ। আরো অন্যান্য অনেক গাছ, যাদের পাতায় নানা রঙের খেলা, ফুলে নানা বর্ণের ঝলক।... নানা বর্ণের কল্‌কী ফুলের গাছ ... বাঁকানো পিঠের মতো একটা উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। তার কোল দিয়ে কোয়েনা একটা বাঁকের মুখে উধাও ... ইচ্ছা করে, কোয়েনার

এই হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া লুকোচুরি খেলার সঙ্গে মেতে যাই,
আমিও ছুটে ছুটে তাকে খুঁজে বের করি।”[১০৯]

কোয়েনার চরে গাছ কাটার কুলি কামিনদের ছোট ছোট পাতার ঘরগুলোকে মুণ্ডা ভাষায় বলা হয় ‘গুইয়ো’। সেরকমই একটি পাতার বড় ঘরে লেখকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পাতার ঘরের ধারে লেখক, প্রকৃতির প্রতীকে একটি আদিম পবিত্রতম দৃশ্য দেখে বিমোহিত হন। হাট করা মাতৃবক্ষে শিশুর অবস্থানকে তিনি বিশেষ অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করে বলেন—যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গো-বৎস চরে বেড়াচ্ছে।

লেখক নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে যেন কালিদাসের ‘তপোবন’ চিন্তাকে বিস্তৃত রূপে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর ভাষায়—

‘‘আমার কাছে যেন অনেকটাই অবিশ্বাস্য অথচ অবিশ্বাসের কিছুই নেই। সত্যি আমি দাঁড়িয়ে আছি, এক তপোবনের মতো স্থানেই। রামায়ণ মহাভারতে মুনি ঋষিদের যে তপোবনের বর্ণনা পড়েছি, অবিকল সেইরকম। সহসা যেন আমার মন ও দেহ, এক অপরূপ কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হয়তো হাজার বছর আগে এখানে মুনি ঋষিরা ছিলেন। তাঁরা হয়তো এখানেই তপস্যা করতেন, আর তাঁদের পাশে ঘুরে বেড়াতো ময়ূর হরিণেরা।”[১১০]

পাতার ঘরে মোহনবাবুকে না পেয়ে বদরিকাপ্রসাদ হোরো-র কাছ থেকে সব শুনে লেখককে নিয়ে আরো গভীর বনে প্রবেশ করে। যেখানটা প্রায় অন্ধকার, অসূর্যস্পশ্যা ভেজা ভূমি, উঁচু নিঁচু মোড় আর বাঁক রয়েছে প্রচুর। একটি নালার পাশে কয়েকশো ফুট ওপরে চলছে গাছ কাটা। কুলি-কামিনদের মধ্যে সুরসতিয়া আর শুক্রমকে তিনি চিনতে পারেন। জানতে পারেন ফরেষ্ট গার্ডের দায়িত্ব হল, ইজারাদারদের গাছ কাটার সময় মারকিং রেঞ্জারের ছাপ দেওয়া গাছগুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়া। আর যদি কখনো কোনো কুলি ভুল করেও মারর্কিং রেঞ্জার ছাপ ছাড়া গাছে কুড়োল বসায় তাহলে, ইজারাদারদের নাম উঠে যাবে ব্ল্যাক লিষ্টে। জঙ্গল থেকে একেবারে বিদায় নিতে হবে। কোথাও আর টেণ্ডার দিতে পারবে না। আইনকানুনে জেরবার হতে হবে। চারিদিকে গাছকাটা দেখে মনে হয় যেন বৃক্ষমেধের বিরাট যজ্ঞ চলেছে। কর্তন-পতন-ক্ষেপণ, সেই সঙ্গে সকলের নানা স্তরের চিৎকারে, বনভূমি সচকিত।

এসব দেখে তাঁর জরাইকেলার গাঙ্গুলিমশাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়, যিনি অরণ্যের সঙ্গে একাত্মতার কারণে বৃক্ষের হাসি কান্না শুনতে পান, বৃক্ষের সঙ্গে কথা বলেন একান্তে। তিনি এই উচ্চ ভূমিতে থাকলে নিশ্চয়ই মরণোন্মুখ বিশাল বৃক্ষের মৃত্যু আর্তনাদ শুনতে পেতেন। যদিও লেখক তাঁর মধ্যে সেই গভীর আরণ্যক অনুভূতিকে কখনো দেখতে পান না। তবে এ কথা মনে হয়, যে বৃক্ষটিকে কাটা হচ্ছে, তার বয়স সম্ভবত শতবর্ষ, কিংবা তারও বেশি। এই বনের শত শত বৎসরের অনেক প্রাকৃতিক উত্থান পতনের সাক্ষী এই সব বনস্পতিরা। যাদের দেখলেই ঋষির মতো, গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ মনে হয়। লেখক আরেকটি জিনিস খেয়াল করছিলেন যে গভীর অরণ্যের ঠাস বুনোটের কারণে বেশ ঘেমে যেতে হয়, বরং সূর্যালোকের ফাঁকায় হাওয়া বাতাস বয়ে যায়, শরীর জুড়ায়। বনের মধ্যে মাঝে মাঝেই শোনা যায় ময়ূরের কেকাধ্বনি, কে-ক্! কে-ক্! মোহনবাবু ও সুরীনের আতিথেয়তা লেখককে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে মোটর মেকানিক সুরীনের মুরগী পাতুরি কখনোই ভোলার নয়। শালপাতায় মোড়া সুসিদ্ধ মশলা দেওয়া আস্ত মুরগীর স্বাদ এককথায় অতুলনীয়। তবে এঁদের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সিংজীর জীবনকাহিনি লেখককে বিষণ্ণ করে তোলে। বনের জগতের সবখানেই তিনি হলেন একটি বিশেষ চরিত্র, কেবল যে সম্মানে, তা না সিংজী সাহেবকে ঘিরে, একটা ভয় মেশানো সম্ভ্রম সর্বত্র, কিছু কৌতূহলোদ্দীপক কথাও শুনেছেন মোহনবাবুর কাছে। তবে এ সবের মধ্যে সিংজীর ট্র্যাজেডিটাই লেখকের কাছে বড় বলে মনে হয়। সিংজীর একমাত্র সন্তান পোলিওতে ভুগছে, ছেলেটি চলতে ফিরতে পারে না। ওঁর স্ত্রী থাকেন টাটায়। সিংজী যখন তাঁর ছেলের কথা বলেছিলেন, মনে হয়েছিল তাঁর স্কচ্ হুইস্কি ঝলকানো চোখের কূলে যেন একটি অসহায় পিতার কান্না থমকে আছে। লেখক, আর একটি মেয়ে সীমার সঙ্গে সিংজীর সম্পর্ক আছে শুনেছেন। সীমা একটি ওড়িয়া বাঙালি সংমিশ্রিত ভারতীয় মেয়ে, যার রূপ যৌবন নাকি পুরুষ মাত্রেই রক্তে দোলা দেয়। নাচ গানও জানে সিংজী তাকে কটক থেকে রাউর কেলায় রেখেছেন। মোহনবাবুর ভাষায়, প্রেমিকা বা কংকোবাইন যা খুশি ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সেই সীমাকে ভালো লেগেছে এক জার্মান সাহেবের যার প্রতাপ রাউরকেলার ইস্পাতগড়ে অখণ্ড। অন্যদিকে সিংজী সাহেবের স্টিল কন্ট্রাক্টরি ব্যবসাও ছোটখাটো না। অগত্যা, তাঁকে অনিবার্যভাবেই সীমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে জার্মান সাহেবের হাতে। কারণ মোহনবাবুর ভাষায় এই জগৎটা চলছে গিভ অ্যাণ্ড টেক পলিসিতে। অরণ্য থেকে কুলি কামিনরা ফিরে

আসলে তাদের সাংসারিক কাজে কর্মে সন্ধ্যা আসন্ন কোয়েনার পার যেন কলরব মুখরিত হয়ে ওঠে। মোহনবাবু খাতা কলমে হিসেব লিখতে লিখতে কুলি মজুরদের নিত্যদিনের চাল মেপে দেন, এরপরে মজুরেরা রান্না করে, রাত্রে কিছুটা খেয়ে বাকিটা তারা সকালের জন্য রেখে দেয়। কিন্তু সারাদিনে আর কিছু খায় না তারা। তখন শুধু কাজ করে। সুরসতিয়াদেরকে লেখক এক কৌটো সিগারেট খাওয়ান, আর তার প্রতিদানে রাত্রের নাচ-গান-হাঁড়িয়া খাওয়ার আসরে সুরসতিয়া লেখককে নিমন্ত্রণ জানায়। রাত্রের এই আসরে শুণ্ডিনী সূর্যমণির কাছ থেকে সুরসতিয়া হাঁড়িয়া নিয়ে এসে আরণ্যক আদিম নৈসর্গিক পটভূমিকায় লেখকের সামনে বাড়িয়ে দেয়, সঙ্গে সুরসতিয়ার বান্ধবী মাংরিও থাকে। এদের মান রাখতে ডিয়েং পান করতেই হয়, কারণ কাদের কিসে ইজ্জত থাকে আর যায়, তা নির্ভর করে সমাজ সামাজিকতার ওপর। এই পটভূমিকায় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে— কালকূট! এখন তুমি কার? উত্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হয় বনের সঙ্গে, তার খেলায় ও লীলায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ধীরে ধীরে নাচে গানের চিকন সরু সুরে, হাসি ঠাট্টার লহরিতে মুহূর্তেই যেন এক আরণ্যক জীবন তার স্বরূপকে মেলে ধরে। অরণ্যে আবৃত ছায়া ঘন গভীর পার্বত্য অঞ্চলের জীবনবোধের সঙ্গে, সভ্যতার আলোকের পারে জীবনচিন্তার তফাৎ কোথায়? সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। লেখকের কোলে সুরসতিয়ার দু হাত যেন অতীব স্বাভাবিক আর অনায়াস। আরণ্যক পরিবেশে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য মোহনবাবু ও সুরীনকে অবাক করে দিয়েছে।

বনের ডাক শুনে লেখক যখন যাত্রা শুরু করেন, তখনও জানতেন না সুরসতিয়ার মতো একজনের সাক্ষাৎ পাবেন। ভাবেননি, বনের গভীরে এক বনবালা এমনি করে দুহাত বাড়িয়ে কিছু দেবে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' -এর নায়ক যেমন ভানুমতির প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি কালকূটও যেন সুরসতিয়ার অনাস্বাদিত প্রেমের কাছে ঋণী হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে সঞ্জীব চন্দ্রের 'পালামৌ' -এর কথা যেখানে এই সুরসতিয়াদের কথাই লেখা আছে। আরো মনে পড়ে যায় এঙ্গেলস -এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সভ্য সমাজের মানুষেরা যখন অরণ্যের আদিবাসীদের দিকে চায়, তখন তাদের চোখে থাকে 'স্পেকটিকল্ অব প্রসটিটিউশান'। কারণ এঁদের জীবনযাত্রায়, যৌন ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে আদিম সাম্যবাদের মূল সূত্রগুলো একেবারে হারিয়ে যায়নি। এদের অধিকারবোধ, সতীত্বের

সংজ্ঞা একেবারে আলাদা। অরণ্যে পাহাড়ে বহু দ্বীপে এখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য, নারীকে পুরুষের সমকক্ষতার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না, তা অনিবার্য, স্বাভাবিক। মুণ্ডা ভাষায় গান ও নাচের ধরণ প্রায়ই একরকমের, তবে পিকা নাচের সময় ওরা পালক দিয়ে সাজসজ্জা করে। নাচের আসরে ডিয়েং পান করে সবাই নেশায় আচ্ছন্ন প্রায় যেন এক মন-পাগল করা উৎসব, যার সঙ্গে দেহ মন জড়িয়ে থাকে। বাধাবন্ধনহীন মিলনের ডাক যেন তাদের গানে।

লেখক, সুরসতিয়ার কাছ থেকে জানতে পারেন ওরা যখন ইজারাদারবাবুর কাজ করে শুধু তখনই ভাত খেতে পায়। বছরের অন্যান্য সময়ে জঙ্গল থেকে মহুয়ার ছাতু বানায় বা সাঙ্গা কান্দা (ওল -এর থেকে বড়, মাটির নিচের জিনিস), লোয়াক (ঝিনুক), ডুমরী (উইপোকা) সংগ্রহ করে ওতু (তরকারি) বানায়। মকাই ভুট্টা-মহুয়া-জামফল দিয়ে সপ্তাহান্তের হাট থেকে নুন-তেল-মশলা কিনে আনতে হয়, কিন্তু সব সময় তাদের দামে কুলায় না তাই এসব বাদ দিয়ে কখনো সেদ্ধ খেতে হয়। ইজারাদারের গাছ কাটা হয়ে গেলে তারা বনের ভেতরে গাঁয়ে ফিরে যাবে, সেখানে সরকারি কাজ করবে। সরকার তাদের জঙ্গল ও রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ দিয়ে বনে ঘর ও চাষের জমি দিয়েছে। বর্ষার তিনমাস যখন গাছ কাটা মানা থাকে সেইসময় চাষবাসে তারা মন দেয়। এই তাদের সমগ্র জীবন। এ ছাড়াও আছে, কিছু পরব, তারমধ্যে মাঘের পরব সব থেকেই উল্লাসময় আর আনন্দদায়ক। লেখকের মনে হয়, এদের সমগ্র জীবনটা নাগরিক সভ্যতার চোখ দিয়ে ব্যাখা করলে হয়তো তুলনায় বিচারে, দরিদ্র আর নিষ্ঠুর বলে মনে হবে। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদকে, চিন্তা থেকে বর্জন করা যায় না! তবে সেটা অনেকখানিই অনুভূতির ব্যাপার বা অন্যান্য ভারসাম্যর। হয় তো জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও। কিন্তু ভারতবর্ষের এই মানুষরা, আমরা যাদের 'আদিবাসী' বলতে শিখেছি, যাদের কাছে প্রতিদিন দুটো নুন ভাতই বিলাসিতা, তখন নিজেদের স্বদেশে, চিন্তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। ওরা ভারতবাসী না, ভারতীও আদিবাসী। আমরা কি বনবাসী? চিহ্নিত করতে হলে, তা-ই তো বলা উচিত। ভাষার ধ্যানধারণায় আমাদের বিভিন্ন প্রদেশেও অনেক তফাৎ আছে তথাপি আমরা শুধু ভারতবাসী। ওরা আদিবাসী হয়। বিভক্তি আর বিভক্তি। যত বেশি ভাগাভাগি, তত বেশি অপরিচয় আর সংঘর্ষ। যাদের মুনাফা লুটবার, তারা হাততালি দিয়ে লুটে খেয়ে যায়। গ্রন্থের শেষের দিকে সুরসতিয়ার হ্লাদিনী শক্তিকে লেখক যেন আরণ্যক

জীবনের আঙ্গিক থেকেই আবিষ্কার করলেন। মুগ্ধ লেখক সুরসতিয়ার আদিম মন্ত্রমুগ্ধ দেহে নিজেকে সমর্পিত করলেন। সুরসতিয়ার শোনানো ধর্মতত্ত্বের আদিকাহিনির মতোই যেন মুণ্ডা দেবতা মারাংবুরু এদের মাঝখান হতে করমের ডালটি সরিয়ে নিয়েছে। কোয়েনার স্নিগ্ধ শীতল জলে আদিম পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীকে এঁরা অবগাহন করলেন। এখানে কালকূটের ভাষা অনির্বচনীয়— ''... ঠাণ্ডা শীতল, কবেকার সেই দূরকালে বহমান আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিস্বরূপিণী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন!''[১১১]

একটি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক, লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর 'প্রিয়নারী' সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কালকূট তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর পশ্চাৎপট হাতড়ে যাকে 'প্রিয়নারী'-র আসনে বসিয়েছেন সেই প্রিয়নারী হল, বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ 'বনের সঙ্গে খেলা'-র আরণ্যক নায়িকা সুরসতিয়া। গ্রন্থে উল্লিখিত নরনারীর চরিত্ররা বাস্তবের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র চরিত্রদের নামগুলিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। যেমন গ্রন্থের সুরসতিয়া বাস্তবে—'কয়ো'। অন্যান্যরা — সোমারি—বাস্তবেও 'সোমারি', শুক্রম—বাস্তবে 'বুধুয়া', মোহনবাবু বাস্তবে 'মৃন্ময়বাবু' ও সুরীন হলো — 'অনিল'। সিংজী— 'শ্রী সিন্‌হা'।

বনভ্রমণের ষষ্ঠ দিনের বেলা দুটোয় অজিত সিংজীর জীপে করে থলকোবাদে যাওয়ার ক্ষণ স্থির হয়। সুরসতিয়াকে আর শেষবারের মতো লেখক বিদায় জানাতে পারলেন না।—

> ''... আমি মুখ নামিয়ে, জীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। সুরসতিয়া ঘুমোক। ঘুম ভাঙিয়ে বিদায় নেবার থেকে, নিঃশব্দ বিদায় ভালো। কারণ, জাগ্রত চাক্ষুষ বিদায়, অনেক সময় বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না।... বিদায় সুরসতিয়া! আমার প্রণাম তোমার কালো শীতল দুটি পায়ে।''[১১২]

প্রেম নামে বন : (১৩৮১)

গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৮১ সালে 'নবকল্লোল' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় এবং পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে ১৩৮২ সালের বৈশাখে। একই

সালে কার্তিকে এই পুস্তকটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি আগের লেখা দুই অরণ্য কাহিনির মতোই স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন।

যার প্রেমের বাহু ডোরে লেখক নিজে বাঁধা পড়েছেন, অরণ্য তার নাম। অরণ্যের নিবিড় প্রেমের ফাঁদ লেখককে অনেক আগেই ডাক দিয়ে ঘরছাড়া করেছে। একজন তো এরকমও বলেছেন— 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে/কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' — শুনে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ভয়াল ব্যাপার! বাঙলাদেশের সদ্য স্বাধীনতার পরেই লেখক একবার সেই দেশের মীরপুর নামক স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই প্রশাসকরা একটু চিন্তিত হলেন, কারণ সেই স্থানেই মাটিতে বিস্ফোরক মাইন রেখে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানী দালালরা হত্যা করেছিল। বিশেষত প্রেমের ফাঁদের সঙ্গে লেখকের মনে পড়ে যায় এই মাইনের ক্ষেত্রর কথা। লেখকের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে অরণ্যের রূপের মোহ, যা সে সারা অঙ্গে ধারণ করে আছে। লেখকের বিচরণ এখন সেই অরণ্যের অঙ্গে অঙ্গে, তার অঙ্গের অভ্যন্তরে। শুকনো মৃত্তিকার গভীরে, যেমন করে জলের ধারা চুঁইয়ে প্রবেশ করে, বনের রস তেমন করে লেখকের গভীরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্রবণ। অরণ্যের ফুল, ফল, লতাগুল্মের মদির গন্ধ লেখককে মাতাল করে তুলেছে। 'চোখ গেল চোখ গেল' পাখিটার মতো তাঁরও চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়, অরণ্যের বর্ণাঢ্য রূপ চোখে দেখা যায় না, অথচ চোখ ফিরিয়ে রাখাও যায় না। যেন লেখক এই বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন যেন নিজেকে তার কোমল বাহুডোরে হারিয়ে ফেলেছেন। লেখক বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—

> ''এখন আমি তার চরণে প্রণাম করছি, সে আমাকে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গণ করে চুম্বন করছে। প্রেমের এমনি খেলা। আমি যদি তাকে মা বলে ডাকতে যাই, সে অপরূপা প্রকৃতির সাজে, আমাকে প্রেমশরে বিদ্ধ করে। ... আমি কালকূট, বিষে অঙ্গ জরজর। মরুর উত্তাপের জ্বালায়, আমি যখন তার নিবিড় ছায়ায় সুখ সন্ধান করি, সে আমার চোখের দুকুল ভাসিয়ে দেয়। জ্বালায় পড়ে যখনই প্রলাপ বকতে যাই, কী এক অনির্বচনীয় সুধায়, সে আমার প্রাণ ভরিয়ে দেয়।... প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যাও আমি জানি না। এখন বন আমার প্রেম। সে আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার আপন ঘরে, যার কোনো সীমা

নেই।...”[১১৩]

লেখককে পাশে বসিয়ে সিংজী তাঁর ঝক্‌ঝকে নতুন জীপ ড্রাইভ করেন, রক্তকুসুমের বনের চড়াই-উৎরাই পথ ধরে নিয়ে যান। সুরা পানের কারণে সিংজীর রক্তিম চোখে মুখে একটা ঝক্‌ঝকে ঝলকের প্রকাশ। বনের পাকে পাকে রয়েছে, অনেক বিপাকের পথ, তাই বুলেট ভরতি একটা ইটালিয়ান সাইড হ্যামার সিংজীর বনপথে চলার সঙ্গী। সংসারে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা কিনা নিষেধের গণ্ডিতে কখনো বাস করতে শেখে নি, চলতে শেখে নি, আচরণ করতেও শেখে নি। সিংজী হলেন ঠিক সেইরকম একজন ব্যক্তি। বনের গভীরে সামটা নালার ধারে এই সিংজীই একদিন বন্দুকের গুলিতে আক্রান্ত হন, যা ক্ষতরূপে শরীরে থেকে যায়। আর সেই আত্মরক্ষার জন্যই তাঁকে সঙ্গে ইটালিয়ান সাইড হ্যামার রাখতে হয়। জরাইকেলা থেকে শুরু করে অরণ্যের গভীরে বিভিন্ন স্থানে এই অজিত সিং-এর বাসভবন রয়েছে। অরণ্যের বাইরে যেমন টাটানগর থেকে রাউরকেলা পর্যন্ত তেমনি জঙ্গলের অভ্যন্তরে, ছোট নাগরাতেও তাঁর নিজস্ব বাড়ি এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী আছে। জঙ্গলের গভীরে লেখক প্রথম এসে ওঠেন, সিংজীর ছোট নাগরার বাড়িতেই। তারপরে দ্বিতীয়বারে এদেলবায় এবং সেখান থেকেই সিংজীর সঙ্গে চলেছেন আরও গভীর অরণ্য থলকোবাদে। লেখক এখন পুরোপুরি সিংজীর অতিথি।

লেখকরা এদেলবা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কয়েকদিন বনে ঘুরে ঘুরে লেখকের এটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বনের বিকাল হঠাৎ কখন নেমে আসে বোঝা যায় না। কিম্বা সন্ধ্যের নিবিড় ছায়া কখন ঘিরে আসে তাও ঠিক খেয়াল করা যায় না। কারণটা আর কিছু না। এক সময়ে, রৌদ্র ঝলকিত প্রান্তর থেকে বনের গভীরে যেখানে সূর্যের আলো কদাচিৎ প্রবেশ করে, এমন নিবিড় বন অতিক্রম করে, কিছুটা মুক্তাঞ্চলে এলে দেখা যাবে যে সূর্য অস্তগামী। তার রক্তাভা ছড়িয়ে আছে বনে বনান্তরে। অথচ, নিবিড় বনে প্রবেশের আগে, ঝলকিত রৌদ্রের দৃশ্যটাই তখনো জেগে থাকে মনের কোণে। প্রকৃত দৃশ্য যে কখন বদলিয়ে গেছে, সে কথা মনে থাকে না।

সিংজীর জীপ তাঁকে নিয়ে চলে, প্রায় দুহাজার ফুট ওপরের পাহাড় দিয়ে। রাস্তার একপাশে বন বেষ্টিত পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। প্রায় প্রত্যেকটি বাঁকের মুখই চোখের বাইরে এবং বাঁকের মুখগুলো প্রত্যেকটিই ঘন ঘন। প্রত্যেক বাঁকের মুখেই, একটি করে

সাইনবোর্ড দাঁড় করানো, যার গায়ে কঙ্কালের মুণ্ডু ও নীচে দুটি হাড়ের ক্রস চিহ্ন। এই সব চিহ্নের অর্থ মৃত্যু অতএব সাবধান। আবার কোথায় কী জাতীয় বাঁক বা কালভার্ট অথবা সেতু আছে তা অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি বোর্ডের মাধ্যমেও জানানোর ব্যবস্থা আছে।

এদেলবা ছেড়ে আসার পরে, সিংজী লেখককে নিয়ে একটু ইঙ্গিতমূলক ঠাট্টা করছিলেন, আর যাকে কেন্দ্র করে বলছিলেন, সে হলো এদেলবার সুরসতিয়া। সিংজীর ভাষায়—

> ''... আপনাকে আমি রেসপেক্ট করছি এই কারণে, আপনি কেবল সাহসী না, আপনিও নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। নারী পুরুষের মিলনের চুক্তিটা সব সমাজেই আছে, এদেরও আছে। চেহারা একটু অন্যরকম। ... তবু উৎসর্গটাই আসল কথা। আপনার যদি ইচ্ছা না থাকতো, আলাদা কথা। কিন্তু একজনের উৎসর্গের কাছে, আপনিও নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আপনার সঙ্গে, আমাদের অনেকের সেখানেই তফাত। কারণ, উৎসর্গের থেকে আমরা সভ্যতার ইতরামিটাকেই বেশি পছন্দ করি।''[১১৪]

সুরসতিয়ার প্রসঙ্গ লেখককে আড়ষ্ট করে তোলার পাশাপাশি ভেতরের আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লেখকের মনে হয়েছে সুরসতিয়া নামে একটি মুণ্ডা মেয়ে যে, তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনকালের নক্ষত্র, তা কখনোই ভোলা সম্ভব না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রেম এখন বন, এই বোধ আর অনুভূতি, সুরসতিয়ার দান। সুরসতিয়া বনবালা। বনের যে প্রকৃতি সৌন্দর্য, তার যে গভীরতা, আনন্দ সুখ এবং তীব্র একটি বেদনাও বটে, সুরসতিয়ার মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন।

সিংজী গাড়ি চালাতে চালাতেই লেখকের সঙ্গে কথা বলে চলেন। কিন্তু লেখক অবাক হন, সিংজীর কথাগুলো শুনে। তিনি যে এমনভাবে এসব কথা বলতে পারেন, তা তাঁর ধারণারও বাইরে ছিল। লেখক সিংজীকে একজন ধনী, দুর্ধর্ষ সাহসী, অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান এবং বেপরোয়া ব্যক্তি ছাড়া, অন্যকিছু ভাববার অবকাশ পর্যন্ত পান নি। কিন্তু তাঁর কথাগুলো শুনলে বোঝা যায়, তাঁর অন্যদিকের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার জীবনটাও খুব ছোট না। তা না হলে বনের সমাজ ও মন সম্পর্কে এমন করে বলতে পারতেন না। তবে তার সঙ্গে, আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয় ছিল। কথাগুলো বলতে বলতে, তিনি ক্রমেই কেমন যেন গম্ভীর

হয়ে উঠছিলেন। প্রথমে যেমন ঠাট্টা করে কথা বলছিলেন, শেষের দিকে তাঁর কথাবার্তা আর তেমন হালকা শোনাচ্ছিল না। অন্যদিকে সুরসতিয়ার নিষ্পাপ প্রেম লেখকের কাছে এক আনন্দময় স্মরণযোগ্য ঘটনা, যা জীবনকে নতুন করে জানতে শেখায়। কালকূটের 'প্রেম নামে বন' -এর কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে হিংসা, কাম, সন্দেহ, সংশয় — এই সব কিছুকে অতিক্রম করে, প্রেমে পৌঁছনোর একটা তাগিদ অনুভব করা যায়। বন্য-পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও লেখক তাঁর মনটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে কখনই দ্বিধা করেননি। তাঁর নাগরিক মন, বনে এসে, বনের সঙ্গে নাগরিক সংস্কার নিয়ে আদিম খেলা খেলেছে সুরসতিয়ার সঙ্গে আবার সেই নাগরিক মনের মর্যাদা দিয়েই, অরণ্যাঞ্চলে চাকরি করতে আসা নাগরিকা তৃপ্তিকে নাগরিক প্রেম দিয়েই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'তিপু-সুরসতিয়া-তৃপ্তি' এই ত্রয়ী পরিমণ্ডলের পথ ধরেই যেন লেখক স্থান-কাল-পাত্রকে স্পর্শ করে, প্রেমের বনে নিজেকে এক স্বাভাবিক মুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত করেছেন।

সিংজীর গাড়ি যখন নামতে শুরু করে লেখক খেয়াল করেন, পড়ন্ত বেলার রোদ থেকে গাড়ি ক্রমে এক অসূর্যম্পশ্যা অন্ধকার স্থানে নেমে যায়। সেখানে যেন একটু শীতের আভাস। গন্ধও যেন একটু বদলিয়ে যেতে থাকে। যেন এক অতি প্রাচীন নিবিড় গন্ধ। লেখক এইসময় পাঞ্জাবি আর চোস্ত পড়া সিংজীকে দেখে অবাক হন, কারণ যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ সুরা পান করে তাঁর কেমন করে মেদ বর্জিত ঋজু শরীর হতে পারে! লেখক তার বয়সের হিসাব না জানলেও অনুমান করেন, সম্ভবত চল্লিশের কাছাকাছি হবে। তাঁর মাথায় পাতলা চুলে অল্প পাক ধরেছে। সূচাগ্র এবং সুদীর্ঘ গোঁফজোড়াতেও কয়েকটি রুপোলি ঝলক উঁকি দিচ্ছে। তাঁর জামার বোতামই যে শুধু হীরার, তা না। অনামিকার আংটিতেও হীরা বসানো।

সিংজীর দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো দেখে কালকূটের মনে পড়ে যায় ছোট নাগরায় যাওয়ার পথে ফরেষ্ট রেঞ্জার বদরিকাপ্রসাদের কথা। আবার গাড়ি যখন গ্রামের মধ্যে ঢোকে তখন গ্রামবাসী লেংটি পরা পুরুষ ও ছেলেমেয়েরাও তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে বাদ পড়ে না, এরা যেন অরণ্য নিসর্গ -এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি হয়ে রয়েছে। আবার মুহূর্তে দুটি তরুণী বনবালাকে দেখে তাঁর মনে পড়ে যায় সুরসতিয়ার কথা। তাদের সৌন্দর্যের সঙ্গে যেন কোয়েনা নদীর বিস্তার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এইভাবেই লেখক উপন্যাসের ছোট ছোট চরিত্রকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন।

গাড়ি পাহাড়ে একটা বাঁক দিয়ে আরো খানিকটা উঁচুতে উঠতে মোরাম পাথর বিছানো একটি চত্বরে সিংজীর বৃহৎ বাংলো বাড়ি। বনাঞ্চলের গভীর স্থান হওয়া সত্ত্বেও বাংলোর ভেতরের ব্যবস্থা রীতিমতো রাজকীয়। একটি নাতি উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে লেখক দেখতে পেলেন সারেণ্ডা বনের বহুদূর বিস্তৃত বনাঞ্চলকে। তাঁর চোখের সামনে নাম না জানা গাছে, নানা রঙের ফুলের বাহার। হলুদ, বেগুনি, সাদা নানা রঙের ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা। কিন্তু এখন সকলেই যেন অস্তগামী সূর্যের লাল ছটা মেখেছে। বাংলোর সামনে সবুজ রং-এর কাঠের রেলিং দিয়ে অর্ধবৃত্ত চত্বর ঘেরা। রেলিং-এর নিচের থেকেই নেমে গিয়েছে খাদ, যা গভীর জঙ্গলে আবৃত। রেলিং-এর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, বেশ কিছু কিছু ফাঁকে রয়েছে সবুজ রঙের কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, সযত্নে তৈরি ছোট ছোট ফুলের বাগান। বাঁদিকে একটা সাঁকোর মতো রয়েছে, তার মাথার ওপর কেয়ারি করা লতাগুচ্ছের নীচ দিয়ে যেন একটি কুঞ্জবীথির দিকে যাবার সেতু, ঠিক চওড়া কাঠের তৈরি প্ল্যাটফর্মের মতো, শেষের দিকে রেলিং ঘেরা। সেতুর ওপর দাঁড়ালে বাংলোকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তবে এমন একটি উঁচু শূন্য স্থান থেকে অরণ্যের বহুদূর বিস্তৃত দৃশ্য দেখার ব্যবস্থা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। সুদৃশ্য, সুসজ্জিত থলকোবাদের বাংলোর পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিহ্বল লেখকের অরণ্য প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে।

গভীর নির্জন অন্ধকার বনাণীতে চালভাজা ও স্কটল্যাণ্ডের সুরা সহযোগে লেখক ও সিংজীর গল্প শুরু। যদিও অন্য সময়ের মতো সিংজীরই সুরাপানের ঝোঁক বেশি। সিংজী লেখককে সংবাদ দিলেন, একটি চিঠির মারফত ছোটনাগরার তৃপ্তি ভৌমিক, বাংলোতে লেখকের সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়েছে। এরপর সিংজী প্রায় তিন ঘন্টার মতো গল্পগুজোবে লেখকের সঙ্গে নিমগ্ন হন। সিংজী তাঁর প্রেমের বনের এক রহস্য যেন উন্মোচন করলেন। সারেণ্ডা বনের সব থেকে শ্রেষ্ঠ স্থান থলকোবাদের বাংলোয় বসে রাত্রের অন্ধকারে, একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতোই লেখক একটি মানুষের মনের কথা শুনে যান। যার জীবনে হিংস্রতা, লোলুপতা বা প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্যে প্রেমেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। অজিত সিং ক্রমে লেখকের কাছে একটি জটিল রহস্যময় চরিত্র বলে মনে হয়েছে। তিনি একজন ধনী ইজারাদার, পাশাপাশি দুর্ধর্ষ রকমের সাহসী, ব্যক্তিত্ববান এবং বেপরোয়া ব্যক্তিত্ব। এহেন সিংজীই বলতে পারেন— ''... আমি সরকারের ওপর সরকার নই, এই বনকে আমি ভালোবাসি। এই বন আমার প্রেম।

কিন্তু আবার ঠিকাদার হিসাবে, এই বনই আমি ছিন্নভিন্ন টুকরো করি।"[১১৫]

আবার কখনও এই সিংজীর পাষাণ প্রাণে বয়ে যায় পিতৃ হৃদয়ের অনাবিল স্নেহধারা। টাটানগরের একটি হাসপাতালে, তাঁর একমাত্র নাবালক পুত্র, পোলিও আক্রান্ত হয়ে, মৃত্যুর মুখে শয্যাশায়ী। শিক্ষিতমনা সিংজী তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখকে শেক্সপীয়রের রচিত লাইন আবৃত্তি করে বোঝাতে চান। যে দুটি চরম দুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, সেই দুটির জন্যই তিনি সংসারের সব কিছু বিলিয়ে দিতে চান। অথচ তিনি এও জানেন যে, সে-দুজনকে কখনো ফিরে পাবেন না। হয়তো সেইজন্যই তিনি, জীবনের আহৃত সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে অরাজি নন। তাঁর বুকের চাপা হাহাকার এইভাবে প্রকাশ পায়—''রাইটার সাহেব, এ সংসারে দুজনের জন্য আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একজন সীমা, আর একজন টাটার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, আমার ছেলে—আমার লাল।"[১১৬]

সীমা দাসকে সিংজী আপন প্রাণের গভীর থেকে ভালো বেসেছেন, বিবাহিত স্ত্রী প্রভার থেকেও বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এর প্রতিদানে তাঁরই চোখের সামনে সীমা আর জার্মান সাহেব ফিলিপের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি সিংজীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। সীমার চোখ তাঁকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ওর জীবন বা আচরণের ক্ষেত্রে কারো হস্তক্ষেপ ও মানবে না। সীমার প্রতি দায়িত্ববোধ পালনে সিংজী কোন রকম ত্রুটি করেন নি। রাউরকেলাতে নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি চাকর-বাকর টাকা-পয়সা, কোনো অভাব রাখেন নি। কারণ একদিন সামান্য নর্তকী ও অভিনেত্রীকে তিনি কটক থেকে তাঁর দায়িত্বে একেবারে নিয়ে চলে এসেছিলেন। প্রথম দর্শনে সীমার যে দেহলাবণ্য সিংজীর রক্তের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়েছিল, তা ক্রমে তীব্র সুখের মধ্য দিয়ে গভীরে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে, যার নাম মহব্বত। সীমার সঙ্গে দুবছরেরও ওপর একসঙ্গে সময় কাটিয়েও তিনি বুঝতে পারেন নি ঠিক কবে এই বিষক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সীমাকে নিয়ে তিনি থলকোবাদ বাংলোতেও এসেছিলেন। সুতরাং এই বাংলোতে আসার পর সীমার স্মৃতি যে সিংজীকে প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুল ও ব্যথাভারাক্রান্ত করে তুলবে, তা স্বাভাবিক। লেখকের মনে হয়েছে, অকপটে যে প্রগাঢ় প্রেমলীলা সিংজী ব্যক্ত করেছেন, এবং ঘটনাক্রমে সেই প্রেমিকাকেই হারিয়েছেন, তারপরে আবার সেই স্থানে এসে রাত্রি বাস করার মতো প্রাণের শক্তি হয়তো তাঁরই আছে। সিংজী যেন একটি পত্রপল্লবে ছাওয়া বিশাল মহীরুহ, কিন্তু তার ভিতরে ক্ষয়ের আক্রমণে শূন্যতা প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে।

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ক্ষয় ধরেছে। আপাত দৃষ্টিতে যে লোকটাকে দাম্ভিক, মদমত্ত, ক্ষমতাবান, ধনী বলে মনে হয়, তাঁর নিজের ভাষায় বলতে হয়, তিনি যেন মাতৃস্তন বিচ্যুত শিশু। সীমার প্রতি তাঁর আকর্ষণের তুলনা দিতে গিয়ে, এই কথাই বলেছিলেন সিংজী। সীমা খবর পেয়েছে, থলকোবাদের বনবাংলোয় সিংজী তাঁর রাইটার সাহেবকে নিয়ে উঠেছেন। তাই নিজে থেকেই ফিলিপ এবং সীমা বাংলোতে আসার নিমন্ত্রণ চেয়ে নিয়েছে। লেখক সিংজীর কাছে পূর্বেই শুনেছেন সীমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, তবু কেন যেন তাঁর বারে বারেই মনে হয়, সীমা যখন সিংজীকে ছেড়েই গিয়েছে, তবে আর এই সব যোগাযোগের প্রয়োজন কী? যদিও সিংজী অতিথি সৎকারের সব রকম ব্যবস্থাই করেছেন, অবশ্য সেটা তাঁর চরিত্রানুগই বটে।

অরণ্য পরিভ্রমণের সপ্তম দিনের সকালে অর্থাৎ লেখকরা পৌঁছানোর পরের দিন সীমা আর ফিলিপ যথারীতি সাদা রংয়ের একটি বড় বিদেশী গাড়িতে করে এসেছে। সিংজীর ভাষায়, সীমা দাস হলো স্বর্বেশ্যা ঊর্বশী। কথাটা যে একটুও বাড়িয়ে বলেন নি, তা প্রথম দর্শনেই লেখক অনুভব করেন। সীমা নিজে থেকেই লেখকের সঙ্গে পরিচয় পর্বটা সেরে নেয়, সে যে নামের আগে মিস মিসেস যোগ করা পছন্দ করে না, তাও অকপটে জানিয়ে দেয়। যে সীমাকে নিয়ে, সিংজীর এক দীর্ঘ সুখকর সময় কেটেছে, সেই এখন জার্মান যুবক ফিলিপের হস্তগত। যদিও এর জন্য সীমাকে একটুও বিরক্ত বা আড়ষ্ট দেখায় না। লেখক আশ্চর্য এই ভেবে, সিংজীও স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছেন এই দুজনের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তি একটুও না বদলে।

সকালের জল খাবার পর্ব মিটে গেলে সিংজী-সীমা-ফিলিপের আড্ডা থেকে অনুমতি নিয়ে লেখক, বনবাংলোর কাছাকাছি চারপাশটা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। পথে প্রথমেই সাক্ষাৎ হয় বিসোয়ারি, সুইয়ার সঙ্গে। যারা বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারা দুজনেই লেখকের কাছে সিগারেট পেয়ে ভীষণ খুশি, কিন্তু ধন্ধে পড়েছে সীমা-সিংজী-ফিলিপের সম্পর্ক নিয়ে। লেখক তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেন যে, সীমা সিংজীর স্ত্রী নয়, ওদের যে মহব্বত ছিল, এখন আর নেই, এখন গোরা সাহেবের সঙ্গে ওর মহব্বত।

লেখকের একটি রচনাগ্রন্থ, চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করে চলচ্চিত্রায়িত হলে তাকে কেন্দ্র করে ওড়িষ্যাবাসীদের ধারণা হয়েছিল লেখক নাকি তাঁদেরকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন।

এই ব্যাপারে সীমা দাসের সঙ্গে লেখকের কথাবার্তা বা সমালোচনা চলতে থাকে। লেখক জানান— ''... ভারতের কোনো প্রদেশের লোক নিয়েই আমি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারি না, করিও নি। আমার দুর্ভাগ্য, উড়িষ্যাবাসী অনেকের মনে হয়েছে, আমি তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছি। আমি আদৌ তা করিনি।"[১১৭]

লেখকের সঙ্গে সীমা দাসের আলোচনা চলাকালীন সিংজীর প্রস্তাবে সবাই মিলে জীপে করে একটু বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তৈরি হন। গাড়ির চালক স্বয়ং সিংজী। বনের নিবিড় স্থলে চড়াই-উৎরাই পথ ভেঙে কিছুটা যেন সুপরিকল্পিত ভাবেই সুনিবিড় ঝিঁ ঝিঁ ডাকা তমসাচ্ছন্ন লাকরা বনে গিয়ে সিংজী জীপ থামিয়ে দেন। লাকরা বন, যাকে মুণ্ডা ভাষায় বলে, বাঘের বন। এমন গভীর ভীতিকর স্থানে এসে, সীমা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। লেখক যেন অন্ধকার গভীর বনে, আরেক বনকে আবিষ্কার করেন। সারেণ্ডা ফরেস্টের অচেনা রূপে তিনি বিস্মিত হন।

অভাবনীয় সুন্দর অরণ্যও যে কোথাও কোথাও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তারই একটা পর্যবেক্ষণী দিককে সিংজী যেন দেখিয়ে দিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সারেণ্ডা বনের এ এক অন্য চেহারা। সূর্যালোক এখানে কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারে না। ঢালু পাথুরে সরু পথ ভেজা। যে কোনো মুহূর্তেই চাকা পিছলে পড়তে পারে। লেখক আশ্চর্য হন এমন অন্ধকার প্রায় গভীর বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক না শুনতে পেয়ে। যা খুবই অস্বাভাবিক।

ফিরে এসে লেখক ছোট নাগরার তৃপ্তিকে সঙ্গে নিয়ে বনের নিবিড় সান্নিধ্যে কিছু স্মৃতি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে কিছু সময় কেটে যায়। অষ্টম দিনের সন্ধ্যায় প্রেমের বনের পরিণতির লগ্ন ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। এই সন্ধ্যায় সিংজী স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়ে নাচ-গানের ব্যবস্থা করান। মাদলের তালে নাচ গানের পাশাপাশি চলতে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাঁড়িয়া পান। থলকোবাদের বনবাংলোর আঙিনায় শুরু হয়ে যায় আদিবাসী নরনারীদের আদিম উদ্দাম নৃত্য। বারো থেকে তিরিশ বছরের মেয়ে এবং পুরুষেরা সবাই একসঙ্গে নাচতে থাকে। সিংজী সীমা-ফিলিপ তিনজনেই প্রচুর সুরাপান করেছে। আবার নাচ শুরু হতে বারান্দার একটু দূরে অন্ধকারে বসে সিংজী সুরা পান করতে করতে নিজের মনেই বিড় বিড় করতে থাকেন। একসময় দর্শকাসনে বসে থাকা লেখক ও তৃপ্তি দেখলেন যে, ঝকঝকে সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা সিংজী চত্বরে নেমে গেলেন। চত্বরে তখনও চলতে থাকে মদমও নাচের

উৎসব। মাদলের উদ্দাম তাল, পাহাড়ে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। সারা চত্বরে মেয়ে-পুরুষের ছায়া ও মূর্তি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে; ধুলো প্রচুর পরিমানে উড়ছে। কম করে একশো নারী পুরুষ নাচছে। তার মধ্যে সিংজী যেন হঠাৎ হারিয়ে যান। লেখক সিংজীকে দেখবার জন্য, মাচার দিকে ফিরতেই হঠাৎ এক মুহূর্তে মদমও উৎসবের সমস্ত শব্দকে ভেদ করে একটি নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যায়। সেই আর্তনাদ যেন চত্বর থেকে ধ্বনিত হয়ে সহসা বহু দূরের খাদে নেমে যায়। পর মুহূর্তেই পুরুষ স্বরের চিৎকার শোনা গেল, 'স্টপ! স্টপ! সীমা! সীমা!' লেখক দেখতে পেলেন, ফিলিপ ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করছে আর সীমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। সিংজী ভিড় থেকে বেরিয়ে বারান্দার দিকে আসছেন। তৃপ্তি ভয়ে তখনো কাঁপছে। আশ্চর্যের বিষয়, মদমও নাচের উৎসব উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হতে থাকে। ফিলিপ ছুটে এসে চিৎকার করে সিংজীকে জিজ্ঞেস করে সীমা কোথায়? কার আর্তনাদ? মদ্য পানরত সিংজী বলেন তিনি জানেন না। ফিলিপ আবার সিংজীকে বলে যে সীমার আর্তনাদ শুনেছে। সিংজী শুধু গম্ভীর স্বরে বলেন তিনি শোনেন নি। এরপরেই ফিলিপ এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে নাচের আসরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে হিন্দিতে বলে ওঠে—

> ''বন্ধ করো, মেমসাব্ কো মারডালা। বন্ধকর নাচা গানা! ফিলিপের পাগলের মতো ব্যবহারে, নাচগান থেমে গেল।... প্রায় মধ্য রাত্রে সীমার মৃতদেহ নিয়ে একদল মেয়ে পুরুষের সঙ্গে ফিলিপসহ সিংজী তাঁর থ্রি-জিরো-থ্রি রাইফেল নিয়ে ফিরে এলেন। রক্তাক্ত সীমা, মর্তের উর্বশী, যার গলার আর তলপেটের কাছ দিয়ে ভেদ করে গিয়েছে, শুকনো ভাঙা গাছের তীক্ষ্ণাগ্র ডাল। আমার কানে বাজছে, সিংজীর কণ্ঠে পরশু রাত্রে শেক্সপীয়রের রচনার আবৃত্তি—পুট আউট দ্য লাইট, অ্যাণ্ড পুট আউট দ্য লাইট।''[১১৮]

শোকসন্তপ্ত অবস্থায় সীমার মৃতদেহের পাশে বসেই সিংজী ও ফিলিপের রাত্রি কাটে। ভোর পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে কেবল মদ্য পান করেন। সিংজী পূর্বেই বলেছিলেন, জীবনে দুটি জিনিস, প্রেম ও স্নেহের কাছে তিনি তাঁর সব বিলিয়ে দিতে পারেন। তাই প্রেমের জন্যই যেন নিষ্ঠুর হন্তারক হয়ে এই ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। সিংজী লেখকের কাঁধে হাত রেখে

বলেন,— ''রাইটার সাহেব, এই বন আমার প্রেম। এই বনেই তার অস্তিত্ব শেষ। শেষ কথা হলো, 'ইট ইজ টুউ লেট! আবার সেই ওথেলো! ডেসডিমোনাকে হত্যার মুহূর্তের উক্তি। কিন্তু লোকটি আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন, শ্রদ্ধা আর প্রেমের মধ্যে।''[১১৯] নবম দিনের সকালে সিংজী জানালেন পুলিশ না আসা পর্যন্ত তিনি সীমার মৃতদেহ নিয়ে বাংলোতেই থাকবেন। সকালের প্রথম রোদে, ছোট নাগরায় তৃপ্তির কোয়ার্টারের সামনে ফিলিপের গাড়ি এসে থামলো। তৃপ্তির সঙ্গে লেখকও নিজে নামলেন। তৃপ্তির চোখে জল, সে কথা বলতে পারছে না। লেখক এই বলে বিদায় নিলেন সিংজীর মতো মনে করেন এই বন তাঁর প্রেম। তৃপ্তির প্রেমকে লেখক নাগরিক-বৃত্তির আবরণ দিয়ে, প্রেমের বনের অধরা নায়িকায় পরিণত করলেন। লেখক গাড়িতে উঠে বসলেন। ফিলিপ গাড়ি চালিয়ে দিল। পিছনে রক্তিম ধূলা উড়ছে।

প্রায় ন'দিনের বন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে লেখকের তিনটি অরণ্য কেন্দ্রিক গ্রন্থ, যথাক্রমে— 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন' -এর কাহিনি এভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। অরণ্যের চিরন্তন রূপের সঙ্গে বনাশ্রয়ী নারী-পুরুষকে একাত্ম করে লেখক তাঁর বনভ্রমণের আঙ্গিকে নিজের বিচিত্র পিপাসাকে অনুসন্ধান করেছেন। প্রকৃতির পটভূমিতে তিনি মানুষকে দেখেছেন, যেন মানুষই তাঁর কাছে মুখ্য, প্রকৃতি নয়। আর তাই, মানুষকে নতুন পটে আবিষ্কার করতেই তাঁর পটান্তরে গমন। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক ভাবেই লিখেছেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' সম্পর্কে বলেছেন— ''আরণ্যক উপন্যাস। অবশ্যই উপন্যাস। এই কারণে 'আরণ্যক' উপন্যাস যে, এখানে অরণ্যপট যত আমাদের অভিভূত করুক লেখকের লক্ষ ছিল পটবিধৃত মানুষ।''[১২০] কালকূটেরও এই অরণ্য ভ্রমণে প্রধানতম লক্ষ্য ছিল পটবিধৃত মানুষ।

গ. পুরাণের জগতে মানস ভ্রমণ :

পৌরাণিক চরিত্র চিত্রণে কালকূটের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। কালকূটের ভাষায় তাঁর এবারের ভ্রমণটা ইতিবৃত্তের ঝরা পাতার পথে। তাঁর নিবিড় পদক্ষেপে প্রাচীন ভারতের জাতীয় ইতিবৃত্তের গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ ধ্যান ধারণার ওপর আধুনিক দৃষ্টির আলোকপাত ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণকে নিয়ে তাঁর প্রথম অনুসন্ধান দেখা যায় ১৯৭৭ সালে লেখা 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসের মুখবন্ধে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একালের

ভাবনাঋদ্ধ একটি কবিতার মধ্য দিয়ে। এর পরবর্তী ক্রমান্বয়ভাবে এসেছে—'বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে' (১৯৭৮), 'শাম্ব' (১৯৭৮), 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮৪), 'প্রাচেতস' (১৯৮৪), 'পৃথা' (১৯৮৬) এবং 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭)। কালকূটের আরেকটি গ্রন্থ ঠিক মিথ না হলেও, ভাবরূপে খানিকটা এদের সঙ্গেই তুলনীয়, তাঁর চৈতন্য-ট্রিলজি--- 'প্রেম নিত্য', 'অনিত্য-সংসার'; এবং 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত'—এই তিনটিকেই নিয়ে শিরোনাম 'জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭)। তবে এখানে উল্লেখ্য যে কালকূটের 'শাম্ব' গ্রন্থটি আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তাঁর পৌরাণিক মিথ সম্বলিত উপন্যাসগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমনকি তা শুধু পাঠক মনেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বুদ্ধিজীবী মহলেও রীতিমতো সাড়া ফেলেছিল। কালকূটের পুরাণ নির্ভর সমস্ত কাহিনিগুলো ধর্ম-সংস্কার-রহিত, এটি তাঁর পুরাণ চর্চার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত তিনি প্রাচীন কাহিনির কাঠামোর ওপর আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনাকে ফলপ্রসূ করেছেন। লেখক তাঁর পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চার একটি মাধ্যম হিসেবে মিথ তথা পুরাণবৃত্তকে অবলম্বন করেছিলেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিবর্তনের সামগ্রিক উপলব্ধিকে পুঁজি করে তিনি পুরাণ কাহিনিকে অন্যতর মাত্রা দান করতে চেয়েছেন। পুরাণ-কাহিনির প্রতীকে শ্রেণি বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থার চিরকালীন শোষণ এবং আত্মদানের পরস্পর বিপরীত প্রবণতাকে ব্যঞ্জিত করে তিনি সমাজবোধির নবমূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন। মিথ প্রসঙ্গকে নিয়ে মৌলিক চিন্তার পাশাপাশি তিনি মিথের অন্তর্বর্তী তত্ত্বের অন্বেষণও করেছেন। এর প্রকাশ—'বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে' গ্রন্থে খাজুরাহোর মন্দির ভাস্কর্যে সুন্দরের সত্যকে খোঁজার মধ্যে এবং 'শাম্ব' ও 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' নামক গ্রন্থ দুটিতে দেখা যায়। কাহিনি এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যানকে একত্র করার যে প্রয়াস তা লেখকের মৌলিকতার প্রকাশ করে। পল্লব সেনগুপ্তের ভাষায়—

> ''বুদ্ধদেবের মতন ইনটেলেকচ্যুয়ালিজমের খ্যাতি তাঁর নেই ঠিকই; কিন্তু শিল্পদক্ষতা এবং সুপ্রচুর অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে সেই 'ঘাটতি'-র পরিপূরণ হয়ে গেছে নিঃসন্দেহেই। এক ধরণের দার্শনিকতাও তার মধ্যে ব্যঞ্জিত।... প্রচলিত অর্থে ইনটেলেকচ্যুয়ালিজম বলতে অবশ্য যা আমরা বুঝি, সমরেশের লেখায় তার ব্যাপক প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু পাণ্ডিত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির

সঙ্গে সমার্থক বলে না গণ্য করলে, তাঁর এই সব লেখার মধ্যে বুদ্ধির এক দীপ্তিমান আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় যে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনের অন্বেষাকে পুরাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই সেখানে সমরেশ কলম ধরেছেন। কখনো তা বৈদগ্ধ্যের গোত্রভুক্তও হয়েছে।"[১২১]

শাম্ব, প্রাচেতস, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, পৃথা এবং অন্তিম প্রণয়,—এই পাঁচটি উপন্যাসই লেখকের পুরাণ চেতনা বা বলা চলে পুরাণের সঙ্কেতে স্বদেশ ও স্বসমাজের মানুষের সংগ্রামী চরিত্রের স্বরূপ অন্বেষণ করা। এবং ঠিক এইরকম পাঁচটি চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখক পৌরাণিক চালচিত্রের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পাঁচটি কাহিনি প্রদান করেছেন। যেখানে আমরা জানতে পারি ইক্ষবাকু বংশীয় রাজবংশের ইতিহাস, নারদ বংশীয় মুনিদের কার্যকলাপ এবং কৃষ্ণ বলরাম কাহিনি সম্বলিত ভারত কথা। এছাড়াও থাকে ভূতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের কয়েকটি ঝলক এবং পুরাণ প্রেক্ষাপটে বাস্তব ভারত ইতিহাসের সংকেত সূত্র। এই সমস্ত উপন্যাসে আরেকটি দিক বিশেষ দিক হলো লেখক এখানে শুধুমাত্র কাহিনি শোনাননি, বরং তাঁর লেখনী ঠিক মনোযোগী গবেষকের মতো, পুরাণের ধূলি ধূসরিত সংকেতের তাৎপর্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের রূপরেখাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পাঠকের সামনে। লেখক পুরাণ ইতিবৃত্তের অলৌকিকতার ধারা থেকে অনুমানের দ্বারা সত্য সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য—''ভারত কাহিনী, ভারতেরই বৈদিক অথবা, প্রাক-বৈদিক যুগের ভারতীয় ইতিহাস।"[১২২]

ইউরোপীয় গবেষকদের অনুসরণে কালকূট তাঁর আলোচ্য পাঁচটি উপন্যাসের যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাকে 'ইতিবৃত্তের প্রচ্ছন্ন সংকেত' বলে মনে করেছেন। গবেষক স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের ভাষায়—

''... সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক—এই দ্বৈতচর্চার মাধ্যমে কালকূট তাঁর পাঠককে ইতিহাস ও সাহিত্যের সেই গোধূলি সন্ধিতে নিয়ে যেতে চান, যেখানে সাহিত্য এবং ইতিহাস উভয়েই তাদের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য লেখকের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে। আর সে উদ্দেশ্য অবশ্যই

মানবের চিরন্তন রূপ উদ্‌ঘাটন। এও হয়তো তাঁর 'ভারত-দর্শন' এরই আর একটি সূত্র! পুরাণের ধূমল পাতায় এইভাবে তিনি তাঁর দেশের ঐতিহ্যকে তিনি অন্বেষণ করেন।... সেই অন্বেষণও কয়েকটি মানুষের চরিত্র অবেক্ষণের দ্বারাই। এই অবেক্ষণেই তিনি দেখাতে চান তাঁর চরিত্রগুলির আত্মোপলব্ধি তথা 'হয়ে ওঠা'-র ইতিহাস।"[১২৩]

এই ইতিহাসেই হলো কালকূটের প্রধান অন্বেষণ। মানুষ অনেক তপস্যায়, যন্ত্রণায়, সংগ্রামে, নানান অভিজ্ঞতায় জীবনের সত্যগুলিকে অনুভব করতে করতে এগিয়ে যায় পূর্ণতার পথে। ঈশ্বর লাভের সেই তপস্যা মূলত মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকেই লক্ষ্য করে। পুরাণে যাকে 'দিবি আরোহণ' বলে তা কালকূটের ভাষায়—

"দিবি আরোহণ মানুষেরই দেবত্ব লাভের কথা। উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার আশ্চর্য সূত্র হলো, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হন, তারপরে তিনি দেবতা হন, তারপরে তাঁকে জ্যোতিষ্করূপে কল্পনা করা হয়। যেমন ইন্দ্র একাধিক এবং সকল ইন্দ্রই প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে দেবতা তারপরে সূর্য।"[১২৪]

শাম্ব : (১৯৭৮)

১৩৮৪ সালের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ' থেকে গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৮৫ সালে এবং বইটি ১৯৮০ সালে আকাদেমি পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের অনুলিপি :

"শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়

শ্রীচরণেষু

সংস্কৃত মহাসিন্ধুর অকূলে বসে এই সামান্য বিন্দুকে সাহিত্যে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। আপনার মত সংস্কৃত সিন্ধু বিশারদ থাকতে এই কাজ আমার মনকে প্রতি মুহূর্তে

সঙ্কুচিত করছে। তথাপি আমার এ সামান্য রচনা আপনার পাদস্পর্শে ধন্য হোক—এই প্রার্থনা।"[১২৫]

এবং গ্রন্থের সূচনাতে লেখক একটি ভূমিকা সংযোজন করেছিলেন। কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হলো—

> ''শাম্ব কাহিনী, বিশেষত তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ, এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্বকে ও আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রভাবশালী, ত্যাগী, 'বিশ্বাসী' উজ্জ্বলতম ব্যক্তি রূপে দেখেছি।... যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন। শাম্ব আমার কাছে এক সংগ্রামী ব্যক্তি, বিশ্বাস এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি, দেখতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।"[১২৬]

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' কথাটার খেই ধরে কালকূট বলতে চেয়েছেন 'ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে'। এর সঙ্গে সেই কলিটাই তাই ফিরে আসে বারে বারে, মন চলো যাই ভ্রমণে। কিন্তু কোন্ ভুবনে। কালকূটের ভাষায় অমন দূর দূরান্তরের ভ্রমণে ঠিক নয়। দশজনকে নিয়ে ঘর করতে হয় তাই হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠা 'মন চল যাই ভ্রমণে। কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' কৃষ্ণ হলো প্রতীক, এক অরূপের ঠাঁই। তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, নগরপুরী জনপদের কোন ঠিক-ঠিকানা বলা নেই। তাই ত্রিভুবনের কোন ভুবনে যাবেন তিনি। এই ত্রিভুবনের সংজ্ঞাটা একটু ভিন্ন রকমের কারণ স্বর্গ-মত্য-পাতাল, ভ্রমণের এই ত্রিভুবন এবার তাঁকে ডাক দিয়েছে। মনে মনে তিনি যাত্রা করেছেন পুরাণে উল্লিখিত দ্বারকা নগরীতে বাসুদেবের অঙ্গণে। কিন্তু লেখক যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেছেন, সেখানে বাসুদেব হলেন একটি পার্শ্ব চরিত্র মাত্র।

দুঃখ চিরন্তন জেনেও মানুষ সব সময় সুখসন্ধানী। দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষ কীভাবে

অমৃতের সন্ধানে রত, তার পরিচয় অনুসন্ধানেই কালকূটের লেখনী সবসময় সক্রিয় থেকেছে। আর এই একটি কারণেই 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র সঙ্গে 'শাম্ব'-এক হয়ে যায়। দুঃখময় জীবনকে স্বীকার করে নিয়েই কালকূট কখনো বাস্তব জগতের বিচিত্র মানুষের জীবনের অমৃতকামী প্রত্যয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন কখনো বা পৌরাণিক জগতের বিস্তৃত অতীত ক্ষেত্র থেকে অমৃত সন্ধানী পরাক্রমশালী মহান ব্যক্তিত্বদের সংগ্রামময় জীবনকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে স্থানিক ভ্রমণের বদলে লেখক মানস ভ্রমণ করেছেন। অবশ্য এ জন্য লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে শাম্ব লেখার পূর্বেই তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। ফিরে আসার পরে 'দেশ' -এর শারদ সংখ্যায় লেখার চাপ ছিল, ফলে তিনি 'মহাকালের রথের ঘোড়া' লিখে ফেললেন। কিন্তু তা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। অতএব একেই শারীরিক অসুস্থতা এবং 'মহাকাল রথের ঘোড়া'-র জন্য মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হওয়া, এসবই যেন সমরেশকে আবার কালকূট অভিমুখী করে তুলেছিল। ফলে সেদিক থেকে দেখলে ১৯৭৬ এর শারদীয় 'দেশ'-এ 'শাম্ব'-এর মধ্যে দিয়ে কালকূটের মানসযাত্রা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শাম্ব রচনার মূল প্রেরণা বা বিভিন্ন বিষয় জানার ব্যাপারে কালকূটের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র উদিত বসু জানান যে—''শাম্ব-র ক্ষেত্রে তাঁর মূল সহায়ক ছিলেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তও তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেন...।''[১২৭] তবে পুরাণের প্রেক্ষাপটকে সম্বল করে তিনি পাঠককে এখানে শুধুমাত্র কাহিনি শোনাতে বসেন নি। বরং বলা চলে গবেষণার একনিষ্ঠ ছাত্রের মতো তিনি এই প্রেক্ষাপটে ভারত ইতিহাসের ধূলিধূসর পথের অনেক সূত্রকে স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন আপাত অলৌকিক ঘটনার ভেতরে কীভাবে ইতিবৃত্তের প্রচ্ছন্ন ধারা নিহিত থাকে। মানুষের 'দিবি আরোহণে'র মধ্য দিয়ে দেবত্ব লাভের ঘটনাকে পুরাণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে কালকূট উপস্থিত করেছেন। এছাড়া রাম-কৃষ্ণ প্রমুখের কালনির্ণয়ের মাধ্যমে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অবস্থান চিহ্নিত করে তাঁর বিশ্বাস নির্ভর বর্ণনা দ্বারা পাঠকের কল্পনা শক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছেন। 'দিবি আরোহনের' বিষয়টি তাঁর লেখায় মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে—

> ''যেমন ইন্দ্র একাধিক এবং সকল ইন্দ্রই প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে দেবতা তারপরে সূর্য। দিবি আরোহণের এই সূত্র না মানলে ঋক্‌বেদের

ইন্দ্র বিষয়ক সমস্ত সূত্রগুলোর সরল অর্থ পাওয়া যাবে না। মানুষ, দেবতা আর সূর্য, এই তিন রকমেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ ঋক্‌বেদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। ধ্রুব মানুষ, ধ্রুবই আবার জ্যোতিষ্ক। সুক্তগুলোকে যিনি জ্ঞান আর বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পাঠ করেন তিনিই দেবতার মনুষ্যত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম।"[১২৮]

দিবি আরোহণের সত্য জানার পর লেখক মনে করেন পাঠকের পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। এটা হলো মানুষেরই দেবত্বলাভের কথা। উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার আশ্চর্য সূত্র হলো, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজা পায়, তারপর তিনি দেবতা হন, এবং এর পরে তাঁকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়। মানব সভ্যতার ইতিবৃত্তকে পুরাণ ধরে রাখে, পুরাণের ইতিবৃত্তীয় সংকেত ও ইঙ্গিতগুলোকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন কালকূট। তাঁর বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য—

"প্রাচীন ভারতীয়দেরও নানান বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে। আমি একজন সূত হিসাবে দেখলুম, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকে। পুরাণ তাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, কিন্তু আমি যদি কেবলমাত্র ইতিবৃত্ত বলি, তা হলে তারা রক্ষা করবে না। অতএব আমি বললাম, পুরাণ ধর্মপুস্তক। এই পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করা, লিখে দান করা, পাঠ করে অপরকে শোনানোর মতো পুণ্য আর কিছু নেই। সেই জন্যই পুরাণ এখানো বর্তমান আছে।"[১২৯]

পুরাণের অলৌকিক কাহিনি ধারা থেকে কালকূট সত্যসন্ধানের চেষ্টা করে গেছেন। গবেষক স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের একটি অনুমান এখানে বলা যায়, যে—

"আমাদের মনে হয় যে, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক—এই দ্বৈতচর্চার মাধ্যমে কালকূট তাঁর পাঠককে ইতিহাস ও সাহিত্যের সেই গোধূলিসন্ধিতে নিয়ে যেতে চান, যেখানে সাহিত্য এবং ইতিহাস উভয়েই তাদের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য, লেখকের এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে।

আর সে উদ্দেশ্য অবশ্যই মানবের চিরন্তন রূপ উদ্‌ঘাটন। এও হয়তো তাঁর 'ভারত দর্শন' -এরই আর একটি সূত্র!"[১৩০]

মূলত এই ভাবেই পুরাণের পাতায় তিনি তাঁর দেশের ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করে ফিরেছেন। তিনি চরিত্রগুলির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন তাদের আত্মোপলব্ধি তথা হয়ে ওঠার ইতিহাস। অনেক তপস্যায়, যন্ত্রণায়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিষ্ঠুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ পূর্ণতার পথে পৌঁছায়। সেই মহান পূর্ণতার পথে মানুষের নিরন্তর পথ চলাকেই কালকূট অন্বেষণ করে ফিরেছেন। শম্ভুনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—

"শাম্বের বসতভূমির অনুসন্ধানে কালকূট জাতীয় ইতিবৃত্তের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করেছেন তা, সত্যই গতানুগতিক পুরাণ চিন্তার উর্ধ্বে এক অভিনব সমীক্ষা। পুরাণের অতি প্রাকৃতবাদকে সযত্নে পরিহার করে, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞায় সমুজ্জ্বল একটি চরিত্রকে স্থাপনা করার প্রয়াসের মধ্যে কালকূটের কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুবাদী-নিরিখের অর্ন্তবর্তী এক বিরল প্রতিভার প্রতিভাস বলা যেতে পারে।"[১৩১]

উদ্ধৃত বক্তব্যের যথার্থতা মেনে নিয়ে বলা যায়, শাম্ব হলেন কালকূটের সেই অন্বিষ্ট নায়ক যাকে পুরাণের আকর থেকে তুলে এনে নিজের মনের রঙে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। দ্বারকাধীপতি কৃষ্ণের পুত্র হলেন শাম্ব কিন্তু মূল মহাভারতে এই চরিত্রটি পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেখা যায়। এই নগণ্য চরিত্রকেই কালকূট তাঁর কাহিনির নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। মহাভারতের মৌষল পর্বে শাম্বকে দেখা যায়। যেখানে তিনি যাদববংশীয় একদল দুর্বিনীত যুবকের সঙ্গে গর্ভবতী নারীর ছদ্মবেশে দ্বারকায় আসা কশ্যপ, দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ মুনিদের সঙ্গে রসিকতা করেন। পেটের সঙ্গে মুষল (লোহার কড়াই) বেঁধে গর্ভবতী সাজানোর ফলে ক্রুদ্ধ মুনিরা অভিশাপ দেন, তিনি যেন মুষলই প্রসব করেন। ঘটনা ঘটেও সেইমত, ঐ মুষলকে কেন্দ্র করে যদুবংশ ধ্বংস হয় ও স্বয়ং কৃষ্ণেরও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু পরিচিত এই কাহিনিকে না নিয়ে সেই স্বল্প পরিচিত কাহিনিকে উপাদান হিসেবে নিলেন যেখানে তিনি কয়েকজন বিমাতার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হচ্ছেন। তবে কালকূট এখানে বিমাতার পরিবর্তে কৃষ্ণের বৃন্দাবন সহচরী গোপিনীদের সঙ্গে শাম্বের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

কাহিনির সূত্রপাত ঘটে মহর্ষি নারদের দ্বারকাপুরীতে আগমনকে কেন্দ্র করে। মহর্ষি কৃষ্ণ অঙ্গনে আসা মাত্র কৃষ্ণ এবং বৃষ্ণিগণ তাঁকে যথাযোগ্য সমাদরও প্রণাম জানান। মহর্ষি তাঁদের আচরণে সত্যি খুব খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি চোখে একটি জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে যে, অপরূপ রূপবান কৃষ্ণপুত্র শাম্ব তাঁর সহচরীবৃন্দকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তাঁকে একবারের বেশি ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না। শাম্বর আচরণ, আলাপ প্রভৃতি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও মহর্ষির কোপে তাঁকে পড়তেই হলো। বিচক্ষণ, কুটিল নারদ শাম্বকে শিক্ষা দিতে ভেবে দেখলেন, একমাত্র কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারলেই শাম্বকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে। পিতা-পুত্রের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করতে মহর্ষি ব্যবহার করলেন শাম্বর নিজের রূপের অংহকারকে। এই রূপকেই হাতিয়ার করে তিনি কৃষ্ণকে জানালেন তাঁর ষোল হাজার রমণীর সঙ্গে শাম্ব পাপ সম্পর্কে জড়িত। সেই রমণীরাও শাম্বের জন্য ব্যাকুল। শাম্ব এবং ষোল হাজার রমণী সম্বন্ধে ওঠা এই অভিযোগ কৃষ্ণ বিশ্বাস করতে না চাইলে মহর্ষি প্রমাণ দিতে চাইলেন। দ্বারকার রৈবতক পর্বতের প্রমোদ কাননে যখন কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোল সহস্র রমণীগণের সঙ্গে জলকেলিতে মগ্ন তখন কুটিল মহর্ষির ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য স্থানে শাম্বকে উপস্থিত করলেন। অসময়ে প্রমোদকাননে শাম্বকে দেখে কৃষ্ণ যথারীতি অবাক হলেন কিন্তু অন্যদিকে তাঁর ষোল সহস্র রমণীরা, রূপবান শাম্বকে দেখেই কামনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। নারদও যথাস্থানে স্বমহিমায় উপস্থিত। মর্মাহত বাসুদেব ক্রোধে ও গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের ধিক্কার ও অভিশাপ দিলেন। তারপর তাকালেন তাঁর সকলের প্রিয় রূপবান সন্তান শাম্বর দিকে। বজ্রাহত, বিস্মিত, ভীত শাম্বের অসামান্য রূপের প্রতি তাঁর দৃষ্টি জ্বলে উঠলো, পুত্রকে অভিশাপ দিলেন, এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। তাকে কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা গ্রাস করুক।

শাম্বের এই অভিশাপ প্রাপ্তিকে কালকূট ভবিতব্য বলে চিহ্নিত করেছেন, যা কিনা জন্মলগ্নেই শাম্বের ভাগ্যে লিখিত হয়েছিল। সুতরাং এটাকে মেনে নিয়েই শাম্ব আরোগ্যর পথে অগ্রসর হলেন। কৃষ্ণের উপদেশ মেনে শাম্ব প্রথমে মহর্ষির দ্বারস্থ হলেন। এই অমোঘ এবং অনিবার্য অদৃষ্ট থেকে মুক্তি পেতে। তিনি নিজে উত্তরণের পথে যাবেন, প্রয়োজন হলে এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে বা অন্তরীক্ষে সর্বত্র যেতে প্রস্তুত তিনি। জাগতিক প্রমোদের কোন কিছুতেই যেন তাঁর আর সুখ নেই। মনে মনে বললেন—''জীবন-প্রবাহ কী আশ্চর্য স্বপ্নবৎ!

যে-আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এখন এই ধারণার বশবর্তী।"[১৩২]

মহর্ষি আরোগ্যর উপায় স্বরূপ সূর্যালোকের সন্ধান দিলেন, সেই সূর্যক্ষেত্র মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে মিত্রবনে বর্তমান। অতএব প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে, রোগাক্রান্ত বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে মিত্রবনে উপস্থিত হন। শাম্ব এই অতি দুঃখের সময় শুধু মনে মনে উচ্চারণ করেছেন—

> ''তুমি অভিশপ্ত। শাপমোচনেই তোমার জীবনের মোক্ষলাভ। ভাগ্য অমোঘ। তাকে মেনে নিয়েই, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের সন্ধান করতে হয়।... বলবীর্যের দ্বারা শত্রু নিধন, মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন যেমন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তেমনি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য তাকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।"[১৩৩]

শাম্বের এই মিত্রবন গমনপথে বিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, যথা—পূজারিণীকূল-ধীবরগোষ্ঠী মাঝি-ঋষিতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে। সেগুলি হলো লেখকের সম্পূর্ণ কল্পনা। কালকূট শাম্বের সাধনাকে অতীব জটিল করে দেখানোর জন্যই এমন করে এঁকেছেন। মিত্রবনে তিনি প্রথমে কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে উপনিবেশ তৈরি করেন। শাম্বকে পথ দেখান এক দেবলোক ব্রাহ্মণবংশজ ঋষিপুরুষ, যিনি সৌর চিকিৎসা বিষয়ে শাম্বকে বিস্তৃত জানান। যাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণার কুঞ্চন ছিল না। শাম্বকে উত্তরণের পথ বলে দেন। সেই দুরুহ পথের দিশায় গ্রহরাজের বিভিন্ন তথ্য বলে দেন। দ্বাদশ নামে অভিহিত গ্রহরাজ দ্বাদশ রূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদনদীতে কীভাবে ক্রিয়াশীল, কীভাবে ব্যধি থেকে আরোগ্য সম্ভব তার পথ নির্দেশ করেন। সেই নির্দিষ্ট পথ ছয় ঋতু ধরে তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। শাম্ব এখানে শুধু নিজের উত্তরণই কামনা করেননি বরং যারা ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় পূর্ণ হয়েছিল, যাদের আরো বেশি করে হতভাগ্য মনে হয় তাদের সকলকে নিয়ে শাম্ব পাপমুক্তির পথে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। সাহিত্যিক শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর ভাষায়—

> ''বিশ্বাস আর সংগ্রামের দ্বৈত-তাৎপর্যে শাম্বর যাত্রা, সকল স্তরের রুগ্ন মানুষকে নিয়ে প্রলম্বিত হয়েছে। তাই শাম্বের উত্তরণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত শাপমুক্তির সংকেতই প্রকাশিত হয়নি, সামগ্রিকভাবে

পিছিয়ে পড়া মানুষের শাপমুক্তির প্রয়াসে সম্প্রসারিত আন্দোলন যেন ধীরে ধীরে বিপ্লবের পথ দেখিয়ে, একটা বৈপ্লবিক কর্মের সমাধা করেছে।”[১৩৪]

সমাজ সংসার থেকে বিতাড়িত মিত্রবনে বসবাসকারী কুষ্ঠরোগীর দল, যাদের জীবনে আর কিছুই শেষ নেই, যদৃচ্ছা জীবন কাটায়, অবাধ যৌনাচরণে লিপ্ত থাকে, তাদের মুক্তির উপায় কী? শাম্বর মনে হয় এই ব্যধি থেকে আরোগ্যই একমাত্র মুক্তি দেবে এবং এই মুক্তিই মৃত্যুভয় রহিত করে দেবে এক নতুন জীবনের সন্ধান। এই অটুট বিশ্বাসকে অনুভব করে সূর্যলোকের দ্বাদশস্থানে পরিভ্রমণে সকলকে সঙ্গী করতে চান। কিন্তু ব্যধিগ্রস্থ হতাশায় পরিপূর্ণ মানুষের দল শাম্বকে বিশ্বাস করতে চায়নি। ভেবেছে সবই মিথ্যা, ছলনা। শাম্ব, বোঝাতে চেষ্টা করে যার বিশ্বাস হারায় তার সবই হারিয়ে যায়। তারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বুঝিয়ে দেয় তাদের আর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। শাম্ব জানায় আসলে তার সঙ্গে এখানেই মত বিভেদ রয়েছে। যে বিশ্বাস করে পাপ যেমন তাকে বিনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে ঠিক তেমনি প্রায়শ্চিত্তেই পারে তা থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে।

শাম্বর বিশ্বাসে প্রথম উদ্বুদ্ধ হয় নীলাক্ষী। এই অস্ত্রবিহীন যুদ্ধে নীলাক্ষীই তাঁর অস্ত্রের কাজ করেছে। তার সহযোগিতায় সবাই শাম্বর সঙ্গে দ্বাদশ স্থানে যাওয়ার জন্য রাজি। শাম্ব চমৎকৃত যে তাঁর কথায় যে কাজ হয়নি বরং নীলাক্ষীর দৃঢ়তায় এক অবিশ্বাস্য আশাতীত প্রতিক্রিয়া সবার ভিতরে ঘটতে থাকে। তাঁর মনে হয় এ যেন এক অন্য নীলাক্ষী। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রমণে অতিপ্রার্থিনী রমণী যে না। এই রমণী অঘটন পটীয়সী, যার মধ্যে তেজ ও যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই তীক্ষ্ণ স্বরে সবাইকে বাধা দিয়ে বলে উঠতে পারে, ও আমাদের মতোই কুষ্ঠরোগী। ওর কথা আমাদের শোনা উচিত। ও কী বলে, আমরা শুনবো। সুতরাং নীলাক্ষীর সহযোগিতায় নানা বয়সের নরনারী সর্বসাকুল্যে সত্তরজনকে নিয়ে শাম্ব আরোগ্য কামনায় যাত্রা করেন। আবার দ্বাদশ স্থানে ও নদনদীতে স্নান করে, দ্বাদশ মাস পরে যখন তিনি আবার চন্দ্রভাগাকূলে অস্তাচলমান স্থানে ফিরে এলেন তখন তাঁকে বাদ দিয়ে মাত্র চোদ্দজন দলের মধ্যে জীবিত ছিল। সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করা সকলের পক্ষে সাধ্য ছিল না, তাই লক্ষ্যে পৌঁছেছে মাত্র কিছু সংখ্যক। রমণীদের মধ্যে নীলাক্ষী নেত্রীস্থানীয়া হয়ে উঠেছে। কামতাড়িতা এই নারী হয়ে উঠেছে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়ী, মন্দিরের অপ্সরাদের মতো তার সমস্ত দেহে রূপ ও লাবণ্যের

সঞ্চার হয়েছে, অথচ গ্রহরাজের প্রতি তদগত ভক্তিতে এক ধ্যানমগ্না পূজারিণী। অন্য সকলের মধ্যে সঙ্গী হারানোর শোক রয়েছে কিন্তু নবজীবন লাভের উদ্দীপনাও জেগেছে। সেই উদ্দীপনার মধ্যে কোনোরকম উশৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নেই। প্রত্যেকের আচরণে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়। শাম্বও এই নতুন বিবর্তনের পথে অন্তরে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। এই নবজন্মের সূচনায়, যেন একটি নতুন সংঘের স্থাপনা ঘটেছে। এসমস্তের বাইরে একটি বিশিষ্ট ঘটনা এই, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা সঙ্গমের জলে, শাম্ব একটি দারুমূর্তি পেয়েছেন, যাঁর সঙ্গে মিত্রবনের গ্রহরাজের মূর্তির আশ্চর্য সাযুজ্য বর্তমান। সেই মূর্তি প্রাপ্তিতে শাম্বর মনে এক গভীর সংকেতময় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হয় যে, জীবনের কিছুই নিরর্থক নয়, সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ নির্দেশ বর্তমান।

মিত্রবনে ফিরে আসার পর ঋষি প্রত্যেককে অর্ভ্যথনা করে শাম্বকে নিয়ে নিজের কুটিরে একান্তে গিয়ে আরো এক বিরাট পরিশ্রম সাধ্য কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। মিত্রবনে শাম্ব প্রাপ্ত গ্রহরাজ মূর্তির জন্য একটি মন্দির স্থাপন করতে বললেন, গ্রহরাজ বিগ্রহের যে মূর্তি আগে থেকেই মিত্রবনে স্থাপিত তাঁদের পূজার জন্য শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ভারতবর্ষে আনয়নের কথা বলেন। কারণ তাঁরাই একমাত্র গ্রহরাজ বিগ্রহের পূজার অধিকারী। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল তাঁরাই নির্ণয় করেন, একমাত্র গ্রহরাজই পারেন এইসব ব্যধির নিরাময় করতে। ঋষি যে পথের নির্দেশ দিলেন, সে পথ নিঃসন্দেহে খুবই দুর্গম। মিত্র বন থেকে যাত্রা করতে হবে অন্তরীক্ষে। আবার দীর্ঘ অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের কাছাকাছি কোনো স্থানের নাম শাকদ্বীপ। কিন্তু শাকদ্বীপে যাওয়ার আগে গ্রহরাজ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়কে আনতে হবে, যাঁরা মিত্রবনের থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মহান শিল্পীদের ভরণপোষণের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তার জন্য শাম্ব দ্বারকায় যেতে প্রস্তুত হন। শাম্ব অনুভব করেন যে—

> ''... ক্ষাত্রবীর্যের স্পর্ধা, প্রণয়শীলা রমণীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুখী ও বিলাসের জীবন এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতিমাত্র। তা আমাকে আকর্ষণ করে না, বিচলিত করে না। যে কল্পারম্ভের দ্বারা আমি কর্ম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছি, আমার গৌরব তা ছাড়া আর কিছু নেই।''[১৩৫]

ঋষি নির্দেশে প্রাপ্ত কল্পবৃক্ষ মূর্তিকে একটি উৎকৃষ্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে এক পক্ষকালের মধ্যে তিনি দ্বারকায় পৌঁছলেন। শাম্ব তাঁর পিতা, মাতাগণ, স্ত্রী লক্ষ্মণা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকা রমণীদের সামনেই তাঁর আসার কারণ ও আসন্ন কর্মের কথা বলেন। সকলের সম্মতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা কলেন। বাসুদেব ও মাতা জাম্ববতীর অন্তর বিদীর্ণ হলেও, শাম্বর কল্পের কথা শুনে তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না বরং সম্মান করলেন। শাম্ব আর পূর্বের বিলাসবহুল জীবনে মগ্ন রাজপুত্র নন, অতীত জীবনে আর কখনোই তিনি ফিরবেন না। লক্ষ্মণা অতি কাতর হয়ে পড়লে শাম্ব তাঁকে নানা সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বলেন—

> ''তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে কোনো সময় পঞ্চনদীর দেশে, চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে এসো। সেখানেই তোমার যদি বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাস কর। আরও শোনো লক্ষ্মণা, জীবন কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চরমান, পরিবর্তনশীল। তুমি তপোবনে গেলে, রৈবতকের এই হর্ম্যতলের বিলাসকক্ষের জীবন পাবে না। তোমার স্বামীকেও পূর্বের ন্যায় পাবে না। তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।''[১৩৬]

শাম্ব আর এক পক্ষকালের মধ্যে মিত্রবনে পৌঁছে যান এবং অষ্টমী তিথিতে সকলের সম্মতি নিয়ে পায়ে হেঁটে শাকদ্বীপ যাত্রা করেন। পঞ্চনদীর দেশের সমতলভূমি পার হয়ে, হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করে অন্তরীক্ষের পথে অতি দুর্গম গিরিশিখর ও বনভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা পথে শাম্ব তাঁর জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ইলাবৃতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে দশ ঋতুর পর শাম্ব শাকদ্বীপে পৌঁছুলেন। সেখানে মগ সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ আঠারোজন ব্রাহ্মণকে এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে মিত্রবনে স্থাপন করলেন। পরে মিত্রবনের ঋষির সঙ্গে আলোচনা করে ছয়টি মগ পরিবারকে মিত্রবনে, বারোটির মধ্যে ছয়টি মথুরার কাছে যমুনার দক্ষিণ তীরে, আরো বাকি ছয়টি পরিবারকে উদয়াচলের ওড্রদেশে প্রাচী নদীর শাখা চন্দ্রভাগা তীরে স্থাপন করেন। এই তিন স্থানে তিনটি মন্দির স্থাপন করেন।

একবছর পরে যখন তিনি মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন যে, প্রায় ছোটখাটো নগর তৈরি হয়েছে। সকলে নাম দিয়েছে 'শাম্বপুর'। তিনি কোনরকম চমৎকৃত না হয়ে বরং

দেখে সুখী হলেন যে মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই সুস্থ হয়েছে। অন্যদিকে কল্পবৃক্ষ মূর্তির নিত্য পূজাও সুষ্ঠ ভাবে পালন করা হয়। মিত্রবনের ঋষির নির্দেশ অনুযায়ী শাম্ব প্রতি চার মাসে তিন স্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন, সঙ্গে আদি চোদ্দজনও পথসঙ্গী হলেন। তিন স্থান হলো— মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয় কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লবক্ষেত্র। দ্বাদশ বৎসর মধ্যে তিনটি মন্দির পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। নীলাক্ষী উদয়াচলের মন্দিরে আজীবন বসবাসের প্রার্থনা জানায়। নীলাক্ষীর ভেতর থেকে কামনা অপসৃত হতে থাকে এবং শাম্বের প্রতি মুগ্ধতা তৈরি হয়। তার একান্ত বাসনা—

> ''আমি এই সমুদ্র ও চন্দ্রভাগা তীরের মধ্যবর্তী স্থলেই থাকতে চাই। বৃষ্ণিরত্ন, আমি আজীবন কোনাদিত্যের পূজা করবো, কিন্তু আমি নিতান্ত প্রস্তরের অপ্সরামূর্তি নই। আমি মানুষ, তুমি আমার মহামৈত্র। তোমার দর্শনের আশায় আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হবে। বৎসরান্তে একবার দেখা দেবে তো?''[১৩৭]

মিত্রবনের প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির কথা শাম্বর মনে পড়ে যায়। তিনিও নীলাক্ষিকে তাঁর অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র মনে করেন। নীলাক্ষির ইচ্ছানুসারে কোনাদিক্ষেত্রের নাম হয় মৈত্রেয়বন। তাই যে কারণে এই নামকরণ তা রক্ষা করতে শাম্ব সম্মত হন।

মহর্ষি নারদের চিহ্নিত পথে শাম্ব ব্যধিগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণদের মিত্রবনে আনয়ন করেছেন এবং তিন স্থানের তিন কালের আলোকে স্নানের ব্যবস্থা করেছেন। মহর্ষি দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলে, শাম্ব জানিয়েছেন তিনি মিত্রবনে কালপ্রিয়ক্ষেত্রে মৈত্রেয়বনে অপরূপ আনন্দে সময় অতিবাহিত করছেন। অতএব ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখ-ভোগের কোনো বাসনা তাঁর আর নেই। তিনি জেনেছেন অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, সুতরাং বর্তমান উপলব্ধ আনন্দকে তিনি ত্যাগ করতে চান না। শাম্বর এই পরিবর্তিত রূপে মহর্ষি মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাই গ্রহরাজ মূর্তিকে পূজা করে তিনি শাম্বকে শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ করে বলেছেন—''হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।''[১৩৮] শাম্বর সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। এ কী নামে মহর্ষি গ্রহরাজকে সম্বোধন করলেন? মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে জানালেন আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক নাম হল শাম্বাদিত্য। এই নামেই এখানে গ্রহরাজ পূজিত হবেন। শাম্ব তাঁর

অভিশাপ দিনেও চোখের জল ফেলেন নি কিন্তু এই মুহূর্তে মহর্ষি নারদের কথায় তিনি চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। তিনিও দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ এবং মুখে এক অনির্বচনীয় হাসি। এই ভাবেই এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাম্ব ব্যধিমুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেলেন। সম্ভবত সেই কারণেই লেখক যদুবংশনাশ কেন্দ্রিক পরিণামবাহী কাহিনি গ্রহণ করেন নি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের ভাষায়—

> ''মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের পরিবর্তে সমরেশ ভবিষ্য-সৌর-শাম্ব—এই তিনটি কম গুরুত্বপূর্ণ পুরাণকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ, পরাভব নয়, ধ্বংস নয়—এ কাহিনীতে তাঁর অভিপ্রেত হল জয় ও সৃষ্টির কথা বলা। সাধনা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে মানুষের অপরাজেয় সত্তা যে সমস্ত বিঘ্ন ও প্রতিকূলতাকে জয় করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেই, এই কাহিনীর রূপকে মানুষের সেই অপরাজেয়তার তত্ত্বটিই কালকূট এভাবে বলতে চেয়েছেন।''[১৩৯]

যথাযুক্ত এই উক্তি। লেখক এই কারণেই যেন একটি স্বল্প পরিচিত পৌরাণিক কাহিনিকে গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়ে সমকালের কুষ্ঠ গ্রস্ত, নীতিভ্রষ্ট, অভিশপ্ত, পচনশীল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'শাম্ব' (১৯৭৮) তেমনি এক মহান প্রচেষ্টা।

প্রাচেতস : (১৯৮৪)

১৯৮৩ সালে শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে 'দে'জ পাবলিশিং থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : ''যার রচনা আমার প্রেরণা, গ্রহণ করেছি গভীর তৃষ্ণায়, অথচ আপন কল্পনাকে মুক্তি দিয়েছি সেই তৃষ্ণার তৃপ্তির মধ্যেই। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।''[১৪০]

রূপনগরের পথিক কালকূট সংসার ও প্রকৃতির রূপ রসের মধ্যে যে রসিক মানুষ তারই অন্বেষণে ফেরেন। এর জন্য তিনি জাতীয় ইতিবৃত্তের পথেও পরিক্রমা করেছেন। এই মানস ভ্রমণে তাঁর অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির উত্তরণ ঘটেছে। পথই তাঁকে চিরটাকাল হাতছানি

দিয়েছে, বিষ জরজর প্রাণের জ্বালা নিয়ে তাই তাঁর অমৃতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। তাঁর বাউল বিবাগী মনের সকল সংশয় দূর হয়ে যায় যখন বৃক্ষের নীচে বসে থাকা আলখাল্লাধারী বাউলের মুখে শুনতে পান—'ও তুই যাবি কোথা/ভুলেছিস তা।/তোর কি ঠেকারে বাইরে ঠেকার/না জাননি তারে আর বার/ঝোলা রেখে বসগে হোথা।'

কালকূট এই উপন্যাসের শুরুতেই অগস্ত্য যাত্রার পথে সামিল হয়ে প্রাচেতস্ অর্থাৎ বাল্মিকীর চরিত্রের অন্বেষণ করেছেন। যিনি কিনা রামচন্দ্রের সমসাময়িক, রামায়ণের লেখক। ভ্রমণ বৃত্তান্তে অগস্ত্যকে নিয়ে টানাটানির কারণ এবার তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে যাত্রা পুরাণের ইতিবৃত্তের পথে। এবং তাঁর অন্বিষ্ট নায়ক প্রাচেতস্ এর সঠিক কাল নির্ণয় করতে অগস্ত্য মুনিকে পথে পেয়ে, যাত্রার সুলুক সন্ধান করেছেন। লেখকের কাহিনি বয়নের গুণে, চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতায়, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। পুরাণ কথিত অগস্ত্য ঋষি ছিলেন বিন্ধ্য পর্বতের গুরু। বিন্ধ্য পর্বতের অভিমান ছিল, সূর্য সুমেরু প্রদক্ষিণ করে কিন্তু তাকে নয় কেন? কিন্তু সূর্য এই প্রস্তাবে রাজি নয়। অতএব বিন্ধ্য প্রতিশোধ নিতে দেহকে এমন বৃদ্ধি করলেন যে সূর্যের পথরোধ হয়ে গেল। দেবতারা ভয় পেয়ে অগস্ত্যকে স্মরণ করলেন। তিনি গিয়ে শিষ্যের সামনে দাঁড়াতে, বিন্ধ্য নতমস্তকে গুরুকে প্রণাম করলে, অগস্ত্য বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত তিনি না ফিরে আসেন ততদিন যেন এভাবে থাকেন। অগস্ত্য আর কোনোকালেই ফিরে আসেন নি। অর্থাৎ যাত্রা হলে, প্রত্যাবর্তন হবে না। এর নাম অগস্ত্যযাত্রা। সেই দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের প্রথম দিন। সেই থেকেই ভাদ্রা মাসের প্রথম দিন আমাদের কাছেও যাত্রা নাস্তি। কালকূট এই ব্যাখ্যায় যোগ করেছেন যে আমরা জেনেছি ঐ যাত্রাটি অমঙ্গলের। তাই যাত্রা হলে আর প্রত্যাবর্তন হবে না। যে-শত্রুকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে চাই বরং মনে মনে যেন তারই এই অনস্ত্যযাত্রা আমরা কামনা করি। সে যাত্রা মৃত্যুরই যেন আর এক রূপ। এই অগস্ত্যর নামে নানা কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। লেখকের মতে অগস্ত্য এক নন একাধিক, কারণ অগস্ত্য অনেক নামেই পরিচিত। অনেক বিচিত্র আর বিভিন্ন কাজ তিনি করে গিয়েছেন। তাঁকে অযোনিজ বলা হয় অর্থাৎ কোনো নারীর গর্ভে জন্মান নি। কথিত রয়েছে আদিত্য যজ্ঞে সূর্য ও বরুণ উর্বশীকে দেখে কামাতুর হলে যজ্ঞকুম্ভে শুক্রপাত করেন এবং সেই কুম্ভে থেকে জন্ম হয় বশিষ্ঠ আর অগস্ত্যের। ভাগবতে অবশ্য অগস্ত্যকে পুলস্ত্যের পুত্র বলা হয়। আবার অন্যত্র বলা হয়ে থাকে যে ইনি কুম্ভে

জন্মেছিলেন বলে নাম কলসীসূত, কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্ভব, কুম্ভযোনি। মিত্র বরুণের পুত্র, অতএব তিনি মৈত্রাবরুণি। সমুদ্র পান করেছিলেন, তাই পীতাব্ধি। বাতাবিকে বিনাশ করেছিলেন, তাই তিনি বাতাবিদ্বিট। উর্বশীর সন্তান তাই নাম ঔর্বশীয়। মহাতেজা ছিলেন তাই তিনি আগ্নেয়। বিন্ধ্যকে নত করেছিলেন, তাই বিন্ধ্যকূট। আবার তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ, তাই তাঁর নাম মান। লেখকের ভ্রমণ পথে অগস্ত্য একা নয়, একাধিক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরিচয়ের একটা সঠিক ক্ষণ পেলে যাত্রা, সুগম হবে। সেই কারণেই প্রথম পদক্ষেপেই তাঁর কথা লেখক এনেছেন।

এই অগস্ত্য নাকি ছিলেন পুলস্ত্যের বংশধর। পুলস্ত্যকে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মানসপুত্র ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে ব্রহ্মপুরাণ পেয়েছিলেন। সেই ব্রহ্মার আদিনিবাস সম্পর্কে লেখকের মত সাইবেরিয়ার উরাল পর্বতমালায় তাঁর বাস ছিল। স্বর্গ যে স্থানের নাম, প্রাচীনে তার নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষে যখন তেত্রিশ কোটি 'দেবতা' নামে জাতির বাস ছিল তখন বাধ্য হয়েই ভারতবর্ষে মনুর নেতৃত্বে এক বিশাল দলকে বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হয়েছিলো। মনুর নামে যে মানুষ জাতি সে তার সব ঐতিহ্য বিশ্বাস রেখে এসেছিল স্বর্গে, তাই সেখানে যাবার বাসনা তার চিরকালের। এই স্বর্গের অবস্থান লেখকের মতে পূর্ব তুর্কীস্থানের দক্ষিণাঞ্চলে। ইলাবৃতবর্ষেরও একটা স্বর্গীয় প্রিয় স্থান ছিল যার নাম 'বৈকুণ্ঠ'। সাইবেরিয়ার উরাল অঞ্চলের রমণীয় স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ। ইলাবৃতবর্ষের রাজা ইন্দ্রের একটা শর্ত ছিল যে মানুষ জাতি তাঁর অধীনে থাকবে কিন্তু বেণ্ রাজা তা মানতে অস্বীকার করলেন। যার ফলস্বরূপ স্বর্গে প্রবেশের সংক্ষিপ্ত পথকে ইন্দ্র পাহাড় ধসিয়ে বন্ধ করে দেন। কিন্তু আমরা তো জানি যে জীবিতাবস্থাতেই দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গে যাত্রা করেন। সে রাস্তাটা ছিল মানস সরোবরের ধার দিয়ে, ভূতপ্রেতে ভরা রাস্তা। প্রচলিত সংস্কারে তাই স্বর্গের পথ অতি দুর্গম। মহাপ্রস্থানের সেই পথ এখন বর্তমান সিকিমের তিস্তা নদীকে সাক্ষী রেখে তারই আঁতুরঘর 'ইয়ুংথাম।'।

পুরাণকেই যখন আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন ব্রহ্মার কাছ থেকে পুলস্ত্যের ব্রহ্মপুরাণ প্রাপ্তিটা একটা বিশেষ ঘটনা। তিনি সেই পুরাণ পরাশরের হাতে তুলে দেন, পরাশর সেই ব্রহ্মপুরাণ সর্ব সাধারণে প্রচার করেন। অগস্ত্য মুনি পুলস্ত্যের পুত্র কিনা, সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। অগস্ত্যের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি চিরকাল অকৃতদার থাকবেন কিন্তু পূর্বপুরুষের মুক্তির জন্য তাঁদের আশ্বাস দিয়ে সৃষ্টি করলেন এক অতি রূপসী কন্যা। বিদর্ভরাজের

কাছে পালিতা সেই কন্যা লোপামুদ্রাকে তিনি যৌবনারম্ভ হলে বিয়ে করেন। কালকূট তাঁর আধুনিক মননের দ্বারা লোপামুদ্রার সৃষ্টি কাহিনির ব্যাখ্যা করেছেন। পুরুষ ও নারীর মিলন ব্যতীত কোন প্রাণীর জন্ম হতে পারে না। সে পাঞ্চালীই হোন কিম্বা লোপামুদ্রা। স্বয়ং অগস্ত্যকেও অযোনিজ বলা হয়। 'সীতা' -কেও বলা হয় অযোনিজ কন্যা। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন বাস্তবিকই কি তাই? তাঁর ব্যাখ্যায় পুরাণে বিশেষত অজ্ঞাতকুলশীলকে যদি নায়িকার স্থান দিতে হয়, কবি কল্পনায় তাঁকে অযোনিজ বলার অসুবিধা কোথায়। অগস্ত্য যখন লোপামুদ্রাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন বিদর্ভরাজের আপত্তি দেখা দিল কিন্তু স্বয়ং লোপামুদ্রা অগস্ত্যের বরণীয়া হতে চান। অতএব এর পরবর্তী ঘটনা স্বামীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে বসবাস, নির্জনে তপস্যা ও দাম্পত্য জীবন শুরু। লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখে অগস্ত্য সঙ্গমপ্রার্থী হলে তিনি প্রার্থনা করেন রাজকীয় বসনভূষণ ও শয্যা। সব সামগ্রীর সন্ধানে তিনি গেলেন বাতাবি দানবের ভাই ইল্বলের কাছে। যে ছিল ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী। কোনো ব্রাহ্মণ এসে খেতে চাইলে সে তার মেষরূপী ভাই বাতাবিকে কেটে রেঁধে খাওয়াতো। খাবার পরেই, বাতাবি সেই ব্রাহ্মণের পাকাশয় ভেদ করে বেরিয়ে আসতো। যার ফল ব্রাহ্মণের পঞ্চত্ব লাভ। আপাত দৃষ্টিতে গাঁজাখুরি মনে হলেও কালকূট মনে করেন এটি টোটকা জাতীয় ঔষধ। যা অগস্ত্য হজম করে ফেলে। ইল্বলকে তার সমুদয় ধনরত্ন অগস্ত্যকে দান করতে হয়। শক্তিধর ইল্বলকে হত্যা করেছিলেন। অতএব লোপামুদ্রার প্রার্থনা পূর্ণ হলে ঋতুস্নাতার সঙ্গে সঙ্গম হয়। তাদের সন্তান জন্মায় সাত বছর পরে। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে অগস্ত্যের পুত্রের নাম দেওয়া হয় ইধ্মবাহ। আবার অন্যস্থানে বলা হয় লোপামুদ্রা যে অসীম বলশালী পুত্রের জন্ম দেন, তাঁর নাম দৃঢ়স্যু। ইনিই নাকি অগস্ত্য মুনির পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেছিলেন। লেখক মহাভারতের কথা মেনে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। অগস্ত্যকে নিয়ে কালকূটের যেটা শেষ কথা তা হলো, বনবাসকালে দাশরথি রাম অগস্ত্যের আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি রামকে বৈষ্ণবধনু, অক্ষয়তুনীর এবং আরও নানারকম অস্ত্র দান করেছিলেন। রামও ছিলেন একাধিক। দাশরথি রাম যিনি কিনা দশরথের পুত্র তাঁরই অন্বেষণে এবার কালকূটের যাত্রা।

'রামায়ণ'-কে কেন্দ্র করে কালকূটের একমাত্র রচিত গ্রন্থ হলো 'প্রাচেতস'। এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন দস্যু রত্নাকর তথা প্রাচেতস, পরবর্তীতে যিনি বাল্মীকি মুনি। যিনি 'রামায়ণ' রচয়িতা। এই বাল্মীকি মুনির পূর্বজীবনের দস্যু বৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে 'কলঙ্কিতময় জীবন'

তাকেই কালকূট তাঁর গভীর দার্শনিকতায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তাই কাহিনির শুরুতে তাঁর আধুনিকমনস্ক মনের চিন্তার বিভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে। মূল কাহিনিকে যথাযথ করে তুলতে বা বলা ভালো যুক্তিসম্মত করে তুলতে অন্যান্য একাধিক পুরাণ কাহিনির অবতারণা ঘটিয়েছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তর মতে—

> ''প্রাচেতস তথা দস্যু রত্নাকরের জীবন উত্তরণের যে উপন্যাস কালকূট রচনা করেছেন তার মধ্যেও তিনি 'শাম্ব' ও 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'-র মতনই পরিণামে এক তত্ত্বজ্ঞানের সামনে উপস্থিত করেছেন পাঠককে। উপন্যাস আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রের অজস্র প্রসঙ্গ; নানা ধরণের ভাবনা ও উপলব্ধির উন্মেষও সেখানে আমরা পাই। তিনি রামায়ণ কাহিনীর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিভিন্ন ইঙ্গিতের অনুষঙ্গে রামকথার যিনি 'আদিস্রষ্টা' বলে কথিত, তাঁর জীবনসূত্রটিকে সুদৃঢ় মুঠিতে ধরেছেন কালকূট।''[১৪১]

এবারের ভ্রমণ যেহেতু ইতিবৃত্তের ঝরা পাতার পথে, তাই পথ খুঁজে খুঁজে পাঠককে নিয়ে চলেছেন। পথের দিশা খুঁজতে সেই আদি পুরুষ বৈবস্বত মুনির সন্ধান করেছেন, যিনি ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ স্বর্গ থেকে প্রথম নেমে এসেছেন। যেখানে ইন্দ্র ছিলেন রাজা। পুরাণের যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে লেখক এগিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় পূর্ব তুর্কীস্থানে দেবতা জাতির বাস ছিল এবং বর্তমান তুর্কীদের চেহারায় দেবতাদের আদল রয়ে গেছে। ইলাবৃতবর্ষের যা কিছু, তার বেশির ভাগটাই ধারণ করে আছে ভারতবর্ষ। মনুর নেতৃত্বে মানুষ জাতি হিমালয় অতিক্রম করে, বিন্ধ্যাচলের সীমানায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল। এরকম কুবের জাতি বাস করে অন্তরীক্ষে, যা কাশ্মীরের পামির উপত্যকার সন্নিকটে অবস্থিত। যারা নৃত্য ও সঙ্গীতে পারদর্শি এবং যুদ্ধ বিশারদও বটে।

শাম্ব সন্ধানে গিয়ে লেখক যে ইতিবৃত্তর কাহিনি শুনিয়েছিলেন সেই সগর রাজার গঙ্গা আনয়নের কথা এখানেও ব্যক্ত করেন। 'বাহু' নামে রাজার এটা প্রথম পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণ করেন সগর রাজার বংশধর। সগর রাজা এবং তাঁর পুত্র সমান ষাট হাজার শ্রমিক গঙ্গাকে হিমালয় থেকে নামিয়ে আনার কাজে হাত দেন। কিন্তু কপিল মুনির অভিশাপে কপিল ব্যাধিতে অর্থাৎ জণ্ডিস রোগে ষাট হাজার শ্রমিক মারা পড়েছিল।

লেখকের অভিমতে—

> ''এই কপিল মুনি কে? বর্ণ কি তাঁর কপিল? তিনি কি ব্যাধি? সেটাই সম্ভব। নিচু বাঙলার দক্ষিণে, যে পর্যন্ত মাপজোক করে সগর রাজা পৌঁছেছিলেন, সেখানে ন্যাবা—ইংরেজিতে যাকে বলে জণ্ডিস, সেই রোগেই ষাট হাজার মারা পড়েছিল। ইতিহাসে এরকম ঘটনা আমরা আরও অনেক পেয়েছি। গৌড়ের বাদশা আসাম আক্রমণ করতে গিয়ে, কেবল কালাজ্বরেই লক্ষ সৈন্য হারিয়েছিল।... এখনও দক্ষিণবঙ্গে ম্যালেরিয়া আর জণ্ডিসকে ভয় পায় সবাই। কপিল মুনি বললেই, কপিল বর্ণের কথাটা মনে আসে।''[১৪২]

সগর গঙ্গাকে আনয়ন করতে পারেননি। তাঁর ছেলে অসমঞ্জও উদ্যোগ নিয়ে পারেন নি। এঁর ছেলে অংশুমান সম্ভবত অসুস্থ ছিলেন তাই গঙ্গার খাল কাটা স্থগিত ছিল। অংশুমানের ছেলে দিলীপ খননের অভিযানে নেমেছিলেন কিন্তু পারেন নি। তাঁর বংশধর ভগীরথই সেই ইঞ্জিনীয়র যিনি গঙ্গাকে সমুদ্রে বইয়ে দেন। এবং সেই কারণেই গঙ্গা দক্ষিণের এদেশে ভাগীরথী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে গঙ্গা সাগর স্নান পুণ্য দিন হিসেবে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর কাছে উল্লেখযোগ্য। সব তীর্থ বার বার, গঙ্গা সাগর একবার যাকে আনতে পাঁচ পুরুষে সময় লেগেছিল একশো পঁচিশ বছর—কালকূট এই প্রেক্ষিতে বলেন—

> ''একে বলে প্রতিজ্ঞা। আমরা পুণ্য বলে ঐশ্বরিক শক্তিকে মানি। আসলে মানুষের কর্মই আমাদের পুণ্যধারাকে বহিয়ে দিয়ে এসেছে চিরকাল। আর সেই সব মানুষই আমাদের কল্পনায় দিবি আরোহণ করেছেন। নক্ষত্র হয়ে আকাশে আছেন চিহ্নিত হয়ে।''[১৪৩]

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ যিনি কিনা কাল নিরুপণ করে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের কোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। বৈবস্বত মনুকে প্রথম মনু বললেও আসলে আদি ও প্রথম মনু হলেন স্বায়ম্ভুব। কালকূট বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে নির্ধারণ করেছেন স্বায়ম্ভুব মনুর কাল ও কলির শুরুর মধ্যেকার ব্যবধান হলো দু'হাজার ন'শো সাত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে মাত্র ন'শো সাতাশ বছর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। কালকূটের অন্বিষ্ট যাত্রাপথ হলো ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দাশরথি রামের সময়ে। সাম্প্রতিক

পণ্ডিতবর্গ রামকাহিনিকে অনেক আধুনিক কালের ঘটনা বলে দেখিয়েছেন। মহাভারতে রাম কাহিনি আছে, এবং রাম কাহিনিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংবাদ নেই। অতএব ইক্ষ্বাকুবংশ যে পুরু বংশের তুলনায় প্রাচীন, এটা মেনে নিতে হয়। রাম কুরুবংশের আগে বর্তমান ছিলেন। রামের সময় থেকে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ের ব্যবধান সাতশো আট বছর। লেখক এই সাতশো আট বছরের ব্যবধানের মধ্যেই ভ্রমণ করতে চান। তিন রামের কথা উল্লেখ করেছেন, জামদ্যগ্নি রাম, হৈহয় বংশীয় রাম, দাশরথি রাম। জামদ্যগ্নি রাম অবতার হয়েছিলেন, এবং দাশরথি রামও অবতার হয়েছিলেন। জামদ্যগ্নি রামই পরশুরাম। তাঁর সঙ্গেও এক রাক্ষস রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সীতা ঘটিত কারণে নয়, অস্ত্রঘটিত কারণে। হৈহয় রাম নির্জীব পুরুষ ছিলেন, তাঁর অবতারত্বের কোনো কাহিনি নেই। আছে দাশরথি রামের যিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৈদিক রচনায় রাম কাহিনির বীজ পাওয়া যায়। রামায়ণ কাব্য হলেও এর পশ্চাতে সুদূর প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে। ঋক্‌বেদে রাম ও সীতার উল্লেখ আছে—

> ''ঋক্‌বেদে রামকে 'ভদ্র' (দস্রঅশ্বী) সীতাকে 'ভদ্রা' উভয়ে পাশাপাশি এগিয়ে গেলেন। পিছনে প্রেমিক (না সত্য অশ্বী/লক্ষ্মণ) চলেছে। 'সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি (দশরথ) জ্যোর্তিময় আভা নিয়ে রামকে বিদায় দিলেন।''[১৪৪]

বৌদ্ধ জাতক কাহিনিতেও রাম কথা আছে। তবে রামায়ণ বা রাম রাজত্বে কী ঘটছে তা নিয়ে লেখকের প্রয়োজন নেই। তাঁর ভ্রমণ ভিন্ন পথে। কে রাম কাহিনি প্রথম রচনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে 'রামায়ণ' কাহিনির একটা সঠিক সংবাদ দিতে চেয়েছেন। সারা বিশ্বে রামকথা কত ব্যাপক ভাবে, কত রূপে প্রচলিত ছিল তার এক সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কালকূটের যাত্রা আরও অতীতে, বহু দূরান্তরের সেই পথ। পথদ্রষ্টা হলেন স্বয়ং মহাকবি কালিদাস। আদি কবির সন্ধান তিনিই দিয়েছেন। প্রথম রামায়ণ রচয়িতার সন্ধানে নিয়োজিত, ধুতির ওপর পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে ঝোলা কালকূটকে দেখে উনি ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসেছিলেন। বলেছিলেন—

> ''... তুমি কেন বৃথা সাতশো আট বছরের মধ্যে ঘুরে মরছো? তুমি ফিরে যাও রাঘবের সময়ে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় যে-রাম রঘুবীর, সে যখন লঙ্কা যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন তুমি যাও তমসা নদীর তীরে। তমসার তিনটি ধারা। সে-ধারাটি উত্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে, পশ্চিম স্পর্শ

করে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে, সেখানে গেলে তাঁর দেখা পাবে। তাঁর সারা অন্তর ভরা গ্লানি। দু হাতের রক্ত ধুয়েও, রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন করতে পারছেন না। বুকে তাঁর কঠিন শেল। প্রেমের শেল। তখনও আদি কাব্যের সে অভূতপূর্ব, অশ্রুত সেই শ্লোক উচ্চারিত হয়নি। তিনি রামেরই প্রায় সমবয়সী। যাও, সেখানে যাও। তোমার প্রেমের পাত্রকে খুঁজে পাবে। নিজের কানে সব শুনবে। অভীষ্ট পূর্ণ হবে।"[১৪৫]

অনেক আধুনিককালে উজ্জয়িনীতে ফিরে এসেছিলেন লেখক, কল্পনায় যেখানে মহাকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর মুখ থেকে শ্লোক শোনেন—''অত প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণম্ ইতস্ততঃ/ মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর গুরুবোদিতৌ।"[১৪৬]

লেখক দু হাজার একশো চব্বিশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কালে পৌঁছেছেন। চোদ্দ বছর বনবাসের মাত্র দু-তিন মাস আগে, রাবণের নিষ্ঠুর কীর্তি সীতা হরণের কারণে দেশের এক প্রান্তে তখন যুদ্ধ চলছে। আর লেখক পৌঁছেছেন তমসা নদীর তীরে।

প্রাচেতস তমসার তীরে, অন্যমনষ্ক, তার শ্মশ্রুসমন্বিত মুখের অভিব্যক্তি—

''কী হয়েছে প্রাচেতসের? যার নামে নগর, লোকালয় আর অরণ্যের মানুষ ঋষি মুনি সকলে কাঁপে, যার পেশীআস্ফালিত শরীরের ধ্বংসোদ্যোগী মারমুখী চেহারা দেখে অজ্ঞান হয়, সেই ভয়ংকর দস্যু প্রাচেতস, তার ঋজু বিশাল শরীর নিয়ে, যেন গভীর বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়েছে। তার বিশাল বুক, পেশল শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো পোশাক নেই। খালি গা। কোমরে চীর। চীরের ওপরে বাঘের ছাল জড়ানো। হাঁটুরও খানিকটা ওপরে ঢাকা পড়েছে। পেশল পা, হাঁটু, শক্ত পায়ের গোছা, ধূলাচ্ছন্ন দুই পা। ঘাস বা চামড়া, কোনো পাদুকাই নেই।"[১৪৭]

কিন্তু এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, প্রাচেতসের মুখে কোমলতা। কালকূট আবিষ্কার করেছেন যে, অন্যমনস্ক অভিব্যক্তি আর চোখে আচ্ছন্নতাই কেবল নেই, কোমলতা যেন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং শুধু তা নয়, অন্যমনস্কতার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার অভিব্যক্তিও বর্তমান। বেলা দ্বিপ্রহর, বসন্তকাল, বাতাসের বেগ মৃদু মন্দ। তমসা নদী অতি সর্পিল গতির কাছে প্রাচেতস, কখনও বা দূরে, তার পদক্ষেপের কোনো স্থিরতা নেই বা গন্তব্য নেই। ধীর

অনিশ্চিত তার গতি। চারিদিকের পশু-পক্ষী বৃক্ষের নানা শোভা, কোনো কিছুতেই যেন প্রাচেতসের লক্ষ নেই। তাঁর লক্ষ নেই যে কিছু দূরেই এক বিশাল বট গাছের তলায় তাঁর দলের লোকেরা কেউ শুয়ে কেউ বা বসে আছে। এরা প্রত্যেকেই কিরাত তবে অনার্য বা কালো রং কারোর না। প্রাচেতসের মতোই তাদের রঙ। তারা দীর্ঘাঙ্গ, পেশিবহুল শক্ত চেহারার মানুষ। আকৃতি ও চোখের দৃষ্টি ভীষণ। তারা সকলেই হলো দস্যু। রক্তপাত ও লুঠ তাদের নিয়মিত কাজ। এরা এসেছে উত্তর পশ্চিম হরিয়ুপীয়ার দিক থেকে! শিকার করা হরিণ, হাঁস ও পাকা ফল তাদের সামনেই আছে কিন্তু কারোর কোনো উদ্যোগ বা উৎসাহ নেই সেগুলো আহার করার। কিছুদিন ধরে এরকম অবস্থাই চলছে। কালকূট প্রাচেতসের জীবনের এই হঠাৎ পরিবর্তনকে প্রথমেই তুলে ধরেছেন। কারণ অন্বেষণ করে প্রাচেতস চরিত্রটিকে পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

প্রাচেতস ভৃগুজ ব্রাহ্মণ সন্তান। তপোবনের তপস্বীরা, ঋষি মুনিরাও তাকে ভয় পায়, এবং গোপনে বলে, ভৃগুবংশীয় কুলাঙ্গার। যদিও তার বুদ্ধি ক্ষুরধার, সে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, দস্যুবৃত্তি আর আক্রমণের কৌশল তুলনাহীন। দস্যুনেতা প্রাচেতস নিজ মুখে স্বীকার করে—

> ''আমরা পাপ কাজ করি। করি, কারণ আমাদের দস্যুবৃত্তি ছাড়া, আর কোনো উপার্জনের রাস্তা নেই। এই উপার্জন দিয়ে, আমরা গৃহের ও পরিবারের প্রতিপালন করি।... আমরা পাপ করতে পারি, করিও, কারণ আমরা কোনো ধনীর তুলনায় গরীব থাকতে চাই না। দস্যুবৃত্তিকে আমরা আমাদের নিয়তি বলে মেনে নিয়েছি, এবং আমরা সুখে আছি।''[১৪৮]

কালকূট এই ভাবেই দেখিয়েছেন প্রাচেতসের দস্যুবৃত্তি গ্রহণকে। যে পেশা গ্রহণ করতে প্রাচেতস বাধ্য হয়েছে। সমাজের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যর প্রতি বিদ্রোহ দেখাতেই তার এই পথ বেছে নেওয়া। তাই তার স্বীকারোক্তিও অনায়াস, অকুণ্ঠ ও সাহসী—

> ''এ পথ অসৎ ও পাপের পথ, জানি। তবু এও জানি, আমি বিবেক বস্তুটি ত্যাগ করেছি। আমার পাপের ভয় নেই। আমি ঈশ্বরের বিশ্বাসী নই।... আমার কাছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সব সমান। আমি কেন একজন রাজাজ্ঞানুবাহী হব? আমি কারোর আদেশ পালন করতে শিখি নি।

আমি কারোকে আদেশ করিও না। আমার সঙ্গীদের আমি নির্দেশ দিই, পরামর্শ দিই, কৌশল অবলম্বন করতে বলি।... আমাদের সকলের সমান অধিকার। দস্যুপতির সঙ্গে রাজার এইখানে তফাৎ। রাজা যদি প্রজার শ্রমের বিত্তে বাঁচতে পারে, আমি দস্যুবৃত্তি করে কেন বাঁচবো না। এ জিজ্ঞাসা আমার মনে বালক বয়সেই জেগেছিল।"[১৪৯]

ভৃগুবংশীয় চ্যবনদের কাজ ছিল গান করা আর যাযাবরের মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন। যা প্রাচেতস্ মেনে নিতে পারেনি। তাই যে হাতে ছেলেবেলায় বীণা বাজতো বেপরোয়া জীবন বোধে সেই হাতেই পরবর্তীকালে উঠে এলো মানুষঘাতী কুঠার। যে মানুষটি দু-হাতে রক্ত নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে, সেই ভয়ঙ্কর মানুষটিও তার ভেতরকার আত্মিক দ্বন্দ্বকে ভুলে থাকতে পারে না। লেখক প্রাচেতস -এর চারিত্রিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ববোধকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই কারণেই সব কিছুই নিজের মন মতো পরিচালিত হলেও প্রাচেতস কখনো কখনো বেদনাহত চিন্তিত, গম্ভীর, বিষণ্ণ নির্বাক। বিষণ্ণতা তাকে কখনো কখনো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে, তার মুখে শোনা যায়—

''আমি বুঝি না, আমার মধ্যে কেমন একটা সহসা পরিবর্তন আসে। কী সে পরিবর্তন, কী তার প্রতিক্রিয়া, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয়, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে থামতে হবে।... আর আমার চারধারে কারা যেন অট্টহাস্য করে।... যা আমি করি, তা আমাকে কেন এভাবে মনে করিয়ে দেয়, কে দেয়, আমি কিছুই বুঝি না। ... কিসের যে একটা কষ্ট অনুভূত হয়, আমি জানি না। আমার কেবলই মনে হয় এই সংসারে, এই বনে, নগরের প্রান্তে, মানুষের গৃহকোণে, কত কী ঘটে যাচ্ছে, আমি কিছুই প্রাণভরে দেখতে পাচ্ছি না। কত কী যেন হারিয়ে ফেলছি, হেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"[১৫০]

এইভাবেই লেখক তাঁর অসামান্য লেখনীর ভঙ্গিতে প্রাচেতসের চারিত্রিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এরই আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন তারই দলের এক দস্যু তাকে বলেছিল—

''গত বছর এমনই দিনে, পুরুদের দেশে এক জায়গায় দস্যুবৃত্তি করতে যাবার সময়, তুমি যে মুহূর্তে দেখলে এক ঋষিপত্নী তার স্তন খুলে সন্তানকে পান করাচ্ছে, শিশুটি মায়ের চিবুকে তার কচি হাত ঠেকিয়েছিল, আর মা হাসছিল, তুমি ঝটিতি তোমার অশ্বের বলগা টেনে ধরলে। আমরা অবাক হয়ে থেমে গেলাম। তুমি বললে, কী সুন্দর! ... তোমার যাত্রা অনেকক্ষণ থেমে গেল। তুমি অন্যমনস্ক হয়ে অশ্বচালনা করলে। অথচ এই তুমিই, সেই দিনটিতে, মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। মনে আছে?''[১৫১]

তমসার তীরে দাঁড়িয়ে প্রাচেতসের চোখের সামনে নিমেষে ভেসে আসে এমনই এক একটি ঘটনা। গান্ধারের এক কোটিপতি সওদাগর নবদম্পতির গৃহে নিষ্ঠুরভাবে দস্যুবৃত্তি চালিয়েছিল সে। এমনকি নববধূর সামনেই তার স্বামীর বাম হস্ত কাঁধ থেকে ছিন্ন করেছিল কুঠারাঘাতে। দুরন্ত দুর্ধর্ষ প্রাচেতস সেই রাত্রে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করলেও তার অন্তর্যামী বাম। সেই নবদম্পতি পুরুষের একটি হাত ছিন্ন করার পর থেকে তার অন্তরে বেদনা অনুভব করেছে। সে আশা করেছিল নবীন দম্পতি জীবনের প্রথম মিলনের সুখের জন্য সব ধনরত্ন অনায়াসে দান করে দেবে কিন্তু তারা তাদের নগ্নতায় কোনো শালীনতা বা লজ্জা না রেখেই প্রাচেতসকে বাধা দিয়েছিল। ধনরত্নকে তাদের প্রাণের অধিক মনে হয়েছিল। একমাত্র রক্তাপ্লুত স্বামীকে দেখেই নববধূর চেতনা হয় যে জীবনই অধিক মূল্যবান। কিন্তু এরপরেই শুরু হয় অন্তর যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণার উপশম রাজনর্তকী বারাঙ্গনার সুখস্পর্শেও সম্ভব হয়নি। নতর্কীর ছলাকলার নানান কৌশলই সেই রাত্রে ব্যর্থ হয়েছে, প্রাচেতস নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছে যে সেই পুরুষটি বাধা না দিলে সে আঘাত করতো না। কিন্তু তার অন্তরসত্তা তাকে কঠিন ভাবে বিদ্রুপ করে বলে উঠেছে—

''ইর্ষা! ঈর্ষা! প্রাচেতস, যে ধনরত্ন তুমি অনায়াসেই ছিনিয়ে নিতে পারতে, সেখানে আঘাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি নবদম্পতির সেই সুখী অর্ধ নগ্নাবস্থা দেখে ঈর্ষাকাতর হয়েছিলে। বঞ্চিত তুমি, অতএব তুমি পুরুষটির দুটি হাতই ছিন্ন করতে চেয়েছিলে। যে দু'হাত দিয়ে সে তার বধূর প্রিয় অঙ্গের সুখ উৎপাদন করে।...

কিসের দ্বিধা, অশান্তি, অনুতাপ প্রাচেতসের হৃদয়ে। সে তো জানতো, আবার শীঘ্রই নতুন রাত্রি আসবে। যেখানেই হোক, নগরে গ্রামে লোকালয়ে অথবা অরণ্যে সে আবার তার কুঠার কোষমুক্ত করবে।... তথাপি, প্রতি বারেই রক্তপাতের শেষে, সে যেন ভেঙে পড়ে। কে যেন তার ভিতর থেকে বারে বারে বলে ওঠে, কেন এত নির্দয় তুমি? কেন এই রক্তপাত? তুমি কি একবার নিজের দিকে ফিরে তাকাবে না?"[১৫২]

অথচ যে চ্যবন ভৃগুবংশীয় সন্তান প্রাচেতস, তারা সারা বিশ্বজুড়ে বীণা বাজিয়ে গান পরিবেশন করে ফেরে। তারা গানের নেশায় যাযাবর হয়ে ফিরছে। তাদের রক্তে জন্ম হয়েও সে কিনা হরিয়ুপীয়া থেকে আসা শিকারী কিরাত সঙ্গীদের সঙ্গে রক্তপাত করে ফিরছে। প্রাচেতসকে এমনই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রাচেতস এ সমস্ত কিছুকে তার নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। সে অতি ক্রুদ্ধ হয়েই ভিতরের আপন সত্তাকে প্রতিযোগী করে আহ্বান করে বলে—

''আমি পাপ করছি, এই আমার নিয়তি। তোমাকেও হত্যা করা আমার বিধেয়। তুমি বাধা। তুমি জানো, আমি আমার সংসার পালনের জন্য এই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছি। আমিও একরকমের যাযাবর, তবু আমি গৃহে ফিরে যাই। আমি গান গেয়ে ভিক্ষা করতে ঘৃণা করি। আমার প্রিয়তমাকে আমি সুখী করতে চাই, পৃথিবীর সমুদয় ধনরত্ন দিয়ে। বাধা তুমি। সরে যাও। দূর হও।"[১৫৩]

কিছু সময়ের জন্য সেই সত্তা আত্মগোপন করে, প্রাচেতস মত্ত হয়ে ওঠে তার দস্যুবৃত্তিতে। নিধন তার কাজ, লুণ্ঠন তার পেশা। ধর্ষণ তার বিবেকহীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সে এখন দুর্মর, দুর্দান্ত, ভয়ংকর। এই রূপকেই তার দস্যুসঙ্গীরা চায়। কিন্তু এবারে ভুর্বলোক থেকে লুঠ করে এসে সাতদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কী যেন এক পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে কাউকে হত্যাও করে নি। তবে হত্যা করতে একজনকে উদ্যত হলে, সেই মানুষটি বিনা বাধায় আপন মস্তক পেতে দিয়েছিল এবং প্রাচেতসকে কিছু বলেও ছিল। কেউ-ই ঠিক শুনতে পায়নি দু'জনের মধ্যে কী কথা হয়, তবে প্রাচেতস তার উদ্যত কুঠারকে সরিয়ে

নেয়। কেবল প্রাচেতসের কথাই শোনা যায়। যে ঋষির প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কথা দিয়েছিল যদি ঋষির বলা কথা সত্যি না হয় তাহলে ফিরে এসে তার প্রাণ নেবে। যদি পালিয়ে যায় তাহলেও ঠিক খুঁজে তবে হত্যা করবে। ভুর্বলোকে লুঠ করা কালীন এক নারদ বংশীয় ঋষি, যাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর আর ঠিক যেন এক জাগ্রত ঈশ্বরের মতো দেখতে। তিনিই বলেছিলেন কাদের জন্য প্রাচেতস এত পাপ কাজে লিপ্ত আছে। যে পিতা-মাতা ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য এই পাপের পথ বেছে নেওয়া তারা কী কখনো এ পাপের ভাগী হবেন? প্রাচেতসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঋষিবাক্য মিথ্যা হবে। সেই কারণেই ঋষির কথা যাচাই করতেই তার বার বার গৃহাভিমুখে ছুটে যাওয়া। কিন্তু শেষবারের প্রশ্নেও পিতা-মাতা স্ত্রীর কাছ থেকে একই উত্তর পেয়ে সে জানতে পারলো ঋষি মিথ্যা বলেননি। পিতা ও মাতার কাছে যখন জানতে চায় যে তাঁরা তার পাপ কর্মের ভাগীদার কিনা? তাদের বক্তব্য বয়স হয়েছে সুতরাং উপার্জনক্ষম পুত্র তাদের কীভাবে প্রতিপালন করছে তা দেখবার বিষয় তাদের নয়। তাদের খাদ্য-পানীয়-আশ্রয় জোটানো পুত্র হিসেবে প্রাচেতসের কর্তব্য। এছাড়া তারা প্রাচেতসের পিতা-মাতা এই গৌরবে গর্বিত। সকল সৌভাগ্যের ভাগ নিলেও প্রাচেতসের পাপের দায় তার একার। স্ত্রী ছায়াও তাকে একই উত্তর দিয়েছে। যে ছায়াকে সে কখনো ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারে না, সে নিজ মুখে বলেছে, সকল কিছুর ভাগী সে, একমাত্র পাপের নয়। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। সংসারের কারোর পাপের ভাগী কেউ নয়। হ্যাঁ, তবে স্ত্রী যদি দ্বিচারিণী হয় সেই পাপের দায় একা তার, এরজন্য স্বামী তাকে হত্যা করতে পারে, তাতে কোনো পাপ নেই। একথা মুহূর্তে প্রাচেতসকে যেন নাড়িয়ে দেয়। সে কুণ্ঠা বোধ করে সংকুচিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে অতীতের কিছু ঘটনা, যা প্রমাণ করে সে ছায়ার প্রতি একনিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারে কি। বাহীক রমণীদের সঙ্গে তার যথেচ্ছ বিহার চলেছে। ফলে মুহূর্তেই তার মনে পাপবোধ জেগে ওঠে, যা স্বতোৎসারিত। ঋষি তো তাকে মিথ্যা বলেন নি, তাহলে? প্রাচেতসের মনের ভিতর জিজ্ঞাসা মাথাচারা দিয়ে ওঠে—

> ‘‘তাহলে? তাহলে সারা জীবন ধরে আমি কী করে আসছি? কোন্ অন্ধকারে আমি আছি? সংসারের সব সুখের স্বপ্ন আমার ভেঙে গিয়েছে। এখন আমার একমাত্র চিন্তা, আমার এই একলার পাপ থেকে আমি কেমন করে মুক্ত হবো? আমি যে একা, একা। আমার

সুখের ভাগ ছাড়া নেবার কেউ নেই।... কিন্তু আমার পাপ? পাপের এই একলা জীবনটা নিয়ে আমি কী করবো? কেমন করে এর থেকে মুক্তি পাব?"[১৫৪]

প্রাচেতস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তার যে, সমস্ত জীবনটাই পাপে ভরে গেছে। কী ভীষণ অন্ধকারে সে মিথ্যার স্বর্গে বাস করছিল। কেউ তার পাপের ভাগী নয়, সে একলা।

এবার যাত্রা কালে সে কারোর সঙ্গে দেখা করলো না, বিদায় নিল না পিতা-মাতার কাছ থেকেও। তার যাত্রার লক্ষ পশ্চিম সাগর। অনেক কষ্ট সয়ে তবে তাকে এ পথ অতিক্রম করতে হবে। কারণ সে তার দস্যুজীবন, অশ্ব, কুঠার, কৃপাণ সবই ত্যাগ করেছে। যে ঋষি তাকে সত্যের পথে মনকে সচকিত করে তুলেছিলেন তাঁর সন্ধানেই প্রাচেতস স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্তও প্রয়োজন হলে যাবে। তাঁর দর্শন চাই, একথা জানাবার জন্য যে, তিনি সত্য বলেছিলেন। কালকূট প্রাচেতসের এই ঋষি অন্বেষণের পথ পরিক্রমাকে কাহিনি বয়ন কৌশলে ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, পুরাণকে অতিক্রম করে আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের রচনাগুণে উপন্যাসের মহিমা ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাচেতসের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে। যে দেশগুলিতে সে দস্যুবৃত্তি চালিয়েছে সেখানকার সহৃদয় সামাজিক চরিত্র জানার অবকাশ তার কখনো হয়নি, ফলে গোপনে অশ্রুপাতও করেছে। প্রাচেতস শেষ পর্যন্ত কিম্-পুরুষবর্ষে সেই ঋষির সাক্ষাৎ পেয়েছে। ঋষি তাকে জানিয়েছেন তার মধ্যে সত্যের বোধ জাগ্রত হয়েছে এবং সত্যের শক্তি একবার যখন জাগ্রত হয়েছে তখন সেই শক্তিই সমস্ত অন্ধকার জগতকে আলোকিত করে তুলবে। ঋষি বললেন—

"আমি সপ্ত দেবলোক ভ্রমণ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, ঈশ্বর তোমার মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছেন। অন্যথায় এই শক্তি জাগ্রত হতো না। তুমি অনিশ্চিত ভাবে, এইরকম আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে না। আমি বলছি, প্রাচেতস, এই ধ্রুব জেনো, তোমার সকল জগতের অন্ধকার কেঁপে উঠেছে। তারা আলোকিত হবার জন্য কাতর ও আর্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে জাগ্রত তোমার শক্তি। কিন্তু কেমন করে কী ঘটবে আমি জানি না।

আমি তোমাকে কেবল এই কথা বলবো, আর বিন্দুমাত্র কালহরণ না করে, তুমি স্বস্থানে গমন কর।”[১৫৫]

ঋষির আজ্ঞায় গৃহাভিমুখে ফেরার পথে প্রাচেতস প্রকৃতির সৌন্দর্যে নতুন করে মুগ্ধ হয়। তার পদযুগল অনেক পথ হেঁটে রক্তাক্ত তবুও যেন কষ্টবোধ নেই। নেই কোনো ব্যথার অনুভূতি। শুধু চোখে অনবরত জলধারা নামে যখন মনে পড়ে যায়, অতীতে তার দ্বারা প্রকৃতির অমর সন্তান পশু ও পক্ষীকুলের ওপর, তার নৃশংস কুঠারাঘাতের ছবি। সে প্রাণপন তার পূর্বকৃত হত্যালীলার স্মৃতিকে ভুলে যেতে চায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর প্রাচেতস যখন হেমন্ত ঋতুতে তমসার উত্তর পশ্চিম অববাহিকায় এসে পৌঁছালো, তখন তার দেহ শীর্ণতর, মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধে নেমেছে, মাথায় জটা। প্রাচেতসের বাইরে বৈরাগ্যের রূপ প্রকাশ পেলেও ভেতরে সে অনবরত যন্ত্রণায় দ্বগ্ধ হচ্ছে লেখকের বর্ণনায়—

‘‘প্রাচেতস প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে, কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তার পাপবোধ এখনও তাকে গ্রাস করে আছে। তার পায়ের ঘা এখন শুষ্কতা পাচ্ছে। কিন্তু সে শীর্ণতর। তার শ্মশ্রু নেমে এসেছে বক্ষে। তার চোখে সর্বদা মারণ যন্ত্রণার আতঙ্ক। সে যেন এখনও শান্ত হতে পারেনি। অথচ কোনো তপোবনের নিকট দিয়ে আসবার সময় তপোবন-মুনি-ঋষিরা তাকে আর সেই ভয়ংকর দস্যু প্রাচেতস বলে চিনতে পারছেন না। ঋষি ভেবে, তার গন্তব্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করছেন।”[১৫৬]

তপোবনের ঋষিরা বিস্মিত, তাদের মনে হয় না যে এই ঋষি সদৃশ পুরুষ কোনো পাপকার্য করতে পারে। কিন্তু প্রাচেতস তার আদ্যপ্রান্ত স্বীকার করে। সে জানে না কী করে তার পাপ থেকে মুক্তি হবে। শুধু এটুকুই জানে যদি কেউ কারোকে অপরা প্রেমের চোখে দেখে থাকে বা তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করে থাকে, তার কাছ থেকে পাওয়া আঘাত সব থেকে বেশি বুকে বাজে। সেই আঘাত প্রাচেতস তার প্রিয়তমা পত্নীর কাছ থেকে পেয়েছে। যাকে সে পিতা মাতার অধিক স্নেহ ও প্রেম করতো। তার জীবন যেন প্রিয়তমার আঘাতে মহতী দুঃখের স্বাদ পেয়েছে।

প্রাচেতস এবার উত্তর কিরাত পল্লীর দিকে চলেছে। সে জানে না তার শ্মশ্রুময় মুখে

ও মাথার লম্বমান জটায় লতাগুল্ম শিকড় ছড়িয়েছে। কিরাতপল্লীর ভেতরে নিজের কুটীর প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রাচেতস থমকে দাঁড়ালো। সে এতক্ষণ ভেবে ভেবে পথ হেঁটেছে যে, ছায়া তাকে দেখে কেঁদে আকুল হবে, তার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগের অবসান ঘটবে। কিন্তু প্রাচেতসের পা যেন মাটির গভীরে প্রবেশ করলো। শরীর পাথরের মতো শক্ত স্থির। ছায়া অন্য এক পুরুষের আলিঙ্গনে? যে প্রাচেতসের কোনো পাপের ভাগ নিতে চায়নি! কিন্তু আজ সে কিসে লিপ্ত? তার বিশ্বাসের সেই মর্যাদা কোথায়?

সে আরো দেখলো, তার পিতা সুরা পান করে মাতাকে প্রহার করছে। চীর ও বল্কলধারী, কৃশতনু, জটাজুট শ্মশ্রুবান প্রাচেতসকে দেখে কেউ চিনতে পারে না, ছায়াও না। বরং সে ঋষি মনে করে প্রাচেতসের কাছ থেকে তার স্বামীর সংবাদ জানতে চায়। প্রাচেতসের বক্ষ যেন বিদীর্ণ করে এক ভয়ংকর করুণ আর্তনাদ উঠে আসে। তবু সে কেবল মাথা নাড়ে। ছায়া তার পাশের পুরুষকে আলিঙ্গন করে বললো—"তবে আর কী প্রয়োজন এই ঋষির কাছে দাঁড়িয়ে থাকার। সে আর কোনোকালে ফিরে এলেও, তার পাপের সঙ্গে আমার পাপের আর কোনো ভাগাভাগি হবে না। সংসারে আমরা যে-যার পাপ নিয়ে আছি।"[১৫৭] প্রাচেতসের বুক ভেদ করা আর্তকান্না ঋষির উদ্দেশ্যে উদ্গত হয়ে বেরিয়ে আসে। তার মনে হয় এ সবই তার প্রতি প্রতিশোধ, বাহীকদের নগ্ন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সে যা করেছে সেই নির্লজ্জ সহবাসের দৃশ্যই তাকে ছায়ার মধ্যেও দেখতে হলো। এই সব হারানোর যন্ত্রণা বোধে প্রাচেতস কদিন মূর্ছা হয়ে পড়ে রইলো। সেই ঋষি দেখা দিয়ে বললেন, তার সমস্ত অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে এই মহতী দুঃখ। মুক্তি আসন্ন। তার নিজের ভিতরেই আলো জন্ম নিচ্ছে। প্রাচেতসের মধ্যে যেটুকু গ্লানি আছে তা দূর করতে ঋষি জানালেন সেই বণিক পুত্রের কথা, যার বাহু বিচ্ছিন্ন করেছিল প্রাচেতস, সে এখনও বেঁচে আছে। আর তার পত্নী মনে করে প্রাচেতস দস্যুর অধিক। আর সেই বারাঙ্গনা, যাকে কিনা সেই রাতে প্রাচেতস তার অনুশোচনার কথা জানিয়েছিল সেও জানে দস্যুপতি মহৎ পুরুষ। এভাবেই শুরু হয়ে গেছে প্রাচেতসের জয়গান। ঋষি আরো জানালেন, ঈশ্বর কোনো অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করবেন বলেই এই মহতী দুঃখের পথে তাকে টেনে এনেছেন। দুঃখই পরম প্রাপ্তির সোপান, যা মানুষকে মহৎ করে তোলে। জগৎ সংসারকে নতুন পথের সংকেত দিতেই যেন প্রাচেতসকে মহতী দুঃখের মাধ্যমে ইতিহাসের আঙিনায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ঋষি উচ্চারণ বললেন এটি ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় তাই এখন ইতিহাসের আঙিনায়

প্রাচেতস। প্রকৃতিই একমাত্র সম্পদ। এই প্রকৃতি একমাত্র কণ্ঠে সঙ্গীতের দিতে পারে। যে ভৃগুজ বংশের রক্ত প্রাচেতসের মধ্যে সেই স্ফূর্ত সঙ্গীত জন্ম নিচ্ছে। আসলে পরম দুঃখ, পরম হারানোই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। এরপর প্রাচেতস তমসার তীর ধরে ক্রমশঃ একের পর এক অরণ্যানী, গিরি প্রান্তর, পর্বত, নদী-নালার পথ অতিক্রান্ত করেছে। তার কেবলই মনে হয়, তার ভিতরে চলছে কী এক অদ্ভুত স্তব্ধতাকে ভেঙে ফেলার আকুলি বিকুলি। কী জন্ম নিচ্ছে তার কোথায় আপন সত্তার গভীরে, কোনো চৈতন্য তার নেই। সকলই অবোধ্য অথচ আকুলি বিকুলির মধ্যে একটা আনন্দধ্বনি যেন গোপনে তাল দিয়ে চলেছে।

যে দুঃখ তাকে বিকৃত ও মরণের ফাঁদে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই দুঃখই তাকে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে। অথচ প্রাচেতস কখনো মহৎ হতে চায়নি, তার সাধনা পূর্ণ মানবতার। মহৎ হওয়ার থেকে, মানবের পূর্ণতাই কঠিন, যা দুঃখকে গ্লানির অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসে, তাকে অমৃতের স্বাদে ভরিয়ে নিতে চায়।

প্রাচেতসের সেই সুতীব্র অনুভূতি অতি অপার এক দুঃসহ দুর্দম হয়ে যেন তাকে প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রক্ত বেগে এক অদ্ভুত তরঙ্গ যেন বুকের ভেতরে ডমরু বাজাচ্ছে। সে ডুব দিতে চাইছে তার আপন গভীর সত্তার মধ্যে, অথচ পারছে না। চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চাইছে, অথচ কোথায়ও তা স্তব্ধ। হৃদয়ের কপাটে এক ভীষণ চাপ। কিন্তু কী ঘটছে তার হৃদয়ে, কিসের প্রকাশের অপেক্ষা, তা সে নিজেও বোঝে না। মনের এমন অবস্থার মধ্যেও সে শান্ত হয়ে কুটীরের বাইরে বসে ছিল। বেলা অতিক্রান্ত হয়ে যখন পশ্চিম আকাশে রক্তাভা দেখা দেয়, প্রাচেতস দেখতে পায়, দুটি ক্রৌঞ্চ আপন সুখে মৈথুনে রত, এক গাছের ডালে। এমন দৃশ্য দেখা মাত্র, কেমন এক পাষাণ বিগলিত ধারা তাকে যেন উদ্বেল করে তুললো। ছায়াকে মনে পড়লো। প্রাচেতস সুখে সেই ক্রৌঞ্চ মিথুনের মৈথুন দৃশ্য দেখছিল এবং তার ভিতরের সকল অনুভূতি তখন একাগ্র হয়ে যেন সেই আনন্দ উপভোগ করছিল। কিন্তু ঠিই সেই মুহূর্তে চোখের পলকে কী যেন ঘটে গেল। সে দেখলো, ক্রৌঞ্চের শরীরের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ তীর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এলো। তখনি ক্রৌঞ্চ পাখা ঝাপটিয়ে গাছের তলায় পড়ে গেল আর ক্রৌঞ্চী চিৎকার করে উড়ে গেল। ক্রৌঞ্চের পাখায় রক্তের ঝলক। প্রাচেতস দেখলো, এক নিষাদ নিহত ক্রৌঞ্চকে ধরবার জন্য ছুটছে। এবং অবশেষে পূর্বের এক বিশাল আলোড়নের মুক্তিস্বরূপ আচম্বিতে প্রাচেতসের কণ্ঠ থেকে প্রথমে অনুদাও স্বরে,

তারপর স্বরিত স্বরে, ভিতরের গভীর মর্ম থেকে তীব্র হাহাকারের ভাষায় উদাও স্বরে উদ্‌গীথ হলো—

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদ্ একম্ এবধী কামমোহিতম।।''[১৫৮]

হে নিষাদ, কখনোই তুমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তুমি যেহেতু কামাসক্ত ক্রৌঞ্চ দম্পতির মধ্যে একটিকে বধ করলে। কিন্তু প্রাচেতস নিজেই এর অর্থ, ভাষা বুঝতে পারে না। অন্তরের অনুশোচনায় অকস্মাৎ নির্গত বাণীকে সে পালন করলো। সে নিজে তার উচ্চারিত বাণীর মর্ম খুঁজছে, অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ এক অলৌকিক আনন্দধারা বয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে আছে নিহত বিহঙ্গের অপার বেদনার ভার। ঋষি সব শুনে প্রাচেতসকে বললেন—

''প্রাচেতস! প্রাচেতস, তুমি দেবভাষায় অনুষ্ঠুভ ছন্দে শ্লোকছন্দ বাণী উচ্চারণ করেছো! এই প্রথম উচ্চারিত হল। এ তোমারই সারা জীবনের কথা, এই ভাষায় রূপ পেয়েছে। তুমি অতীতে যে কাজ করে, অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়েছ, তুমি অনেক দম্পতিকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ, নিজে বড় দুঃখে বিচ্ছিন্ন হয়েছ নিজের প্রিয়তমার কাছ থেকে, ক্রৌঞ্চমিথুনের একজনকে নিহত হতে দেখে, সেই বাণী রূপ পেলো তোমার সত্তার থেকে—তুমি আদি কবি হে প্রাচেতস!''[১৫৯]

ঋষি তাকে গভীর আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি আদি ও অনন্তের কবি। প্রাচেতস তার বাণীকে চির দুঃখী মানুষের মাঝে স্থাপিত করতে চায়। ঋষিকে জানায় স্বর্গ তার স্থান না। তবে তার এই বাণী বয়ে বেড়াক এমন গুণে, যা সর্বলোকে পৌঁছবে। মানুষ গান করবে, তার চির পুরাতন বাণীকে, এই বাণী দেবে চির নতুনের ছন্দ, দেবে আশা। ছন্দের বাক্যকে সেই মহিমা দিতে চান, যা মানুষের হৃদয় ভাসিয়ে তারপর যাবে স্বর্গলোকে। প্রাচেতস তার শ্লোক ছন্দ বাণীতে যাঁর সমুজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপিত করলেন, তিনি দাশরথি পুত্র শ্রী রামচন্দ্রের পত্নী সীতা। প্রাচেতস ভরদ্বাজ মুনিদের তৈরি কুটিরাশ্রমে বাস করছেন এবং সদা চিন্তিত মগ্ন মনে ভাবছেন কাকে নিয়ে কী রচনা তিনি করবেন। এখানে লেখক যেন প্রাচেতসের সঙ্গে সম আত্মা হয়ে উঠেছেন, তাই প্রাচেতসের মগ্ন চিন্তায় উঠে আসা ভাবনা যেন তাঁরই জীবনের কথা স্বরূপ।

প্রাচেতস ঋষির কথা ভোলেনি। মানুষই হবে তার রচনার বিষয়। সেই সৃষ্টি মানুষের জয়গান করবে। মানুষ ছাড়া, সংসারে আর কে আছে, এমন বিচিত্র, সুন্দর, জটিল, দুঃখ-সুখে মিশ্রিত। মানুষের উর্ধ্বে আর কারোর অস্তিত্ব নেই প্রাচেতসের মনে। এবং মানুষের কীর্তি, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি সর্বদাই অনন্য। সব মিলিয়ে, এই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেই আছে অমৃতের ধন। বুকে সর্বক্ষণ বিষের জ্বালা, কালকূট সম। মানুষের অমৃতধারায় ডুব না দিলে, তা থেকে মুক্তি নেই?

এমনি এক দিনে প্রমাদ ঘটে গেল, তমসার তীরে, প্রাচেতসের আশ্রমের মাটিতে অযোধ্যার রাজা রঘুপতি রামের পত্নী সীতার আবির্ভাব। রাজ আজ্ঞায় দশরথপুত্র রামের কনিষ্ঠ, দেবর লক্ষ্মণ নির্বাসিতা সীতাকে রেখে দিয়ে গেছেন। রাজ আজ্ঞাতেই তিনি প্রাচেতসের আশ্রমে পরিত্যক্ত হয়েছেন। সীতার বৈরাগ্য শুচি শুভ্র রূপ দেখে ও তাঁর কথা শুনে প্রাচেতসের মনে পড়ে যায় ঋষির কাছে শোনা রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণের কথা এবং তারপরে রামের বক্ষ বিদীর্ণ করা হাহাকারের ক্রন্দন। সেই রামকেই প্রজানুরঞ্জনের কারণে প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে নির্বাসন দিতে হয়েছে। প্রাচেতসের মনে হয়, যেন এই দিনটির জন্যই তিনি সারা জীবন ধরে প্রতীক্ষা করে আছেন। সীতাকে তিনি বলেন—

> ''সামান্য সময় মধ্যে, আমি তমসার তীরে বিচরণ করতে করতে, আরও নিশ্চিন্ত হয়েছি, আমার সারাটা জীবন এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। আমি এই তপোবনে, মুনিপত্নীদের গর্ভবতী রূপ দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন বিশালবতী গম্ভীর অথচ মানবীর এমন গর্ভবতী রূপ যেন আর কখনও দেখি নি। আমি স্থির জানি, তুমি সাধারণ গর্ভবতী নও, কেননা বিপুল তোমার রূপ, এবং রমণীকে যে গর্ভবতী অবসথায় সর্বাপেক্ষা রমণীয় ও সম্মানীয় প্রতিভাত হয়, তোমাকে দেখে আমি তা অনুভব করছি।''[১৬০]

প্রজাদের ভিতরে সীতার অন্তর আর দেহ শুচিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, মানুষ এখানেই মানুষ। তার চরিত্র যে এমনই কোথাও সীমাবদ্ধ। প্রাচেতস সীতাকে বলেছিলেন, প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসাবে, রাম একদিন অবতার হবেন, সেটাই সংসারের বিধান। কিন্তু তুমি যে সীতা মনের দিক থেকে অন্য পুরুষের প্রতি কখনও আসক্ত নও, সে সত্য কোনোদিন প্রমাণ হবে না।

প্রাচেতস বলে—

> ''দেবী আমি জানি, তুমি ধর্ষিতা, কিন্তু সে দোষ তোমার না। তোমাকে রাবণের পৈশাচিক ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারার পাপ চিরকাল মানুষের সমাজকে বহন করতে হবে। যথার্থ সতীত্ব দেহের ঊর্ধ্বে, নারীর হৃদয়ের শক্তিতে অবস্থান করে। এই শক্তির মহিমা বুঝতে মানুষের বহুকাল গত হবে। অবতার রামের জন্য মানুষ যেমন চিরকাল গৌরব গান করবে, তোমার জন্যও সমস্ত মানবী চিরকাল তোমাকেই অনুসরণ করবে।''[১৬১]

কালকূট পুরাণ চরিত্র প্রাচেতস ও সীতাকে একান্ত মানব মানবী রূপ দিয়েছেন। সেই কারণেই বোধহয় প্রাচেতস সীতার দুঃখের গ্লানিকে অনুভব করেছে একান্ত মানবিক বোধে। প্রাচীন পুরাণ কথাকে নিয়ে লেখক যেন সর্ব কালের মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। লেখকের চোখে প্রাচেতস একান্ত মানুষ বলেই তার বিবর্তনও ঘটেছে মানবিক ভাবে। অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় উত্তরণে প্রাচেতস তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক সীমান্ত থেকে আরেক সীমান্তে পার হয়েছে। তাই প্রাজ্ঞ প্রাচেতস তাঁর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বলেছেন—

> ''দেবী, মানবীই একমাত্র জানে, তার সত্য কোথায়, তার শক্তি কোথায়। আজ যে রাম তোমাকে ত্যাগ করেছেন, তার মূল্য তাঁকে অন্যভাবে দিতে হবে।... তারও মনস্তাপ কম না। আমি আবার একবার প্রত্যক্ষ করলাম, ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীকে কোনো নিষাদ মিলন অবস্থায় তীরবিদ্ধ করে ছিন্ন করেছে। এই আমাদের জীবনের সত্য। মানুষ যেখানে যত খাঁটি, সেখানে তার পরীক্ষা বারে বারে। আর তা চোখের জলেই ধুয়ে দিতে হয়েছে।... শাশ্বত হলো মানুষের দুঃখ, যে দুঃখ তাকে চিরদিনের পথের সন্ধান দিয়েছে। আমরা সকলে সেই পথের সন্ধানে চলেছি, যেখান থেকে দুঃখ আমাদের অমৃতের দুয়ারে নিয়ে যায়।''[১৬২]

প্রাচেতস সীতার দুঃখের শরিক হয়ে ভবিষ্যৎ জানান। সীতা আত্মবিলোপের পথ বেছে নেবে। মিথ্যা অগৌরবে এই আত্মনাশই মানবীদের কাছে চিরকাল পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে। এবং

এই আত্মবিলোপের কারণে, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে নিবিড়তর। তারা একদিন বুঝবে এই আত্মবিলোপে সামাজিক কোনো উন্নতি নেই বরং সমাজকে তা দেয় অন্ধকার ও হতাশা। প্রাচেতসের লিখিত কবিতাতেই থেকে যাবে সীতার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত কাহিনি। প্রাচেতস তাঁর হৃদয়াবেগের তীব্র অনুভূতিতে বলেছেন—

> ''দেবী, আর একবার ক্রৌঞ্চের মিলন মগ্ন ক্রৌঞ্চীকে নিষাদ বধ করবে। সেই দিনটি, যেদিন তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাবে, সেইদিন আমার কাব্য সার্থক হবে। সেইদিন থেকে আমার সর্বস্ব হবে, তোমার কারণে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাকে কাব্যের আলোকে পরিচিত করা—সেই কাব্য গান গেয়ে আমার সারা জীবন কাটবে।... সেই কারণেই, আজকের দিনটি আদি কবির সর্বাপেক্ষা, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক্ষার দিন। তুমি মোহহীন চিত্তে নিজেকে প্রকাশ কর। আমি মোহহীন চিত্তে শুনি।''[১৬৩]

শাশ্বত হলো মানুষের দুঃখ, যে দুঃখ তাকে চিরদিনের পথের সন্ধান বলে দেয়। এই সত্য উপলব্ধি করে প্রাচেতস সীতার দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখকে একাকার করে নিয়েছেন। এবং সীতার জীবন অবলম্বনে 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করে আদি কবি প্রাচেতস যার গোত্র নাম 'বাল্মিকী' তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকের একটি বক্তব্যের সঙ্গে আমরা এখানে একমত হতে পারি, যে—

> ''... যে-সমস্ত মৌলিক জিজ্ঞাসা এই কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কালকূট, তার মধ্যে একান্ত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যা, সেটি হল, পাপ কি, পুণ্য কি? পাপ-পুণ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি কিছু আছে। যদি থাকে তাহলে সেই থাকা-না-থাকার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি কিছু আছে? যদি থাকে তাহলে সেই থাকা-না-থাকার পরিমাণ কতখানি আপেক্ষিক? আর তার পাশাপাশিই তিনি দেখিয়েছেন পাপের আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যের খোলা বাতাসে একজন মানুষ কেমনভাবে উঠে আসে, তার ছবি।''[১৬৪]

আসলে পাপ এবং পুণ্য, পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে আধুনিক মানুষের যে মূল্যায়ন তারই

প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটি লিখেছেন।

পৃথা : (১৯৮৬)

কালকূট তাঁর 'পৃথা' গ্রন্থটি ১৩৯২ সালে শারদীয় 'প্রসাদ' পত্রিকায় 'ভ্রমর' ছদ্মনামে লেখেন। গ্রন্থটি পরের বছর পয়লা বৈশাখে 'মণ্ডল বুক হাইস' থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশ পায়। উৎসর্গ পত্রে লেখা হয়েছিল—'শ্রীদেবকুমার বসু প্রীতিভাজনেষু'।

কালকূট তাঁর আধুনিককালের মানসিকতাকে নিয়ে তাঁর পৌরাণিক কাহিনিগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং পুরাণকাহিনিগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছে একালীন মূল্যবোধ ও চরিত্রের নবতর দার্শনিক ব্যাখ্যা। 'শাম্ব' এবং 'প্রাচেতস' এই দুটি পুরাণাশ্রয়ী কাহিনি ব্যতীত লেখকের আরও তিনটি ইতিবৃত্তাশ্রয়ী গ্রন্থ রয়েছে। যথা—অন্তিম প্রণয়, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, পৃথা। এই তিনটি গ্রন্থ 'মহাভারত' -এর পটভূমিকা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কিন্তু এদের রচনাক্রম অনুসারে সাজালে প্রথম গ্রন্থ হলো 'অন্তিম প্রণয়', দ্বিতীয় গ্রন্থ 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' এবং তৃতীয় 'পৃথা'। যদিও জাতীয় ইতিবৃত্তের পথে ঘটনার ক্রম অনুসারে চললে দেখা যায় এদের মধ্যে সবথেকে প্রাচীন হলো 'পৃথা'র কাহিনি। এরপর পাণ্ডু ও রাণী মাদ্রীর মিলনে 'অন্তিম প্রণয়ের' ঘটনা এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনের শেষের দিকে, 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' অশ্বত্থামার প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা পালনের কাহিনি। লেখক মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ সেনাপতি হিসেবে অশ্বত্থামাকে নিয়েছেন। দ্রোণাচার্য পুত্র অশ্বত্থামাই হলেন এই গ্রন্থের নায়ক। যুদ্ধের শেষ বীর সেনাপতি অশ্বত্থামা, মৃত্যুপথগামী কৌরব শ্রেষ্ঠ দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঞ্চালবংশকে তিনি ধ্বংস করবেন। যার কারণ পিতা অস্ত্র গুরু দ্রোণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। এই কার্য সমাপ্ত হলে পর অশ্বত্থামার মনে অহিংস মানসিকতার উদয় হয় ফলে তিনি তাঁর অস্ত্র সংবরণ ও প্রত্যাহার করেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা লেখকের অশ্বত্থামা সম্পর্কে ভাবনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ শেষে অশ্বত্থামা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়েছে এবং হত্যালীলার দৃশ্যে তাঁর চোখ থেকে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। এবং শেষবারের জন্য তিনি উচ্চারণ করেন এই তীব্র রক্ত পিপাসা এখানেই বন্ধ হোক। তিনি এই পৃথিবীতে শুধু মানব হৃদয়কে স্পর্শ করতে চান।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শম্ভুনাথ চক্রবর্তী তাঁর লিখিত 'কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে' নামক গ্রন্থে

বলেছেন যে—

> '' 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' গ্রন্থে কালকূট কয়েকটি বিশেষ ইতিবৃত্তীয় সংকেত দিয়েছেন। যে সংকেতগুলি, মহাভারতের মূল বিষয়াবলীর গতানুগতিকতার উর্ধ্বে। ... তৎকালীন যুগের, আর্য-অনার্য সংশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রেতা, দ্বাপর, এবং দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণে যে প্রাচীন যুগটির সামাজিক-ইতিবৃত্তের ধারাটি এই গ্রন্থের মধ্যেই তিনি নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন।''[১৬৫]

জাতীয় ইতিবৃত্তাশ্রয়ী গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অন্তিম প্রণয়' প্রথম রচিত হয়। যদিও প্রকাশ পায় অনেক পরে। অন্তিম প্রণয়ের মধ্যে লেখক প্রপঞ্চক মায়ার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বাস্তবতার পথে নিজেকে অগ্রসর করেছেন। এই গ্রন্থের মূল নায়ক ও নায়িকা হলেন পাণ্ডু-মাদ্রী। গতানুগতিক পরিচয় ছাপিয়ে পাণ্ডু চরিত্র আমাদের কাছে অন্যভাবে উঠে এসেছে। কালকূট জাতীয় ইতিবৃত্তের ঘটনার নতুন তথ্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন। পাণ্ডু কুন্তীভোজের রাজপ্রাসাদে স্বয়ম্বরা কুন্তীকে লাভ করেন এবং পরে মদ্ররাজ কন্যা মাদ্রীকে ও বিবাহ করেন। কিন্তু এরপরে পাণ্ডু রাজধানী ত্যাগ করে দুই স্ত্রীকে নিয়ে মৃগয়ায় বা বলা চলে বনবাসে গেলেন। এবং এই বনবাস করা কালীন এক অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে যায়। এক মৃগ যূথপতি এক মৃগীর সঙ্গে ক্রীড়ায় মগ্ন ছিল, তাদের মিলন কালে পাণ্ডু বান নিক্ষেপ করলেন। বাণবিদ্ধ হতেই মৃগ তার রূপ ছেড়ে ঋষিপুত্রে পরিণত হয়ে আর্তনাদ করে বিলাপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুর সঙ্গে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের পর কিন্দম মুনি মৃত্যুর আগে পাণ্ডুকে অভিশাপ দেন যে সে যেমন সঙ্গম সময়ে বধ করছে ঠিক একইভাবে তারও সেই সুখের দিনে মৃত্যুপথে যেতে হবে।

যদিও কালকূটের কাছে এসমস্তই অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত মনে হয়। তাঁর অনুমান পাণ্ডুর শরীরে এমন ব্যধি কিছু ছিল, যার ফলে মৈথুনে রত হলেই পরিণাম মৃত্যু। তাই সঙ্গম আকাঙ্ক্ষায় কুন্তীর অজ্ঞাতে মাদ্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়া মাত্রই পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে। 'অন্তিমপ্রণয়' কাহিনির এভাবেই শেষ হয়। কাহিনির শেষের দিকে মাদ্রীকে কুন্তী একটি আশ্চর্য কথা বলেন—''মদ্ররাজনন্দিনী তুমিই ধন্যা, আমার চেয়েও শত গুণে সৌভাগ্যবতী। কারণ স্বামীর সেই আশ্চর্য প্রসন্ন সুন্দর মুখটি তুমিই দেখেছ।''[১৬৬]

'অন্তিমপ্রণয়' এর শেষ কথায় এসে কুন্তীর এমন অসাধারনত্বে কালকূট বিহ্বল হয়েছেন।

কুন্তীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে এক প্রেম বঞ্চিতা নারীর চির বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও প্রাক্-বিবাহ থেকে বৈধব্য জীবন পর্যন্ত বেদানার্ত যন্ত্রণাময় জীবনের হাহাকার ফুটে উঠেছে। প্রাচীন ইতিবৃত্তের এই উল্লেখযোগ্য, বিতর্কিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, চিরস্মরণীয়, অসাধারণ চরিত্র কবি ব্যাসদেব থেকে শুরু করে নাট্যকার ভাস, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি স্বয়ং কালকূটও এই পরিমণ্ডলে পড়েন। পৃথা চরিত্রের মূল্যায়নে কালকূট যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাঁর ভাষায়—''অন্তিম প্রণয় কাহিনীর শেষে শুধু একটি কথাই বলবো। কুন্তীর এই শেষ কথাটি জন্যই, তাঁকেও আমি ধন্যা মনে করছি। সত্য কথা এমন করে, বুকের পাঁজর ভেঙে কোন্ রমণী বলতে পারেন? তিনি সত্যিই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী।''[১৬৭]

'অন্তিম প্রণয়' কাহিনির শেষে কুন্তীর চরিত্রের জন্য করা এই মূল্যায়নটির মধ্যেই কালকূটের 'পৃথা'র বীজ লুকিয়ে রয়েছে। 'মহাভারত' অবলম্বনে রচিত 'অন্তিম প্রণয়'-এ লেখক প্রথম কুন্তীকে তাঁর চারিত্রিক মর্যাদায় তুলে ধরেছেন এবং এক প্রেমবঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের সত্যকার বেদনায় আত্ম উন্মোচনের দ্বারা 'পৃথা' উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব মাত্রা দিয়েছেন।

কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র পৃথা-র সময়ে অবতরণ করে লেখক তাকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাই এই উপন্যাসে ইতিবৃত্তীয় পরিধিকে তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চেয়েছেন। আলোচনার সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে দেখবো যে, কালকূট কয়েকটি যুগকে পর পর ব্যাখ্যা করে গেছেন। তার মধ্যে সংহিতা যুগ, পৌরাণিক যুগ, মহাভারতের যুগের কথা বিশেষ করে উল্লেখ্য। তিনি এই যুগগুলির প্রত্যেকটিকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূর্ণরূপে আলোচনা করেছেন। সেই কালের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানদণ্ডে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দাম্পত্য, পাতিব্রত্য, সতীত্ব, যৌনমূল্যবোধ এবং নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ। সেই সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনকে মেনে নিয়েই পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে যে নানাভাবে আত্মসমর্পণ করতে হতো সেই সত্যকে, কালকূট প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি জাতীয় ইতিবৃত্তের অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে নিজের আধুনিকমনস্ক মন ও দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত তাঁর 'মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া'-য় একটি বিশেষ মন্তব্য উল্লেখ করেছেন—

''পুরাণবৃত্তের পরিমণ্ডলে রেখে ইতিহাসের সেই কঠিন সত্যকেই

এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমরেশ। 'শাম্ব'তে যেমন সমরেশের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মানুষের আত্মবলে বলীয়ান হয়ে অগ্রগতির পথে অবিরাম এগিয়ে চলা, 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'তে মহাভারত কাহিনীর প্রেক্ষিতে জীবনের সত্যকে সন্ধান করা, আর 'প্রাচেতস'-এ ছিল পাপ ও পুণ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস—ঠিক তেমনই এই কাহিনীর মুখ্য অভীষ্ট হল—সামাজিক মাপকাঠিতে যা যৌননৈতিকতা—তার পুনর্মূল্যায়ন করা। আসলে এই সবকিছুর মধ্যে কোনো-না-কোনো জ্ঞানের অন্বেষণেই হচ্ছে কালকূটের এই ধরণের কাহিনীগুলির চূড়ান্ত অভীষ্ট।"[১৬৮]

কালকূট যাদবদের মথুরানগরে রাজা শূরসেনের রাজত্বকালে যাওয়ার পূর্বে পুরাণ পূর্ববর্তী যুগ সংহিতা যুগে পরিক্রমা করেছেন। এই যুগের বৈশিষ্ট্য কালকূটের ভাষায়—

''সংহিতা যুগের একটি বৈশিষ্ট্য দেখছি, আর্যদের জনসংখ্যা খুবই কম।... লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাজরীতি ও নীতির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। পরিবর্তনটা প্রধানত নানারকমের বিবাহ আর পুত্রোৎপাদন পদ্ধতি। সমস্ত রকমের দৈহিক মিলনকে, আর সেই মিলন সম্ভূত সন্তানদের বৈধ করণের জন্য, আট রকমের বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছিল। আর দ্বাদশ প্রকারের সন্তান জন্মকেও সমাজে স্থান দেওয়া হয়েছিল। অতিথির মনোরঞ্জনার্থে গৃহস্বামিনী আত্মসর্পণ করতেন। প্রত্যেক রমণীর ঋতু রক্ষা অবশ্য পালনীয়। কোনো রমণী কোনো পুরুষকে ঋতু রক্ষা করতে অনুরোধ করে যদি ব্যর্থ হতো, তবে সেই পুরুষ ভ্রূণহত্যা পাতকের জন্য নিরয়গামী হতো। যেমন, স্বামী অথবা নিকট সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়ার নির্দেশে, অনুবর্তন হলো ক্ষেত্রজ সন্তানের। রমণীগণ অনাবৃত ছিল। তারা ইচ্ছামতো গমন ও বিহার করতে পারতো। কারোর অধীনতায় তাদের কালক্ষেপ করতে হতো না। কৌমারাবধি এরা পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে আসক্ত হলেও অধর্ম হতো

না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হলো, বেদবিৎ মহাত্মারা এ কথাও বলে গেছেন, ঋতুস্নান থেকে ষোল দিনের মধ্যে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সংসর্গ করলে অধর্ম হয়।"[১৬৯]

অর্থাৎ এর একটিই মাত্র যুক্তি থাকতে পারে, যে, অন্য পুরুষে সংসর্গ সম্ভব কিন্তু অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ একেবারেই নিষিদ্ধ। ফলে কোনো ক্ষেত্রেই নারীর সতীত্ব, পদমর্যাদা, সমাজ প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হতো না। অর্থাৎ দৈহিক শুচিতা নিয়ে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। এই যুগে নরনারী নির্বিশেষে সবার কর্তব্য ছিল—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যাজন, যজন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, অলোভ, অনালস্য, অনসূয়া, ধৈর্য্য, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সরলতা, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, অপক্ষপাতিত্ব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, অসৎপরতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, শৌর্য, বীর্য, নির্ভিকতা। এর মধ্যে দৈহিক শুচিতা নিয়ে কোনো নির্দেশ ছিল না। সংহিতার যুগে একটা সময় কাল পর্যন্ত, নারী জাতির যৌন স্বাধীনতা পুরুষদের মতোই অবাধ ছিল। এই সময়টাই ইতিহাসের নিরিখে সমৃদ্ধ মাতৃতান্ত্রিক যুগ। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, পুরুষ যখন দৈহিক বলে বলীয়ান হয়ে, নানারকম সম্পদ আহরণ করতে শুরু করে তখন সেই সম্পদের দাবিদার নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। রমণীরা যখন তাদের সন্তানদের জন্য সম্পদের দাবি করলো, পুরুষ জিজ্ঞেস করলো, কে তোমার সন্তানের জন্মদাতা? তাই নিজ সন্তানের জন্য সম্পদ দাবি করতে হলে স্বেচ্ছাবিহারিনী নারীকে কেবল একজনেরই অঙ্কশায়িনী হতে হবে। লেখক জানাচ্ছেন মূলত পুরুষের দ্বারা অর্জন করা সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করেই বিবাহ প্রথার প্রচলন করতে হয়েছিল। আর নারীকে একজন মাত্র পুরুষের স্ত্রী হয়ে থেকে যেতে হলো। কিন্তু পুরুষ কখনও সে-জোয়াল নিজের ঘাড়ে রাখলো না। সে অন্যান্য রমণীকেও ভোগ করতে লাগলো এবং সকলের সন্তানকেই তার সম্পদের ভাগীদার হিসাবে মেনে নিল। অতএব এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন একদিনে হয়নি, বহুকাল লেগেছিল।

এই যুগ অতিক্রম করে শুরু হলো পৌরাণিক যুগের যাত্রা। কালকূট মনে করেন সেই অতিক্রমনের সময়টা, দ্বাপর ও কলি যুগের মতোই, প্রায় একশো বছরের কম ছিল না। পুরাণের ইতিবৃত্তে দেখা যাচ্ছে, দৈহিক শুচিতাই চরিত্রের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নারীদের ওপর বিধান লঙ্ঘনকারী শাস্তির প্রবর্তন ও পরিবর্তনের গৌরব বহন করেন, উদ্দালক ঋষিপুত্র

শ্বেতকেতু এবং সেই পরিবর্তনকে পরিশোধিত করেন দেবগুরু বৃহস্পতির ভাইপো, উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা। এক সময় পিতার সামনে থেকেই মাকে একজন তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, শ্বেতকেতু দারুণ ক্ষেপে গিয়ে নিয়ম করে দিয়েছিলেন—

> ''এখন থেকে যে রমণী ভর্তাকে অতিক্রম করে ব্যাভিচারিণী হবে, তার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাপ হবে। আর যে-পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্যাকে পরস্ত্রী রূপে সম্ভোগ করবে, তারও সেই পাপ হবে। আরও বিধান দিয়েছিলেন, যে-পত্নী স্বামীর দ্বারা পুত্র লাভে দায়ভাগিনী হয়ে, স্বামীর অবাধ্য হবে, তারও সেই পাপই হবে।''[১৭০]

বেদবিৎ জ্ঞানী জন্মান্ধ দীর্ঘতমার প্রতি পত্নী প্রদ্বেষী ভর্তার সম্মান দিতে না চাইলে, দীর্ঘতমা বলেছিলেন—

> ''আমি আজ থেকে পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করলাম, স্ত্রী জাতিকে যাবজ্জীবন কেবল মাত্র স্বামীর অধীন হয়ে থাকতে হবে। স্বামী বেঁচে থাকলে, বা মারা গেলেও, স্ত্রী পুরুষান্তর ভজনা করলে, তিনি অবশ্যই পতিত হবেন। আর পতিহীনা নারীদের প্রচুর সমৃদ্ধি থাকলেও, তা ভোগ করতে পারবেন না।''[১৭১]

এখানেই সংহিতা যুগ থেকে, পুরাণের যুগ শুরু হয়েছে। পণ্ডিতেরা সংহিতা আর পৌরাণিক কাল দুটিকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সংহিতা যুগেরও পরের কাল। যা পৌরাণিক কাল হিসেবে চিহ্নিত। যেখানে মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র শুরু হচ্ছে ধীর গতিতে। যেমন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী নিজের চোখ আবৃত রাখতেন, কারণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কখনও তিনি স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া প্রকাশ করবেন না। কিন্তু পৌরাণিক যুগের আগের ঘটনা, প্রদ্বেষী চোখ আবৃত না করায় তিনি স্বামীর প্রকাশ্য ব্যভিচার দর্শনে অসূয়া প্রকাশ করেছিলেন। পৌরাণিক কালের, দ্বাপরের একেবারে শেষ দিকেই লেখকের যাত্রা পথ। 'মহাভারত' পুরাণ কালের রচনা সেই হেতু পৃথার মতো নারী চরিত্রের জটিলতাকে কালকূট এক সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আলোচনা করতে চেয়েছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পঞ্চপাণ্ডবের জন্মেরও আগের কালে তিনি বিচরণ করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই যদু

বংশের রাজা শূরের আমলে তিনি পৌঁচেছেন।

কালকূট আগেই উল্লেখ করেছেন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী যদৃচ্ছাগামিনী ছিল, তাতে কোনো দোষ হতো না। কিন্তু এই ব্যবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটল, তখন পুরুষ তার ক্ষমতাবলে নারীর যৌন স্বাধীনতা হরণ করে নিলো। অথচ নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখলো। কিন্তু নারীকে বন্দী করে রাখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে নারীকে যৌনাচারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কুন্তী নিজে কন্যকাবস্থায় গর্ভবতী হয়েছিলেন। তাঁর সেই কানীন পুত্র মহাবীর কর্ণ। যার জন্মের পরে ইতিহাসের কাহিনিতে আর কোনো কানীন পুত্রের সংবাদ নেই। তেমনি মহাভারতের যুদ্ধের পরে, কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মের পরে আর কোনো ক্ষেত্রজ পুত্রের সন্ধান নেই। যার থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়, সমাজ থেকে এই সমস্ত প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। লেখক এই সমস্তর অনুসন্ধান করেছেন কারণ পৃথার জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তার সামাজিক মূল্যায়ন। এই সামাজিক মূল্যায়ন ব্যতীত পৃথা তথা কুন্তীর জীবনের সমস্ত ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি চাননি কোনো রকম অযৌক্তিক বা অলৌকিক ভাব উপস্থিত হোক। তাই প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ নারীর অন্যতমা কুন্তীকে সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে চারিত্রিক দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অন্য চার প্রাতঃস্মরণীয়া নারী সত্যযুগের সীতা, মন্দোদরী, অহল্যা ও তারার যুগ সত্যের বিচারে তাদের চরিত্র ধর্মকে প্রকাশ করে কালকূট মহাভারতের যুগের দুই নারী কুন্তী ও দ্রৌপদীর সময়ে উপস্থিত হন। যাত্রা করেছেন কুন্তীর জন্মলগ্নে। পৃথার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে, সেই সব ঘটনার সঙ্গে যুগ ও কালের মহিমা একান্ত ভাবে যুক্ত। তাই এই পথ পরিক্রমায় অলৌকিক অবাস্তবকে কালকূট ত্যাগ করে সত্যের পথে চলতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন কুন্তী নিজে কানীন পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদাত্রী, যার মধ্যে কোনোরকম অলৌকিক মহিমা ছিল না। কিন্তু তার সন্তানদের জন্মবৃত্তান্তের ওপর অবাস্তবতার ধুলি আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে এতকাল। কালকূট বিভিন্ন সম্ভাব্য যুক্তি দিয়ে মিথকে ভেঙে এক নতুন মাত্রা বিন্যাস করতে চেয়েছেন। যদুবংশীয় রাজা শূরের পুত্রের নাম বসুদেব, কন্যার নাম পৃথা। ছিলেন অপরূপা সুন্দরী, রাজা কুন্তিভোজ তাঁর এই পালিতা কন্যার উপরই রাজগৃহে আশ্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন। কুন্তী ছিলেন দীর্ঘ নয়না, রূপ- যৌবনশালিনী, স্ত্রী-সুলভ গুণবতী, গম্ভীর স্বভাবা, মহাব্রতা ও ধর্মশীলা। সুতরাং অনেক নৃপতিই এই তেজস্বিনী নারীকে পত্নীরূপে পাবার জন্য

বিশেষ উৎসুক ছিলেন। কালকূট এখানে বলেছেন, কিন্তু কুন্তী কী পালিতা কন্যা হিসাবে সুখী হয়েছিলেন? বরং বালিকাবস্থা থেকেই তিনি অসুখী। কারণ সারা জীবন কখনও ভুলতে পারেন নি, তিনি তাঁর নিজের পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে কখনও চঞ্চলতা প্রকাশ পেত না বরং পিতৃমাতৃ স্নেহ বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেটি হলো, তাঁর অনন্য মনোভাব। যৌবনেই তিনি ক্রমে একটি জটিল নারী চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন অথচ অন্যান্য বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করে, তাঁর চরিত্রের জটিলতার দিকটিকেই নানাভাবে আবৃত করে রাখা হয়েছে। শৈশবের দুঃখই তাঁকে অন্য কন্যাদের তুলনায় আলাদা করে তুলেছিল। এছাড়া পৃথাকে দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করার পরে রাজা কুন্তী ভোজের সন্তানাদি হয়েছিল, যে কারণে কুন্তীই তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও, কুন্তী অনেক বয়সে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকে বলেছিলেন—

> ''আমি দুর্যোধনকে বা নিজেকে দোষ দিই না। আমার পিতাকেই আমি নিন্দা করি। বদান্যরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তি যেমন নিজের ধন অপরকে অক্লেশে বিলিয়ে দেন, আমার পিতাও সেইরকম আমাকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে সমর্পণ করেছিলেন। আমি শৈশবে যখন কন্দুক্রীড়া (পুতুল লাটিম খেলা) করতাম, তখনই তোমার পিতামহ, আমার পিতা তাঁর সখা রাজা কুন্তিভোজের হাতে আমাকে দত্তক কন্যারূপে সম্প্রদান করেন। হে পরন্তপ, (কৃষ্ণ) সেই আমি পিতার দ্বারা পিতৃস্নেহে বঞ্চিত...''[১৭২]

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে, সেই বয়সেও পৃথা পিতৃস্নেহ বঞ্চনার কথা ভুলতে পারেন নি। এই ঘটনা তাঁর চরিত্রকে অনন্যতা দান করেছিল। যা অস্বীকার করা যায় না। সখীদের সঙ্গে নানা রহস্যালাপ করলেও তাঁর চরিত্রের একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তিনি সহজে নিজের রসসিক্ত মনকে সকলের সামনে খুলে ধরতেন না। এই কুন্তী যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন অন্যান্য অনেক মুনিদের মতো কুন্তী ভোজের গৃহে মুণি দুর্বাসা অতিথি হয়ে এলেন। কিন্তু রাজা তো ভারতের নানা স্থানে অনেক ছিলেন হঠাৎ কুন্তীভোজের কাছেই বিশেষ করে এলেন কেন? সম্ভবত কোপন স্বভাবের, সুপুরুষ, তীব্র তেজস্বী, তপধ্যায়শীল, মহাতপস্বী দুর্বাসা জানতেন যে, কুন্তীভোজের গৃহে রয়েছে একটি পরমা রূপসী কন্যা, যে মুনি-ঋষিদের

সেবায় বিশেষ যত্নশীলা। অতএব তাঁর মতো একজন পরম রূপবান, সূর্যসদৃশ তেজস্বী মহর্ষি কেনই বা কুন্তীর সেবা গ্রহণ করবেন না। কুন্তীও নিশ্চয়ই এই ঋষিকে পূর্ব হতেই চিনতেন তাই অনায়াসেই সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি পালক পিতাকে বলেছিলেন, যে কখনও ওঁর সেবায় ত্রুটি হবে। যা করলে উনি সন্তুষ্ট হবেন, তাই হবে।

দুর্বাসা প্রায় একবছর কুন্তীর সেবা গ্রহণ করে, সুখী হয়ে ফিরে যাওয়ার সময়, তাঁকে বর দিলেন এবং ইচ্ছে মতো দেবগণকে আহ্বান করার জন্য মন্ত্র দান করেন। এই মন্ত্রের দ্বারাই কুন্তী যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করবে। সেই দেবতা সকামী বা অকামীই হোন মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের মতো বশবর্তী হবে। এখানে এসে, কালকূটকে সত্যর সন্ধানে যেতে হচ্ছে কারণ এই 'বর দান' তথ্যটিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ইতিবৃত্তের পাতায় পণ্ডিতবর্গ কুন্তী চরিত্রকে মিথ্যায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। কুন্তী ও সূর্যের মিলন সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই গর্ভধারণের মতো অবাস্তব অলৌকিকত্বকে তাঁর প্রমাণ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য কালকূট এই কাহিনিকে ভ্রান্ত মনে করে ইতিবৃত্তের ধুলাচ্ছন্ন পাতার অন্তরাল থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। পৃথা চরিত্রকে পরিপূর্ণ তুলে ধরতে, মহিমান্বিত করে বলেন—

> ''বাস্তব ইতিবৃত্তে যাঁরা বিশ্বাসী, এবং প্রকৃতই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যেও নানা কৌতূহল ও ইচ্ছা জাগে, অথচ তার জন্য তাঁরা সমস্ত রকম দায় দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারা, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। নারীকে যাঁরা নিতান্ত দেহ শুচিতার বিচারে কেবল পুত্রোৎপাদনের যন্ত্র মনে করেন, তাঁরাই ঐ সব অলৌকিক অসম্ভব ব্যাপারকে লোক মধ্যে প্রচার করে, মানুষকে সত্য সন্ধানে বঞ্চিত করেন।''[১৭৩]

লেখক কুন্তীর সেই আরাধ্য পুরুষটিকে সন্ধান করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন, ইতিবৃত্তের অস্পষ্টতায় সূর্যসম বহ্নিকান্তিমান পুরুষ হলেন কুন্তীভোজের গৃহে আগত অতিথি দুর্বাসা। যাঁর সঙ্গে কুন্তীর দেহ মিলন ঘটে। ইতিহাসে সুস্পষ্ট রূপে কিছুই বলা নেই। এই অবস্থায় লেখক স্বর্গলোকের এক রাজ্যের অধিপতি সূর্যকে, অশ্ব নদীর তীরে কুন্তীভোজের রাজ্যে এসে দেখার চেষ্টা করেছেন, ইনিই কুন্তীর সেই প্রার্থিত পুরুষ কিনা। তিনি আবার এও বলেছেন আকাশের সূর্য কিন্তু সেই সূর্যসম তেজকান্তিময় পুরুষ নন। শেষপর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন

যে—

> ''ইতিবৃত্তের অস্পষ্টতায় যা আমি চাক্ষুষ করতে পারছি না, তা হলো তাঁর এই প্রিয় সূর্যসম ব্যক্তিটি কে? স্বয়ং দুর্বাসা? অথবা স্বর্গরাজ্যের এক অধিপতি সূর্য? আমার নিজের মনে একটি বিহবাস নানা কারণেই জন্মেছে। কুন্তীর সেই পুরুষ স্বয়ং দুর্বাসাই ছিলেন। নানা যুক্তি দিয়েও, এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।''[১৭৪]

এরপর এ ঘটনার জন্য কেন ভবিষ্যতে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগনের মধ্যে গণ্য হন তার ব্যাখ্যা কালকূট দিয়েছেন। মূলত কুন্তীর, এই ঘটনা পরবর্তী জীবন জটিলতাতেই প্রাতঃস্মরণীয়া হওয়ার কারণ নিহিত। কুমারী অবস্থায় পুরুষের যৌন সাহচর্য ভোগ করার মতো সাহস তাঁর ছিল। কিন্তু নতুন যুগের প্রভাবে, কুমারীর গর্ভাধান সমাজে দোষণীয় বলে কুন্তীকে কানীন পুত্র সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কোনো সন্দেহ নেই, কুন্তীর জীবনে এই সন্তানধারণ যেমন সুখের হয়েছিল, সামাজিক কারণে সন্তানকে ত্যাগ করা ততোধিক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। কালকূট জানিয়েছেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিরথ সূতের রাজ্যান্তবর্তী চম্পানগরীতে কানীন পুত্রকে কুন্তী পাঠিয়েছিলেন। যেমন আকাশের সূর্য নেমে এসে কুন্তীকে গর্ভবতী করতে পারে না, তেমনি কুন্তীর বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও পুত্র স্নেহের কথা মনে রেখে বিশ্বাস করতেই হয়, তিনি গর্ভধারণ থেকেই সন্তানকে রক্ষার বিষয়ে নানা চিন্তা করে রেখেছিলেন। যার মধ্যে কোন অলৌকিকতার আশ্রয় তিনি নেন নি। কালকূট দেখেছেন অধিরথ হলেন ধৃতরাষ্ট্রের সখা এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচয় সূত্র ধরেই, রাজা কুন্তিভোজের সঙ্গে অধিরথেরও পরিচয় হবার সুযোগ থাকে। আর তাই যদি ঘটে থাকে তাহলে কুন্তীর সঙ্গে অধিরথের নিশ্চয়ই পরিচয় ঘটেছিল। বরং ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে বিবেচনা করলে এই পরিচয়ের ঘটনাটিই অতি বাস্তব হয়ে ওঠে। যার ব্যাখ্যা দিয়ে কালকূট বলেন—

> ''কুন্তী চর প্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হলেন। এ কথার একটিই অর্থ, তিনি তাঁর শিশুপুত্রটিকে, একান্তই ভাগ্যের হাতে জলে ভাসিয়ে দেন নি। বরং দীর্ঘকাল চিন্তার পরে, একটি বিষয়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কুন্তীর নিজের উদ্যোগে, সদ্যোজাত শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে যত্নের সঙ্গে অধিরথের নিকটে পাঠানো হয়েছিল।

> কুন্তী যেমন পুত্রবৎসল ছিলেন, তাঁর পক্ষে এটা করাই সম্ভব ছিল। তাছাড়া আমি আগেই দেখেছি, দাসদাসী, ভৃত্যসকল তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিল। লোকবলও তাঁর ছিল। বিনা তত্ত্বাবধানে, নিশ্ছিদ্র একটি মঞ্জসী মধ্যে, সদ্যোজাত শিশুকে জেনে শুনে তিনি একলা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন নি।"[১৭৫]

কালকূট মনে করেন বিশিষ্ট কারিগরকে দিয়ে, পৃথা যে নৌকা অর্থাৎ মঞ্জুষাটি তৈরি করিয়েছিলেন তা ছোট ছিল না। মঞ্জুষাটি জনহীনও ছিল না, তাতে অবশ্যই চালকের অবস্থান ছিল। শিশুটির রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য চালকের ওপরই দায়িত্ব ছিল। ভবিষ্যতে প্রিয় পুত্রের পরিচয়ের সুবিধার জন্য, অভিজ্ঞান স্বরূপ কবচ ও কুণ্ডল সঙ্গে দিয়ে দেন। কর্ণ বড় হলে সেই কবচকুণ্ডলের দিব্যলক্ষণ দ্বারা, কুন্তী তার পুত্র কর্ণকে রঙ্গভূমিতে চিনতে পারেন। কর্ণকে দুর্যোধন রঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করালে পরম স্নেহে, গোপনে, মনে মনে কুন্তী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। অলৌকিতার পরিমণ্ডলকে সরিয়ে কালকূট কুন্তী চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে তাঁর বাৎসল্য ও দায়িত্ব সচেতনতাকে তুলে ধরে এক স্বতন্ত্র কুন্তীকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কর্ণের জন্মরহস্য সম্বন্ধে কিছুটা জনশ্রুতিও প্রচলিত ছিল। অধিরথ যেমন সব সত্য জানতেন, তেমনি ব্যাসদেব, ভীষ্মদেব, বাসুদেব কৃষ্ণ এঁরা তিনজনেই সমস্ত বিষয়টি জানতেন। কিন্তু তখন পৌরাণিক যুগের সূচনা হয়ে গেছে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় লেখক দেখছেন কুন্তী সেই সূর্য সদৃশ রূপবান ঋষি দুর্বাসাকে সেবা করে নিজে সুখী ছিলেন এবং দুর্বাসাকেও সুখী করেছিলেন। এরই পরিণতি স্বরূপ কর্ণের মতো পুত্র লাভ। কিন্তু কালকূট অনেকবার উপলব্ধি করেছেন, কুন্তী কন্যকা জীবনে দৈহিক সুখ যেমন পেয়েছেন ঠিক তেমনি সন্তান ত্যাগ করতে গিয়ে দুঃখ পেয়েছেন। কুন্তীর নারী জীবনে বৈচিত্র্য এটাই। কালকূট মনে করেন যে পঞ্চকন্যাকে নিয়ে আমাদের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে গর্ববোধ করেছে, তাঁদের মধ্যে কুন্তীর জীবনই যেন সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুঃখী।

কুন্তীর সেই জীবনে এবার যাত্রা করেছেন কালকূট। কুন্তী তাঁর পরবর্তী জীবনে যখন কৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, শৈশবে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চনা দিয়েই তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল তখন আরও কয়েকটি কথা বলেছিলেন। যেখান থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কুন্তী তাঁর পরবর্তী জীবনে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহকে জীবনের চরম লাঞ্ছনা মনে করেছিলেন।

কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তিনি শ্বশুরকুলেও ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। শ্বশুরকুলের কথা বলতে গিয়ে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণর সামনে আর স্বামী পাণ্ডুর কথা উল্লেখ করেন নি। প্রথম জীবনে, কন্যকাবস্থায় পুত্র লাভ ও পুত্রকে ত্যাগ করা, কোন কথাই লজ্জায় বলতে পারেন নি।

ইতিহাসে কিমদ্দক ঋষির এক অযৌক্তিক কাহিনির অবতারণা করে দেখানো হয়েছে অভিশাপের কারণে পাণ্ডু সহবাসে অক্ষম। লেখক এই অপরাগতাকে তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে অভিশাপের ঘটনাটি হয় প্রক্ষিপ্ত অন্যথায় পণ্ডিতেরা কুরুবংশের রাজাকে ক্লীব দেখাতে চান নি। তাই এমন এক কাহিনি সত্যকে আড়াল করতে অবতারণা করা হয়েছে। কুন্তীকে বিবাহের কিছু পরে পাণ্ডু পাঞ্জাব দুহিতা মাদ্রীকে বিবাহ করেন। ইতিহাস অলক্ষ্যে থেকে নীরবে প্রমাণ দিচ্ছে যে পাণ্ডু অভিশপ্ত হওয়ার আগে দুই স্ত্রীকে গর্ভবতী করার মতো সময় অনেক পেয়েছিলেন, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। তাই ভবিষ্যতে 'শ্বশুরকুলের লাঞ্ছনা' বলতে কুন্তী ভীষ্ম, বেদব্যাসকে, যুদ্ধ বা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য দায়ী করেন নি। শ্বশুরকুলের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকেও ধরা হয়। এঁরা প্রত্যেকেই জানতেন, পাণ্ডুর বিবাহ অনুচিত, স্ত্রী গ্রহণ করা নিষ্ফল হবে। এসব জেনেও তাঁরা পাণ্ডুকে কুন্তীর স্বয়ংবর সভায় যেতে কেন নিষেধ করেন নি বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে শল্য ভগ্নী মাদ্রীরও ক্ষতি করেছিলেন। দ্বিগবিজয় করা সত্ত্বেও দুই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার পরিবর্তে পাণ্ডু বনবাস জীবন বেছে নিলেন। যেখানে কালকূট দেখছেন পাণ্ডু কুন্তীর কাছে সত্য প্রকাশ করে বলছেন, তিনি সহবাসে অক্ষম, তাই বৃথাই তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করা। অতএব শতশৃঙ্গ পর্বতে দুই স্ত্রীকে নিয়ে তপস্যায় জীবন যাপন করতে চান। তবে কুন্তী ও মাদ্রীকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে না। এর পরেই ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির সহ পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে দীর্ঘতমা ও ঋষি শ্বেতকেতুর বিধান অনুসারে কানীন পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র জন্ম দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের কেউ মেনে না নেয়, সেই আশঙ্কার বশেই হয়তো পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর কোনো সন্তানাদি হবে না, উপরন্তু হস্তিনায় তাঁকে দেখতে হবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কুরু সিংহাসনে বসেছে। তার চেয়ে বনগমন শ্রেয়, সেখানেই ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে হবে। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্য শতশৃঙ্গ পর্বতে যেতে হলো কেন? দেখা যাচ্ছে যেখানে অনেক মুনি ঋষিগণ তপস্যা করতেন, পাণ্ডু তাঁদের

কাছে সহায়তা চাইলেন যে, তাঁরা যেন ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে সম্মতি দেন, এটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁরা পাণ্ডুর মনের বাসনা জেনে নির্দেশ দেন যাঁর পুত্র নেই, তিনি পিতৃঋণে আবদ্ধ থাকেন অতএব পিতৃঋণ শোধের জন্য পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্তব্য।

ব্রাহ্মণেরা যখন ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের নিদান দিলেন তখন পাণ্ডুর মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলো না। কিন্তু কুন্তী নিজে কানীন পুত্রের জন্মদাত্রী উপরন্তু তিনি জানতেন সমাজে সেটি গর্হিত অন্যায়, সেই কারণে তিনি পুত্র স্নেহ থেকে বঞ্চিত, ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনও অনুচিত। পাণ্ডু কুন্তীকে সংহিতা যুগের কথা শোনালেন, যখন নারী পুরুষ যদৃচ্ছা স্ব স্ব জাতিতে মিলিত হলে কোনো দোষ হতো না! উত্তর কুরুতে (সাইবেরিয়ায়) এখনও সেই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। সব শেষে তিনি তাঁর নিজের জন্ম কথা শোনালে পর কুন্তী সম্মত হলেন। শুধু সম্মত হলেন না তার সঙ্গে তিনি জানালেন কন্যকাবস্থায় ঋষি দুর্বাসার কাছ থেকে সেবার ফল স্বরূপ বর প্রাপ্তির কথা। কিন্তু কর্ণের জন্মের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি। এই খানে এসে লেখক ইতিহাসের ধুলিচ্ছন্ন পাতা সরিয়ে আবিষ্কার করছেন কুন্তীর জীবনে বড় বেদনাদায়ক দুই বিপরীত ধর্মী ঘটনা। এক কন্যকাবস্থায় পুত্র জন্ম দিয়ে তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে এবং দুই স্বামী বর্তমান থাকলেও, অন্য পুরুষের দ্বারা তাঁকে গর্ভধারণ করতে হচ্ছে।

ইতিহাসের পাতায় নানা কথার সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তা সব সময় সত্যও নয়। কুন্তী পাণ্ডুর অনুরোধ রক্ষার্থে ক্ষেত্রজ পুত্রের জননী হতে স্বীকৃত হয়েছেন ঠিক কথা কিন্তু পুরুষ নির্বাচন ছিল তাঁরই ইচ্ছাধীন। দেখা যাচ্ছে কুন্তীর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হচ্ছে ধর্মের অংশে, কে এই ধর্ম? কালকূট দেখছেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব দাসীর গর্ভে পুত্রের জন্ম দিয়ে তার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করছেন—''হে কল্যাণী! তোমার গর্ভে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসছেন, তিনি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ধর্মাত্মা হবেন। ... এ পুত্র ধর্মার্থকুশল, ধীমান, মেধাবী, মহামতি, সুক্ষ্মদর্শী, স্থিরমতি পুরুষ।''[১৭৬]

এই ধর্মজ্ঞকে কেউ কখনও অধর্ম আচরণ করতে দেখে নি। কুন্তী এই পুরুষটির প্রতি একদিক থেকে মনে মনে আসক্ত ছিলেন। এই ধর্মাত্মা ধর্নুবেদ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্রো এবং ইতিহাস পাঠ, সব বিষয়েই বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন, এই পুরুষের নাম বিদুর। ইনিই ধর্ম। ইতিবৃত্তের প্রচ্ছন্ন ধারাকে যারা বুঝতে অক্ষম তাদের কাছে ধর্ম যে বিদুর, এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু বহু ঘটনার দ্বারা এটি স্পষ্ট। কুন্তী তাঁর এই দেবরকে 'খণ্ডা' বলে সম্বোধন

করতেন। শূদ্রা জননীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তানকে বলা হয় 'পারসব'। 'পারসব' বলেই রাজ্যে বিদুরের কোনো অধিকার ছিল না। কুন্তী সমস্ত বিষয়েই বিদুরকেই তাঁর একমাত্র সহায় বলে জানতেন। বিদুরকেই কালকূট যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে বলেছেন—

> ''যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র বলে খ্যাত। বিদুরও ধর্মের অংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছিলেন। এখানে ধর্ম ধর্মে লীন হয়েছে বটে। আমি দেখছি পিতা পুত্রের দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন।... অতঃপরেও কেউ কেউ কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের মিলনে, যুধিষ্ঠিরের জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন সংকেত যারা বুঝতে পারে না, তারা অলৌকিক কিছু ছাড়া জীবনকে ভাবতে পারে না। তারা জ্ঞানকে বিসর্জন দেয়। অজ্ঞতাকে ভক্তিবলে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়।''[১৭৭]

পরবর্তীকালে ইতিহাসের ওপর যাঁরা কলম চালিয়েছেন তাঁরা তাঁদের সম-সাময়িক সমাজের কথা ভেবে, প্রকৃত ঘটনার ওপর কতগুলো অলৌকিক কাহিনি আরোপ করেছেন। কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্রের কাহিনিকে এমন এক অলৌকিকতা দান করেছেন যেন ওসব দেবদেবীর ব্যাপার। সাধারণ নরনারীর জীবনে ওসব ঘটতে পারে না। কুন্তীর জীবনের বৈশিষ্ট্যই হলো, সংহিতা যুগের নারীর জীবনে যা ঘটতো, তাঁর জীবনে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। সেজন্য গোপনীয়তার প্রয়োজন হয়তো ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক সব সময়েই সেই গোপনীয়তার মধ্যে সত্যের একটি সংকেত দিয়ে রাখেন। এখানে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্তের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, যথা—

> ''যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা হিশেবে বিদুরকে নির্দেশ করার ব্যাপারটি অবশ্য কালকূটের নিজস্ব ভাবনা নয়। ইরাবতী কার্ভে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তাঁদের গবেষণার সূত্রে নানা যুক্তি পরম্পরার মাধ্যমে ঐ বক্তব্য সম্পর্কে নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করলেও, একটি উপন্যাসধর্মী লেখায় সেই প্রসঙ্গ অবতারণ করার এই ব্যাপারটি অবশ্যই অভিনব সংযোজন। এদিক থেকেও কালকূট পুরাণ কথাকে ভেঙেছেন কথাসাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এসে।''[১৭৮]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কুন্তী সকলেই অরণ্যে জীবন পথে

'যতিধর্ম' অবলম্বন করে বনবাসী হয়েছিলেন। একদিন দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডবেরা গুরুজনদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন সেখানে নগ্ন-কৃশ, বনের লতাপাতায় ঢাকা বিদুরের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়। বিদুর যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সংযুক্ত করে, যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে, ইহলীলা সম্বরণ করেন। পুত্রের মধ্যে পিতার অনুপ্রবেশের এই বিষয়টি মূল মহাভারতের আলোকে প্রাপ্ত। প্রাচীন ভারতের এটি একটি গুহ্য সাধনা। উপনিষদে একে বলে 'সম্প্রত্তি'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়, পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁর প্রাণ সমূহ নিয়ে পুত্রের শরীরে প্রবেশ করেন। উপনিষদে উক্ত যথা—''অথাতঃ সম্প্রতির্যদা ও স যদৈবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি।''[১৭৯] মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে স্বয়ং ধর্ম, বিদুর হয়ে জন্ম নেন। তাই আশ্রমবাসিক বেদব্যাস বলছেন যিনি ধর্ম, তিনিই বিদুর, যিনি বিদুর তিনিই যুধিষ্ঠির।

কুন্তী ভেবেছিলেন, পাণ্ডু একটি পুত্র পেয়েই সুখী হবেন। কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল, নিজের ক্ষেত্রে, সন্তান লাভ করা। কিন্তু আঁতুড়ে যুধিষ্ঠিরকে দেখা মাত্র তাঁর আর একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো। তবে এরপর ভীম ও অর্জুনের জন্মের ক্ষেত্রেও কুন্তী কোন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেন নি। চিরাচরিত যে সমস্ত কাহিনি জনসমাজে অতি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে এখানেও কালকূট সত্যের পথ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি জানালেন বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বারা, অথবা নর-নারায়ণের দ্বারা, ভীম-অর্জুনের জন্মদান বিষয়টি তাঁর একটি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বলেই মনে হয়। কারণ স্বর্গের অন্যতম স্থান থেকে বায়ু দেবতার পক্ষে শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে কুন্তীর সঙ্গে মিলন সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নর-নারায়ণ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পরিপূরক এবং সম-সত্তা-সম্পন্ন এক মানুষ ও অধিকতর শক্তিশালী মানুষ। সুতরাং এই প্রসঙ্গটিকেও কালকূট প্রক্ষিপ্ত মনে করে, সিদ্ধান্তে আসেন—

> ''শতশৃঙ্গ পর্বতে অনেক বিদ্বান বিচক্ষণ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ঋষিরা ছিলেন। তাঁদেরও কুন্তীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। ... শতশৃঙ্গেরই কোনো অমিত বলশালী ঋষিই কি ভীমের পিতা? ... কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের জন্মের ইতিহাস অনুযায়ী, সম্ভবত শতশৃঙ্গের কোনো অমিত বলশালী, বিদ্বান, ঋষিকেই কুন্তী আহ্বান করেছিলেন..। কুন্তী ইতিপূর্বে, অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেন নি। ... তৃতীয় পাণ্ডব

> অর্জুনেরও সম্ভবত কোনো বিশিষ্ট ঋষি পুরুষের, যিনি ব্রাহ্মণ পরশুরামের মতোই ছিলেন অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, ঔরসে জন্ম হয়েছিল। কুন্তী যাঁকে শতশৃঙ্গ পর্বতেই দেখেছিলেন।... পরবর্তীকালে, পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে, শতশৃঙ্গের ঋষিরা যে ভাবে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের হস্তিনায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সংকেত রয়েছে।"[১৮০]

এভাবেই কালকূট ইতিবৃত্তের ধূলাচ্ছন্ন পাতা সরিয়ে নতুন ইতিবৃত্তের সন্ধান দিয়েছেন।

তিনটি সন্তান জন্ম দেবার পরেও পাণ্ডু আর একবার কুন্তীকে নিয়োগ করে সন্তান চেয়েছিলেন। কিন্তু কুন্তী অসম্মত হয়েছিলেন। কারণ ধর্মবেত্তারা ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মের ব্যাপারে নারীর চতুর্থ পুরুষ সহবাসকে স্বৈরিণী এবং পঞ্চম পুরুষ সংসর্গকে পতিতা বলে গণ্য করেন। এখানে লেখক নারী হৃদয়ের চাপা পড়া বেদনাকে পরিস্ফুট করেন কুন্তীর মনে মধ্যে একটা বড় কষ্ট ছিল। তিনি জানতেন যে, প্রথম পুরুষ সংসর্গে তাঁর কুমারীত্ব অটুট থাকলেও, চারজন পুরুষের সংসর্গ তিনি করেছিলেন। তাই অন্তরে তিনি স্বৈরিণী ছিলেন, এবং তা যতকাল প্রকাশ করতে পারেন নি, মনের মধ্যে কষ্ট পেয়েছেন।

এই কুন্তী রঙ্গভূমিতে কবচ কুণ্ডলীধারী কর্ণকে দেখা মাত্র চিনতে পেরে এবং দুই পুত্র কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হতেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। অর্জুন সূতপুত্র কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি না হলে, দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তার লজ্জা দুর করলে, কুন্তী মনে মনে গভীর আনন্দ পান। কিন্তু কুন্তীই পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ রক্ষার কারণে কর্ণের কাছে দারস্থ হন। কর্ণও তাঁর বেদনা উপলব্ধি করেন নি, তার পক্ষে দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব। তবে একথাও জানান তিনি কুন্তীর অনুরোধ রক্ষা করবেন। অর্জুন ভিন্ন অন্য তার ভাইকে সামনে পেলেও হত্যা করবে না। কিন্তু অর্জুনকে রেহাই দেবে না। যদি অর্জুন নিহত হয়, তাহলেও কুন্তী পাঁচ পুত্রের জননী। আর যদি কর্ণ নিহত হয় তাহলেও পাঁচ পুত্রেরই জননী হয়ে থাকবে।

যুদ্ধ শেষ! কর্ণের মৃত্যুর পর কুন্তী আর স্থির থাকতে পারলেন না, সকলের সামনেই সূর্যসম কর্ণকে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে স্বীকার করে তিনি ভারমুক্ত হলেন। অরণ্যবাসের কালে তপস্বিনী কুন্তী ব্যাসদেকেও জানিয়েছিলেন যে কুমারী কালে নিতান্ত দুর্বুদ্ধিবশত সন্তানকে

নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন যা তিনি দুর্বাসা মুনির বরে লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের এটাই বিস্ময়, এবং কুন্তী চরিত্রেরও। তিনি যে কথা বহুকাল গোপন করে ছিলেন, তা প্রকাশ করলেন সর্ব সমক্ষে। এখানেই তিনি মহৎমহিয়সী। ব্যাসদেব বললেন, এই স্বীকারোক্তিই সমস্ত অপরাধ ধুয়ে দিয়েছে।

কুন্তীর বাৎসল্য প্রেম শুধুমাত্র কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন এই চার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাদ্রী গর্ভজাত নকুল ও সহদেবের প্রতিও ছিল তার বিগলিত মাতৃস্নেহ। সারাজীবন দুঃখ যার সঙ্গী সেই কুন্তী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-বিদুর প্রমুখরা যখন বনবাসে যাচ্ছেন, তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে গমন করলেন। বাণপ্রস্থে যাবার প্রাক্কালে দ্রৌপদীকে বলতে ভুললেন না—সহদেবকে সস্নেহে রক্ষা করার কথা।

'পৃথা' উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে কুন্তীকেই মহাভারতের মহানায়িকারূপে কালকূট চিত্রায়িত করেছেন, যেটা চিরাচরিত পুরাণ কথা বর্হিভূত ভাবনা। মহাভারতের মিথে কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে বারবার নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে ঠিককথা, কিন্তু মূল কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে পুরুষেরাই। কালকূটের এই কাহিনিতে 'পৃথা'-ই হলেন মুখ্য চালিকাশক্তি। কুন্তীর সামগ্রিক জীবনের আলেখ্যে কালকূট অভিভূত। তাই পৃথার শেষ অধ্যায়ে এসে, প্রেম-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতায় বিহ্বল লেখক তাঁর প্রাণঢালা আর্তি নিয়ে উচ্চারণ করেন—

> ''ইতিহাসের পাতায় কী ঐশ্বর্যময়ী রমণী-চিত্র অঙ্কিত। সারাজীবনের দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙে পড়েন নি এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণ ত্যাগ করছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে। যিনি প্রেম কি তা জেনেছেন কিন্তু সারা জীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে, তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে। পৃথা! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।''[১৮১]

ঘ. স্মৃতিপটে বিচিত্রের উদ্ভাষ :

কালকূটের রচনাবলীতে যেমন দেখা মেলে তীর্থপট, নানা জনপদ, শৈলশহর এমনকি সমুদ্র সৈকত তেমনি এর পাশাপাশি বিচিত্র ভ্রমণ কথারও দেখা পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম

হল স্মৃতি ভ্রমণ। কখনও বা নিকটবর্তী কোথাও হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার আনন্দ। কিছুটা ভিন্ন স্বাদের রচনা হল 'হারায়ে সেই মানুষে' ও 'মন মেরামতের আশায়' গ্রন্থটি। যেখানে বিচিত্রের সন্ধান মেলে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় কিছুটা এই রকম—

> ''দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি পাড়ি দিয়েছেন... ডেকেছে তাঁকে পাহাড়, ডেকেছে সমুদ্র, নদী। গহনে অথবা গহীনে... জটিল অরণ্যে বারে বারে বাউলের একতারা বাজিয়ে ডাক দিয়েছে... তিনি অধীর পথ পাগল পথিকের মতো ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন... আরেক চাবি দিয়ে খুলে দিয়েছেন আরেক দরজা। নিয়ে গেছেন অন্য জগতে। কিন্তু সে সবই দেশ থেকে দেশে যাত্রা... এ গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ে চলা। 'হারায়ে সেই মানুষে' সেদিক থেকে বলা যায় কাল থেকে হারিয়ে যাওয়া অন্য এক কালের দিকে যাত্রা।''[১৮২]

হারায়ে সেই মানুষে : (১৯৭১)

কালকূটের মানসপটে তাঁর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের দিনগুলি এই উপন্যাসে টুকরো প্রতিফলন রূপে ফুটে উঠেছে। এখানে পটভূমি হল পূর্ববঙ্গের বুড়ি গঙ্গা নদী, গ্রাম, হাট, মাঠ ও ফেলে আসা কত মানুষের স্মৃতি, যা এখনও অমলিন হয়ে আছে। স্মৃতিচারণায় একটি কিশোরের বেড়ে ওঠা সময়ের তালে তালে কাহিনির গতি প্রসারিত হয়েছে। এই কিশোর চরিত্রের নির্মল ভাসমান রূপ মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'-র তারাপদকে কিম্বা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথকে বা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপুকে। এই রচনাটিতে কালকূটের শৈশবের মাধুর্য মণ্ডিত কিছু ঘটনা স্মৃতিচারণায় ভেসে উঠেছে। যেটা তাঁর কাছে ক্ষণিকের জন্য শৈশবের মানস ভ্রমণ গল্প হয়ে উঠেছে। ফলে এটাকে ঠিক মন চলো যাই ভ্রমণে বলা যায় না। কালকূটের ভাষায় চলো রে মন, মনে মনে। এই ভ্রমণ ঠিক চলতে চলতে দেখতে দেখতে না। বরং দেখে আসা, ছেড়ে আসা, সেই সে নিকুঞ্জে, যেথায় মন বিরাজ করে স্মৃতির ঘরে। তবে বলা চলে সেও এক ধরণের ভ্রমণ। যদিও এখানে ঠিক অকূলে পাড়ি দেওয়া, ঘাটে ঘাটে কৌতূহলী মন নিয়ে ফেরা, নগর মানুষের কথা বলা, মনের এই ভ্রমণ যাত্রায় সেটা সম্ভব নয়। তাই মন শুধু আপন মনে চলেছে ছেড়ে আসা কালের এক

পুরনো পরিচ্ছেদে।

এই যাত্রাপথের কাহিনিতে লেখকেরই আত্মজীবনীর স্মৃতি উঠে এসেছে। ঢাকার এক নম্বর ওয়ার্ডের গলি, পঁচিশ নম্বর জীয়স লেন থেকে বারো বছর বয়সে লেখক দিদির শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন জিনারদি স্টেশন পেরিয়ে। বিয়ের ছ-মাস পরে দ্বিতীয় যাত্রায় দিদি ও ভগ্নীপতের যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল সবচেয়ে কনিষ্ঠতম এই ভাইটি। সেই প্রথমবার যাত্রায় মূলস্থানে পৌঁছাতে বালককে একটু বেশি মাত্রায় কায়িক পরিশ্রম সহ্য করতে হয়। যদিও সেখানে থাকাকালীন সময়ে নানা রকমের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আনন্দ বিস্ময়ে সময় কেটে যায়। সেখানে অবারিত আকাশ, মাঠ-ঘাট, সব মিলিয়ে এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁর শৈশব মনে বিস্ময় জাগে তালুই মশাইয়ের (জামাইবাবুর বাবা) কী করে দু'জন মাউই মা (দিদির শাশুড়ি) হতে পারে। আবার দিদির ভাসুরঝি, বছর দশেকের হেলেনের কেন ঈর্ষা হয় প্রতিবেশিনী সোরির সঙ্গে একটু বেশি বন্ধুত্ব হলে। দিদির শ্বশুড়বাড়িতেই ছিল রেণু আর আট বছরের গান্ধী, তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে যায় অনায়াসে। ন-বছর বয়সে লেখক বালক বয়সে নিজের বাড়িতে যাকে গৃহশিক্ষক পেয়েছিলেন সেই যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তার একমাত্র দিদির বিয়ে হয়েছিল। পরে বারো বছর বয়সে যিনি ভগ্নীপতি হন। দিদির শ্বশুড়বাড়িতে কত কী দেখার ছিল। ছিল তাঁতঘর, তামাক তৈরির ব্যবস্থা। সারাদিন সোরি, হেলেনদের সঙ্গে খেলা করে, কখনওবা কুলের আচার রোয়াইল খাওয়া চলতো। আবার সুরেনদার সঙ্গে হাটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, সবসুদ্ধ অন্যরকম পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। তবে বালকের মন খেলার থেকেও বেশি আকৃষ্ট হয় মাঠ-ঘাট বনে ঘুরে বেড়াতে। তাই সোরির দাদা মাখন বিলে নৌকা বাইতে যাওয়ার কথা বললে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

সুরেন দাদার সঙ্গে মাধবদীর বিরাট হাটে গিয়ে এই বালকের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে জামাইবাবুর ভাই বীরেনদার দোকান কিন্তু হাটের কোথায় শুরু, কোথায় শেষ সে কিছুই বুঝতে পারে না। সকলেই শহরের এই নতুন মানুষটির নাম জিজ্ঞেস করছিল। তাদের আতিথেয়তাও ছিল গ্রামের মানুষের মতো সহজ, সরল। এদের মধ্যে কেশবঠাকুর বলেছিলেন এ ছেলের চোখ যেন কথা কয়, নিশ্চয়ই গান গাইতে জানে। তাঁর মনের ভাব একে পেলে যাত্রা পালায় আসর জমবে ভালো। কেশবঠাকুরকে তার ভালো লেগেছে। তারও মনের ইচ্ছা ওঁর সঙ্গে চলে যায়, যাত্রা গান করে। কিন্তু বালকের মন, এক জায়গায় বাঁধা পড়ে

না। তাই সবাই যখন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন বাইরের হাজার হাজার লোকের স্রোত তাকে যেন হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। দর্জির দোকান, কাঁসা-পিতলের দোকান, বড় বড় পাটের আড়ত, গরু আর মানুষের ভিড়ের মাঝে কোথায় সে যেন হারিয়ে যায়। শৈশব থেকেই বোহেমিয়ান স্বভাবের লেখক বেদেনিদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এক অনাবিষ্কৃত অভিজ্ঞতা ও মন্ত্র মুগ্ধ সম্মোহনের কারণে, বেদেদের সান্‌কিতে করে মুলোকাছিমের মাংস দিয়ে ভাত খেতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এখানেই সুরেনদাদা ও চৌকিদার এসে তাকে ধরে ফেলে। বেদেনিদের পয়সা দেওয়ার কথা সে সারি বেদেনির ইশারাতে অস্বীকার করেছিল। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল— ''যাবার আগে, সারির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। চোখ নাচিয়ে হাসলো। ওরে বালক, তুই সেই চিরদিনের পুরুষ। প্রকৃতির কাছে যার বয়স দিয়ে হিসাব হয় না। মিথ্যা বলে, নষ্ট হলি, না ভ্রষ্ট হলি, সে বিচারের ভার রইলো ভবিষ্যতের হাতে।''[১৮৩]

বাড়িতে ফিরে গিয়ে গুরুজনদের বকুনির সঙ্গে বালককে সেদিন দিদির মার খেতে হয়েছিল। হেলেনকে শোনাতে হয় কালোনাগের গল্প। সব মিলিয়ে বালকের কপালে জুটেছিল বেদেনি সারি প্রেমের চরম দুর্ভোগ।

দিদির শ্বশুরবাড়ির গোটা গ্রামে প্রায় সবার সঙ্গেই বালকের ভাব হয়ে গিয়েছিল। এমনকি মুসলমান পাড়াতেও সেই কদিনেই তার পরিচয় ঘটে অনেকের সঙ্গে। তার মধ্যে কেরালি ভালো বন্ধু হয়। ওদের বাড়িতে গেলেই মুরগির ডিম- সেদ্ধ বাঁধা ধরা ছিল। ইতিমধ্যেই অনেকের বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। নৌকা বাওয়ার পাশাপাশি ধনুক-ঘুড়ি ওড়ানোও শেখা হয়ে গিয়েছে। তারপর জামাইবাবুর দিদির ছেলে গোপাল ওকে প্রাকৃতিক কর্ম করতে গিয়ে প্রথম বাড়ির বাইরে নিয়ে যায় এবং সিগারেট খাওয়া শেখায়। আবার সিগারেট খেয়ে লটকন চিবোলে গন্ধ থাকে না এও শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এত সাবধান হয়েও গান্ধী গোপালের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুরেনদাদাকে দিয়ে দেয়। ফলে গোপালের জোটে বেদম মার।

এই সবের মধ্যে ঘনিয়ে আসে ঢাকায় যাওয়ার দিন। সকলের আদরে আর কান্নায় সে বিদায় নিয়েছিল। এমনই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কিছুদিনের জন্য আসা বালক অতিথি যে, প্রীতি-মমতা-মান-অভিমান খুনশুটির মায়াজাল তৈরি করেছিল মাত্র কয়েকদিনে। ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন পরে, তালুইমশাইয়ের একটা চিঠি এসেছিল। সেই দিনের

সেই চিঠি এবং বর্তমান স্মৃতিচারণায় লেখকের স্বীকারোক্তিটি হল এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

> ''এক জায়গায় আমার কথা লিখেছেন : 'আমার পুত্রা, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রটি, আমাদের পরিবারকে এবং গ্রামকে হাসাইয়া মজাইয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। গৃহ বড় শূন্য বোধ হইতেছে। আমার নাতি-নাতিনী সকল তাহাদের মামার কথা বলিতে গিয়া কান্নাকাটি করে। গ্রামের ছেলেরা গৃহস্থেরা আসিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে। উহার অভাবে আমরা, সকলে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেছি।'... সেকথা মনে করে আজ আমারও তালুইমশাইয়ের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করছে ? 'সেই সময়ে, সেই বয়সে, এই বালক মজে নাই কাঁদে নাই। সে আপনার বেগে ভাসিতে ভাসিতে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার বেগ বাহিরে স্তিমিত হইয়াছে, ভিতরে বাড়িয়াছে। সে নিজেকে প্রশমিত করিতে পারে না। তথাপি আজ মনে হইতেছে, জীবন-ফসলের শীর্ষে, একটি শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে।''[১৮৪]

এই প্রসঙ্গে আর একটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়, যার নাম 'মন মেরামতের আশায়'। 'হারায়ে সেই মানুষে' ছিল পূর্ব বাংলার পটভূমিতে রচিত। তেমনি আবার 'মন মেরামতের আশায়' হল পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তের একটি গ্রামের ছবি। আগেরটি যেমন ছিল নদী-মাঠ-ঘাটের রঙিন স্মৃতি আলেখ্য। এখানে আমরা দেখি রুক্ষ পরিবেশে ম্লান মৃত্তিকার প্রেক্ষাপটে জীবন সঙ্কটের চালচিত্র। তাই স্মৃতি চারণার অভিজ্ঞতা নয়, বাস্তব অভিঘাত লেখকের পরিণত মনকে ভাবায়। এখানে চরিত্রের নিদারুণ সংগ্রাম তার অসহায়তা লেখককেও যেন অনেকখানি অসহায় করেছে।

মন মেরামতের আশায় : (১৯৭৬)

১৩৮৩ সালের নববর্ষ সংখ্যা 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে 'মৌসুমী প্রকাশনী' থেকে 'বাঁশীর তিন সুরে' নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ উপন্যাসেও কালকূটের ভ্রমণচারী মনের ডানায় কাঁপন লেগে মন হয়েছে উড়ু উড়ু। তবে এবারের যাত্রাটা একটু ভিন্ন রকমের। তাই কাজের মাঝে অবসরে লেখকের মনে হয় আর দেরি না করে চলো যাই ভ্রমণে। ঘরের বাইরে একটু পাক দিয়ে ঘুরে আসা। খানিক চড়ুই ওড়া, পায়রার পাখা ঝাপটানোর তালে, কিঞ্চিৎ মাঠের ধুলো উড়িয়ে বেড়িয়ে আসা ।

এবারে তিনি বর্ধমানের কাছাকাছি রসুলপুর -এর ভেতর এক গ্রামে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যেখানটায় লেখক আরামে শান্তিতে একটা দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। তাই হেমন্তের পাতাঝরা দিনে, মাঠে উত্তরে বাতাসের মত্ততা আর পাকা ধানের আঘ্রাণ নিয়ে তিনি যখন নির্দিষ্ট গ্রামে পা রাখলেন তখন প্রাক মধ্যাহ্নে কৃষক মজুরদের সাথে জোতদার কেদারদাদুর ধান্যেশ্বরী সেবা এবং জামাইয়ের বন্ধু হিসাবে লেখককেও জামাই সম্বোধন, এসমস্ত কিছুই তাঁকে এক সহজ আনন্দ দেয়। বন্ধুর শ্বশুরমশাই হলেন হরেন ঘোষাল। ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এক নিপাট ভালো মানুষ। তাঁরই কন্যা পুষি অর্থাৎ পুষ্পর সাথে লেখকের বন্ধুর বিয়ে হয়েছে। ভদ্রলোক বিপত্নীক এবং তাঁর সব কটি সন্তানই মেয়ে, ছেলে নেই।

গ্রামে ঢোকবার মুখে দ্বিধা বিভক্ত দুই রাস্তা। মাঝখানে চণ্ডীতলার বড় বটের গোড়া বাঁধানো। বাঁদিকে একটি বড় পুকুরের পাশ দিয়ে যে রাস্তা ভিতরে ঢুকেছে তার দুপাশেই বাড়ি, বাঁশ বাগান, আম জাম কাঁঠাল গাছের নিবিড় ছায়া। বেশ কয়েকটা ছোট বড় পুকুর এখানে ওখানে। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ার মতোন ভাঙা পুরনো পাকা বাড়ি আর মন্দির। মন্দির থেকে একটু এগিয়েই ঘোষাল বাড়ি।

লেখককে প্রথম অভ্যর্থনা জানান স্বয়ং ঘোষাল মশাই এবং তাঁর হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যা। কিন্তু প্রবেশ মাত্রই বাড়ির রীতি অনুযায়ী মন্দিরে জগদ্ধাত্রীকে প্রথমে প্রণাম জানাতে হয়। তারপর এক এক করে পূর্ব পরিচিত সানুদি, বৃদ্ধা পিসি, বড় ঘোষালের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বন্ধুর শ্বশুর ঘোষাল মশাই-এর দুই কন্যা নিমু আর অমু, এবং বিধবা দিদিকে নিয়ে সংসার। ঘোষাল মশাই-এর বাড়িতে লেখককে পরিচর্যার ভার পরে বড় ঘোষালের মেয়ে সানুদির ওপরে। তার বয়স অনুর্ধ তিরিশ। লেখক ঘোষাল মশাই-এর মুখে শুনেছেন পঁচিশ বছরের মেয়ে, বাপের ঘরে এখনও জীবন কাটাচ্ছে। ঘোষালের মন্তব্যে লেখকের কৌতূহল বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে জানতে পারেন বিয়ের তিন রাত্রি কাটতে না কাটতে

সানুদি তাঁর স্বামী এবং সৎ শ্বাশুড়ি দ্বারা বিতাড়িত হন। যদিও দশ বছরের মধ্যে ওর স্বামী একবার নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু দু'দিন পরই আবার ওকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। বড় ঘোষালের অসময়ে বাউরি পাড়ায় গিয়ে মাতাল হয়ে আসা এবং অশালীন ও অসংলগ্ন জনিত কথাবার্তা লেখককে পরিবেশ ও পরিবারের প্রতি বিরূপ করে না তুললেও সানুদির জীবনের বাস্তবতার কথা শুনতে শুনতে তাঁর কাছে, আকাশের নীল ছটা, হলুদ গরম রোদের মধুর উত্তাপ, ধান সেদ্ধর গন্ধ, মরাইয়ের গর্বিত চেহারা, লাউমাচার সবুজ সবই যেন তাঁর কাছে ম্লান ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। লেখকের বক্তব্য-সানুদিই বা তাঁর অধিকার ছেড়ে দেবেন কেন? যার ভাই পলেটিক্স করে, সে-ই বা ভগ্নির এমন দুর্দশা মেনে নিচ্ছে কেমন করে? এমনই আরো জিজ্ঞাসা মনের ভিতর উঁকি দেয়। অন্যদিকে নিঃসীম নির্জনতায়, বিজন প্রান্তরে, পুকুরে একা সাঁতার কাটার বিরল সৌভাগ্য, যত্নের সঙ্গে সানুদির খাবার পরিবেশন, এবং খেতে খেতে দেখা, লাউমাচায় প্রজাপতির ওড়াউড়ি, ফুলে ফুলে মৌমাছিদের গুঞ্জন, এবং উত্তরের পাঁচিলে বসে থাকা বুলবুলির গা ফোলানো সমস্ত কিছু তাঁর মনকে ভরিয়ে তোলে তৃপ্তির আস্বাদে।

তারপরে সানুদির জীবন ধারণের জন্য সাংসারিক কাজ ব্যতীত কিছু আয়ের জন্য হাঁস পালন, ছাগল পরিচর্যা করে দুধ ও ডিম বিক্রি করার ব্যবস্থা লেখকের মেরামতি মনকে বিকল করে দেয়। সানুদি শহরে গিয়ে কাজ করার মতো লেখাপড়া শেখে নি, না হলে সে শহরেই চলে যেতো। লেখকের মনে শীতের উদাস বেলায় মন-ভারাক্রান্ত করে ছায়া ঘনিয়ে ওঠে কিছু কথা ভেবে—

> ''সানুদির বয়সটার কথা ভোলবার নয়। নিজের আয়ের যা হোক কিছু দুঃখের ভাতেও তার নাতিদীর্ঘ শরীরের ঔজ্জ্বল্য চাপা পড়েনি। উদ্ধত না হলেও, তার স্বাস্থ্যের দীপ্তি চোখে পড়ে, হাসিটি এখনো অম্লান, এখনো চোখের তারায় ঝিলিক। দীর্ঘশ্বাসগুলো প্রাণের কোথায় চাপা আছে? এখনো সে যে কুমারী।''[১৮৫]

কলকাতায় গেঞ্জি কলে চাকরি প্রসঙ্গে সানুদির জিজ্ঞাসা লেখকের কাছে, 'ভয় তো নষ্ট হয়ে যাবার, তাই না'? কালকূট জবাব দিতে পারেন না। তিনি ভাবেন—

> ''পঁচিশ বছরের একটি মেয়েকে অনায়াসে তরুণী বলতে পারি।

বিবাহ না হবার দুঃখ বুঝতে পারি। কিন্তু পাট চুকেছে, অথচ পালন হলো না কিছুই। নতুন করে আর কোন কালে এক্ষেত্রে হবেও না। বিহিত আছে কিছু? ঘর নেই, বর নেই, একটি স্বাস্থ্যবতী শ্রীময়ী রমণী, শেয়াল তাড়াতে ছোটে। শ্যামের পোড়োয় ছাগল চড়াতে যায়। সানুদি নষ্ট হচ্ছে কি না জানি না। সংসারে কোথাও কিছু কি নষ্ট হচ্ছে না?"[১৮৬]

শীতের ছায়া নিবিড় বেলায় নিরু আর অমু স্কুল থেকে ফিরে এসে লেখককে নিয়ে শুক্লাপক্ষের দ্বাদশীতে সাঁকোর ধারে বেড়িয়ে আসার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব হয় তেমনি সানুদির প্রতি তাদের বিরূপতাও লেখকের চোখ এড়ায় না। বাইরে বেড়িয়ে লেখকের মনে হয় যে পাড়াগাঁ এখনও আছে, কারণ এমন এক জ্যোৎস্না রাতের আলোয়, নিবিড় ছায়ায়, ঝিঁঝির ঐকতানে সবই স্বপ্নের মতো অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু নিরু যখন সমস্ত লজ্জা ছেড়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরে তখন গান শেষ হবার আগেই, সাঁকোর ওপরে খাকি প্যান্ট শার্ট পরা চার সাইকেল আরোহী গতি মন্থর করে কয়েক পলক দেখে, দ্রুত গ্রামের দিকে চলে যায়। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন একটা অশুভ সূচনার যেন ঈঙ্গিত থেকে যায়। লক্ষ করেন নিরু আর অমুর ভয়মিশ্রিত উৎকণ্ঠা কিন্তু কিছু বোঝার আগেই নিরু ও অমু লেখকে একা রেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায়। ফলে লেখক কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা ফেলেন।

শিবের পুকুরের উত্তর তীরের কাছাকাছি আসতেই তেঁতুলতলার কালো ছায়ায় সানুদিকে দেখতে পেয়ে যান। কিন্তু এখানেও লেখক পরিস্থিতি ঠিক মতো বোঝার আগেই সানুদি ঘোমটা টেনে দিয়ে, লেখকের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে নিজের বর তো কোনোদিন নিয়ে গেল না। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন উত্তর দেন, ঘোষাল বাড়িতে বউ নিয়ে চলেছেন, তাহলেই কাজ হবে। লেখক চলেছেন সানুদি হাত ধরা হয়ে পুকুর ধার দিয়ে, কিন্তু ভেতরের অন্ধকারে আবর্তিত হতে থাকে নানারকম জিজ্ঞাসা। এরমধ্যেই জ্যোৎস্নারাতে বাউরি পাড়া থেকে ভেসে আসে ভাঙচুর আর চিৎকারের আওয়াজ। জিজ্ঞেস করাতে সানুদি জানায় মন্দির পার হয়ে সব জানাবে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে খাকি পরা এক সাইকেল আরোহী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবেন? নাম কী? লোকটির ঘন ঘন দৃষ্টি শুধু সানুদির ওপর। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে লেখক গম্ভীর হয়ে বলেন সঙ্গে ওনার স্ত্রী। আপনি কে জানতে

পারি?' লোকটিও তখন একটু ধাতস্থ হয়ে জানায় সে আবগারি ইন্সপেক্টার, দেশে এমন ভদ্রাভদ্র লোকের অভাব, বাড়ি-বাড়িতে চোলাই মদের ব্যবসা। মেয়েরাও বাদ যায় না।

সানুদি আর দেরি না করে লেখকের হাতটা জোড় করে ধরে বাঁশ ঝাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং সংক্ষিপ্ত পথে বড় ঘোষালের নাচ দুয়ারে এসে ঘোমটা খুলে সানুদি যা জানায় তা অত্যন্ত করুণ। হাঁস ছাগল পালন করে তো আর পেট চলে না, তার ওপর বাবার সংসারটাও একটু আধটু দেখতে হয় বৈকি। হয়তো স্বামীর ঘর করলেও দেখতে হতো। তাই নিজের খরচেই গোবরা বাউরির বাড়িতে চোলাইয়ের কাজ করে, বাড়তি আয়ের জন্য। এসব বলতে বলতে সানুদির চোখে কোথাও জল নেই, কিন্তু মুখে এক অপরিসীম অসহায় লজ্জার ছাপ থেকে যায়। সে অনুরোধ জানায় এসব কথা পুষির বর অর্থাৎ লেখকের বন্ধু যেন না জানতে পারে।

রাত্রে খাবার সময় লেখক নিরু আর অমুকে ছোটবার কারণ জিজ্ঞেস করায় ষোলো বছরের নিরু যা উত্তর দিল তা অকল্পনীয়—''কী করব বলুন! এই কাজের জন্যে সানুদির মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু নিজেরই দিদি তো!''[১৮৭] লেখকের মনে হলো তাও তো বটে। তাহলে এই কী তাঁর মন মেরামত? যার জন্যে কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ ভাবে বোধ হয় সংসারের কোথাও মন মেরামত হয় না। লেখক দেখছেন, ভেতরটা একেবারে বিকল হয়ে গিয়েছে। আর চোখের সামনে বার বার সানুদির মুখটা ভেসে উঠেছে।

ঙ. জনপদের জীবন :

বিশেষত কালকূট সাহিত্যে আমরা লক্ষ করি যে তাঁর জনপদ অভিজ্ঞতা, শহর ও নগরকে কেন্দ্র করে, মানব চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলিকে অনুসন্ধানে প্রসারিত হয়েছে। এই পটভূমিতে লিখিত তাঁর উপন্যাসগুলিতে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত নাগরিক জীবন-সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে বিষাক্ত বাতাবরণ ঘণীভূত হয়ে উঠছে তা তিনি সুনিপুণ মুন্সীয়ানায় পাঠকের সামনে তুল ধরেন। বলতে গেলে তা বেদনাতুর চরিত্র অঙ্কণের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য অবদান। মানব হৃদয়ের সুতীক্ষ্ণ বেদনাকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন কয়েকটি শিক্ষিত নারী ও পুরুষের মাধ্যমে। যাদেরকে আবর্ত করে কালকূট বেদনা মিশ্রিত জীবনের সার্বিক উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি বেদনাকে উপলব্ধি করে, চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়ে,

নিজের বেদনার অভিজ্ঞতাকে একীভূত করে কাহিনির রূপায়ণ করেছেন। ফলে চরিত্র বিশ্লেষণ করতে করতে কোথায় যেন কালকূটের জীবন রূপের একটি অস্পষ্ট ছায়া পাঠক মনেও সহসা জেগে ওঠে। আর তাই চরিত্রায়ণের নিপুণতার মধ্য দিয়ে জনপদ অভিজ্ঞতায় বর্ণিত তাঁর উপন্যসগুলি সাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

সুতীক্ষ্ণ বেদনার তীব্র জ্বালা থেকেই একাকিত্বের আনন্দকে অনুভব করা যায়। আর সেই আনন্দ অতিক্রম করে লেখক সত্ত্বাকে সুদূরের যাত্রী করে তোলে। অজানা অসীম নিঃসীম লক্ষের প্রতি মনের যে গতির চলন, সেই সত্ত্বাই, পথে প্রবাসে যন্ত্রণায় ব্যাকুল চরিত্রগুলির আর্তিকে স্পর্শ করে যায়। বিশিষ্ট সমালোচক শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে জানান—

> ''... বেদনা বিধুর জীবন থেকে নিজের জীবনকে খুঁজে ফেরার যে তাগিদ, এই তাগিদের মধ্যেই আনন্দের বীজটি সূক্ষ্মাকারে নিহিত থাকে। তাই নিজের জীবনের সঙ্গে, সৃষ্ট চরিত্রের জীবনের সাদৃশ্য লেখককে ভাবায়, ভোলায় ও আনন্দ দেয়। হৃদয়ের অকুণ্ঠ সহানুভূতিতে ও সমবেদনায় জরিত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলি।''[১৮৮]

লেখক তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করেছেন যে, বয়ে যাওয়া চরিত্রগুলির পশ্চাৎপটে সমাজের অসহিষ্ণু সংস্কার যতখানি তাদের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, সেই তুলনায় তাদের প্রতি ক্ষমা দৃষ্টির বা স্নিগ্ধ সহানুভূতির কিছুমাত্র বর্ষিত হয়নি। আর এই অসহিষ্ণুতার বিচারে লেখক মনে করেন নারী পুরুষ উভয়েই সমানভাবে দায়ী। লেখক যেন আমাদেরকে সমাজ কাঠামোর ভেতরকার নিদারুণ ক্ষয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। দেখিয়ে দেন কীভাবে বিষাক্ত জীবানু সমাজে সংক্রামিত হয়ে প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই আবারও বলতে হয় জনপদ অভিজ্ঞতায় যেভাবে সুশিক্ষিত সভ্য সমাজকে কালকূট অপূর্ব কৌশলে তুলে ধরেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। জনপদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে সৃষ্ট কালকূটের চরিত্রগুলিকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে যে গ্রন্থগুলির নাম নেওয়া যায়, সেগুলি হল—

১. পর্বতের উদাও মহিমার কাছে কালকূট বিমুগ্ধ আকর্ষণ বোধ করেন। আর এরই টানে তাঁর দার্জিলিং পরিক্রমা। দার্জিলিং ভ্রমণ থেকেই তিনি যে গ্রন্থটি লেখেন সেটি হল—'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে' ১৯৬৫ কালকূটের জীবন সম্বন্ধে বিস্ময় এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২. একই ভাবে সিকিম পর্যটন থেকে উৎপন্ন হয়েছে—'তুষার সিংহের পদতলে' ১৯৭৬

৩. বোম্বাই শহরের পটভূমিকায় আমরা যে দুটি গ্রন্থকে পাই, সে দুটি হল—''আরব সাগরের জল লোনা' ১৯৭২ ও 'মিটে নাই তৃষ্ণা' ১৯৭৬

৪. দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত হয়েছে—'অমৃত বিষের পাত্রে' ১৯৭২

৫. কলকাতার পটভূমিতে কালকূট রচিত করেন যে গ্রন্থটি, তার নাম—'পিঞ্জরে অচিন পাখি' ১৯৮২

৬. পুরীর সমুদ্রসৈকতের পটভূমিতে রচিত হয় 'নির্জন সৈকতে' ১৯৬২।

অমৃত বিষের পাত্রে : (১৯৭২)

উপন্যাসটি প্রকাশ পায় ১৩৭৮ সালের 'দেশ' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায়। আর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৭৯ সালের ১লা বৈশাখ। প্রকাশক 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড'। ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে আরো দুবার বইটি মুদ্রিত হয়। এর কোনো উৎসর্গপত্র নেই।

নির্বাসন তো মনেই সম্ভব। মন নিয়ে যাও বনে। কিম্বা চালান দাও পাহাড়ে সমুদ্রে, যে কোনো নির্জনে। মনকে বলো, মন চলো যাই নির্বাসনে। সব ছেড়ে সমাজ সংসার বন্ধু, যত ভালোলাগা ভালোবাসা, নিবিড় করে নিয়ে থাকা, আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছায় উদ্বেল পাওয়া না পাওয়া, সব কিছু ছেড়ে মন নির্বাসনে থাকো। বধির হও, অন্ধ থাকো, অনুভূতিকে রাখো মুড়ে জড়ত্বের মধ্যে। যা শোনবার জন্য শ্রবণ উন্মুখ, তা শুনি না। যা দেখবার জন্য চোখ ব্যাকুল, তা দেখি না। অনুভবের নাম হোক অচল নগর। সেখানে হাসি কান্না, সব খেলা বন্ধ। কাজ অকাজের সব পাট তোলা থাক। এই হবে মনে মনে নির্বাসন। তা এমনই এক, মনের নির্বাসনে লেখক কালকূট চলেছেন ভারতের রাজধানী শহর দিল্লিতে। লেখকের বাস্তব চিন্তার অলিগলিতে রয়েছে কেবল বিষের তিক্ততা, অতৃপ্তির বেদনা। নগরের বাঁধা জীবনকে, নগরের মধ্যেই নির্বাসনের তাগিদে তিনি হাজির হয়েছেন দিল্লী নগরীতে। লেখকের এই যাত্রার আকাঙ্ক্ষায় একমাত্র সান্ত্বনা—''আমার সারাজীবন কেবল 'হা-অমৃত'! করে ফেরা। এই যে নির্বাসনে যাওয়া, এই যাওয়াও তা-ই। নির্বাসন—অমৃতের তিয়াষায়।''[১৮৯]

এই বারের যাত্রার জায়গাটা লেখকের কাছে অচেনা না। পুরনো পরিচয় আছে। তবু এবারের আসাটা, 'চলো দিল্লি পুকারকে'র মতো না। এবার একেবারে নিঃশব্দে, চোখের

আড়াল দিয়ে পুরনো পরিচয়ের সূত্র বাদ দিয়ে তিনি একটি ধর্মীয় সংস্থা পরিচালিত আর্ন্তজাতিক আবাসনে ওঠেন। কিন্তু যথাসাধ্য গোপন করতে চেয়েও তাঁর অবস্থান গোপন রাখা সম্ভব হয় না। সাংবাদিক বাঙালি বন্ধু সুবন্ধু তাঁর হদিস পেয়ে যান। সুবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী সুজাতার আন্তরিক আতিথ্যগ্রহণের পাশাপাশি কালকূট পরিচিত হন হেনা, রঞ্জিতা রিজভি, রঞ্জিতার মার্কসবাদী বন্ধু এ্যান্টনী, হৃদয়নাথ প্রভৃতির সঙ্গে।

যখন কোন শিল্পীর হাতে নির্দিষ্ট একটি চরিত্রে ফোকাস প্রতিফলিত হয়, তখন সেই ফোকাসের তীক্ষ্ণ আলোয় আমরা সেই চরিত্রটির বিষামৃতে জর্জরিত অবস্থা দেখে আমরাও ব্যথিত হয়ে উঠি। যদিও এই কারুণ্যের জন্য উক্ত চরিত্রের প্রতি করুণতা প্রকাশ পেলেও, সেই চরিত্রের কিছু যায় আসে না। এমনই এক নির্দিষ্ট অসাধারণ চরিত্রের দিকে শিল্পী লেখক কালকূট ধীরে ধীরে আলোকের রশ্মি ফেলে তাঁর সেই পাঠকদের চরিত্র অনুধাবন করান। তাঁর 'অমৃত বিষের পাত্রে'—নামক গ্রন্থেও লেখক দেখান কীভাবে একটি চরিত্রের মধ্যে বিষ ও অমৃত দোলাচল সৃষ্টি করে। তাই এই কাহিনিটির প্রাণ কেন্দ্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন রঞ্জিতা রিজভী নামে এমন এক নারী চরিত্র যিনি সিন্ধুর মেয়ে, সাহিত্য করে, নাটক লেখে, গবেষক, রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী, মদ্যপান করে, দিল্লির রিজভি বিবি এককথায় বলা চলে রূপে রঙে হাস্যে লাস্যে অগ্নিশ্বরী। এই চরিত্র বিশ্লেষণে লেখকের রচনার নিখুঁত শৈলী, যা কোনো নীতির দ্বারা তাড়িত হয়নি। অপ্রিয় সত্যকে জানাতে বিধি নিষেধ পরোয়া না করে, তাঁর বৈচিত্র্যের পিপাসা মিটিয়েছেন।

অমৃতের ডালি নিয়ে বিষের পাত্রে যে চরিত্ররা বিরাজ করে, 'অমৃতের বিষের পাত্রে'—সেই চরিত্র এক নারী চরিত্র। এই নারী এক যন্ত্রণাকাতর দুঃখী সত্তা। যে পাপ-পুণ্যে, ভোগ-ত্যাগে, কাম-প্রেমে সর্বোপরি বিষামৃতে জর্জরিত। যার রূপে স্বস্তি-শান্তি-স্নিগ্ধতা ধরা পড়ে না। অথবা গায়ে লেগেছে যার আগুন, যে ছুটে চলেছে মাঠের বুকের বাতাসে। ওকে দেখে মনে হয়, আলোর ছটায় রঙে ঝলমল করছে। অথচ হঠাৎ যেন অন্ধকারের গ্রাসে ডুবে যাচ্ছে। 'বিধ্বংসী আগুন আর সমুদ্রের প্লাবণ' যেমন মানুষকে মেরে ফেলতে পারে ঠিক তেমনি এক চরমতম বহিঃপ্রকাশের নাম হলো রঞ্জিতা রিজভী। এই প্রগল্‌ভা, যৌবনোদ্ধতা, লাস্যময়ী রঞ্জিতার বিসজর্জর জীবনে কালকূট অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের পর এই চরিত্রটি সম্বন্ধে লেখকের ধারণা, রঞ্জিতার জীবনটা ছেলেবেলা থেকেই নানান ধাঁধায়

জট পাকিয়ে গিয়েছে। পারিবারিক জীবনটা খুব সুস্থ ছিল না। অথচ মায়ের জবরদস্ত একটা পরিচালনা ছিল, যার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে বিরোধ, কিন্তু লড়ে উঠতে পারেনি। ফলে ভিতরে ভিতরে দানা বেঁধেছে প্রতিবাদ প্রতিবাদ। আর সমাজ পরিবার পরিবেশ বন্ধু, সকলের সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অস্থির চিত্ত রঞ্জিতা বিয়ে করেন মুসলিম এক প্রফেসর রিজ্‌ভিকে। দিল্লিতে হিন্দু মেয়ের মুসলমানকে বিয়ে করাটা অপরাধ, তখন চলতি প্রবাদের মতো কথাটা প্রচলিত ছিল। রঞ্জিতা নিজে সুখী হয়নি বা রিজভিকেও সুখী করতে পারে নি। রিজভিকে বিয়ে করাটা ওর কাছে ভীষণ অন্যায় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু অন্যায়টা ঠিক রিজভি মুসলমান বলে নয়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন পণ্ডিত মানুষ রিজভিরই জীবনটা নষ্ট করা হয়েছে। এই প্রতিবাদগুলো ওকে ভাবিয়েছে। ভেতরের প্রতিবাদগুলোর কেবলমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না, বেদনাও ছিল। যে সব অপমান ওকে ছেলেবেলা থেকে সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য লুকিয়ে অনেক কাঁদতে হয়েছে। সেই অপমান ব্যথা এবং কান্না থেকে যে ভাবনা জন্ম নিয়েছে, পরবর্তীকালে তাই ওর শিল্পসাধনার নিজস্ব রূপ। বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, তার চেয়ে গভীরতর ওর মনের ভাবনা। অথচ ভুগছে একটা তীব্র অর্থ-হীনতায়। তারও কারণ আছে, ওর অগ্নিশ্বরী রূপ, দুরন্ত যৌবন—এসব ওর জীবনের চার পাশে ডেকে নিয়ে এসেছে অনাচারের অন্ধকার। ওর মা তার জন্য অনেকখানি দায়ী। অন্ধকারের পথে তিনি অনেকখানি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই একান্ত মূঢ় অন্ধকার থেকে রঞ্জিতা ওর নিজের শক্তিতেই ফিরে এসেছে। ওর আজকের জীবনটা সম্পূর্ণ আলোকময় না হলেও, যে অসহায় মূঢ় অন্ধকারে নারী কেবল একটা শিকার মাত্র, তা ও নয়। জীবনে স্নেহ ভালোবাসা পায়নি বলে তৃষ্ণা ওর প্রবল। পেতে চাওয়াটা তীব্র। আর এই না পাওয়াটাই ওর চরিত্রে এনেছে যত অসাম্য, নানা বিপরীত সংঘর্ষ।

লেখকের সঙ্গে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র রঞ্জিতা রিজভির পরিচয় ঘন-সন্নিবদ্ধ হতে থাকে। লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখায়। আর সেই লেখার সাথেও পরিচয় আছে রঞ্জিতা রিজভির। যিনি নিজেও হিন্দী সাহিত্যের লেখিকা এবং বিতর্কিত এক মহিলা চরিত্র। সেই রঞ্জিতা, লেখককে চিনেছে তার নানান বিপরীতধর্মী স্বভাব ও অভিজ্ঞতার নিরিখে। যে চেনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আর এর মধ্য দিয়েই উভয়েই বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে। তাই পরবর্তীকালে কালকূট বারবার স্বীকার করেছেন উপন্যাসের

নায়িকা দিল্লীর রঞ্জিতা রিজভি, যাঁর আসল নাম শোভনা সিকদার তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

রঞ্জিতা রিজভির দৃষ্টিভঙ্গির বৃহৎ আয়তনের মধ্যে লেখকের একটা স্বরূপ ধরা পড়েছে। লেখকের সেই স্বরূপ যা কিনা সাহিত্যের দায়বদ্ধতার সঙ্গেই জড়িত। যিনি দায়িত্বশীল সাহিত্যিক তিনি তো শুধু সমাজের অন্তর্গত পাপ-কাম-ভোগের রূপটিকে চিত্রিত করেই তাঁর দায়িত্বের ইতি টানতে পারেন না। তাঁকে এমন কিছু ইঙ্গিত রেখে যেতে হয়, যেখানে অব্যক্ত ভাবের তলায় পাপ থেকে নিষ্পাপে, কাম থেকে প্রেমে এবং ভোগ থেকে ত্যাগের পথে উত্তরণের একটা প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষার পিপাসা জেগে ওঠে। তাই তো হেনা ঘোষের সঙ্গে কথোপকোথন মুহূর্তে কালকূট শোনাতে পারেন— ''ওঁর (রবীন্দ্রনাথের) কথা থাক। এই পর্যন্ত জানি, ওঁর সমস্ত কিছুর মধ্যেই, শেষ কথা শুদ্ধি। জীবনের শুদ্ধি।''[১৯০]

আর সেই 'জীবনশুদ্ধি'-কে আয়ত্ত করাই হলো সাহিত্যিকের রচনার বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে রঞ্জিতা রিজভি কালকূটকে তার অনুভূতির সুগভীর থেকে উপলব্ধি করেন। লেখকের সামনে দাঁড়ালে যেন সমস্ত পাপবোধ কোথায় ভেসে যায়। রঞ্জিতা রিজভি যেন তার বেদনার নিরিখ থেকে লেখককে অনুভব করেছেন আরও গভীর স্তর থেকে। যা কিনা লেখক কালকূটের পরিচয়ের এক অপূর্ব প্রতিবেদন। রিজভির কথায়—

> ''... এই মুহূর্তে ওঁর কিছু লেখার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তাতে আমার কী মনে হচ্ছে জানো? লেখাগুলো যেন অনেকটা অ্যাকোরিয়ামের জলে রঙিন মাছের মতো, আমাদের সামনে খেলা করছে, আর সেই অ্যাকোরিয়ামের আড়াল দিয়ে, মিটিমিটি হেসে লেখক পালিয়ে যাচ্ছে। উনি মনে করেছেন, ওঁকে ধরা যাবে না। ওঁকে ধরতে হবে, ওঁকে আমি দেখে ফেলেছি।''[১৯১]

এককথায় এই মন্তব্যকে বলা চলে রঞ্জিতা রিজভির বয়ানের অন্তরালে কালকূটের আত্মসমীক্ষা। যে বিতর্কিত সত্তা একটা নিয়মকেন্দ্রিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করে, তাঁর সম্পর্কেও আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। কিন্তু এই সত্তাটিই সংসারের সব পরিধিকে পেরিয়ে একটা অনন্ত স্বাধীনতা চেয়েছিল। যে স্বাধীনতার চারপাশে সৃষ্টির উত্তেজনায়, নিজেকে পূর্ণ প্রকাশের মাহাত্ম্যে মেলে ধরবে। এরূপ সত্তা তাঁর স্বয়ংরূপের সমীক্ষা, যখন শ্রীমতি রিজভির ভাষায়, অভিনব আঙ্গিকে লাভ করেন, তখন নিজের জীবনের ছায়া দিয়ে আরেকটি স্বাধীন

সত্তার নির্মাণ করেন, যে সত্তার নাম, রঞ্জিতা রিজভি। এঁরা দু'জনেই যেন অ্যাকোরিয়ামের রঙীন মাছের মতো অধরা, আর তাঁদের স্বাধীনতাটি, পাশ দিয়ে মিটি মিটি হেসে পালিয়ে বেড়ানো সত্তা। কিন্তু লেখক সারাজীবন স্বাধীনতা চাইলেও; পরাধীন হয়েই থাকতে হয়েছে। লেখকের ভাষায়—

> ''...সংসারের কাছে আমি মাত্র একটি স্বাধীনতা চেয়েছি। সে কথাটা সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো দিন বলতে হয়নি। নিজেকে নিজে বলেছি, যেন আপনাতে আপনি হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এ-কথাও জানি, আমার জগৎ-সংসারের চারপাশে, আমি কোনো উদ্ভট খেলার স্বাধীনতা নিয়ে চলতে পারি না। সেখানে আমি দেশের মধ্যে এক। ... কিন্তু রঞ্জিতা রিজভি? ... অস্বীকার করতে পারছি না, কিছুক্ষণ আগে দেখা, একটি অগ্নিশ্বরী মেয়ে, সহসা যেন আমার কোথায় একটা কী বিঁধিয়ে দিয়েছে। আমরা লোক বলতে যাদের বুঝি তাদের কাছে সেই বিঁধিয়ে দেওয়াটা কী! প্রেম? তর্কে যাবো না। কেবল বলতে ইচ্ছা করে পথ দেখাও, পথ দেখাও। আমার অনুভূতির এই একমাত্র কথা। শান্তি দাও আমাদের সবাইকে।''[১৯২]

অবশ্য লেখকের স্বাধীনতার পথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সংস্কারের বেড়াজাল বা নৈতিকতার বিধি নিষেধ। তাই লেখক যে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন তা আর হয়ে ওঠে নি। তবে সেই স্বাধীনতারই একটি অসংস্কৃত রূপ তিনি দেখতে পেয়েছেন রঞ্জিতা রিজভির জীবনে। তাই লেখক মনের নিবিড় অন্তঃস্থল থেকে অপরূপ সৌন্দর্যে রঞ্জিতাকে নির্ম্মাণ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। জীবন মন্থনের দ্বারা উত্থিত বিষ ও অমৃতের সংমিশ্রণে গঠিত চরিত্রকে লেখক হাজির করেন 'অমৃত বিষের পাত্রে'র ডালিতে। একটি দৈনিক পত্রিকার 'রবিবাসর' এ লেখকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল; সেখান, থেকে জানা যায় যে 'অমৃত বিষের পাত্রে'র নায়িকা রঞ্জিতা রিজভির বাস্তবে নাম হলো শোভনা বোটানি। দিল্লীতে বসবাস। সিন্ধুপ্রদেশের মেয়ে, দীর্ঘদেহিনী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিয়ের পর উনি সিদ্দিকী হয়ে যান। সমরেশের যে সব লেখা হিন্দীতে অনুদিত হয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল। পরে একসময় দু'জনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। তবু একদিন খেলা সাঙ্গ

হয়, মিলন-খেলা ভাঙে, সমরেশ আপন বৃত্তে আবার স্থিতধী হন। অবশ্য দিল্লী থেকে ফেরার পর কিছুদিন পত্রলাপ চলেছিল, তবে আর তেমন যোগাযোগ হয় নি। হঠাৎই একসময় মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায়। বোম্বের জুহু বীচে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রচণ্ড উন্মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় সমুদ্র তরঙ্গে ভেসে যান। 'অমৃত বিষের পাত্রে'র শরীরী প্রতিমা রঞ্জিতা রিজভি যদিও লেখকের সৃষ্ট একটি চরিত্রমাত্র, তবুও এই চরিত্রের অন্তরালে লেখকের সঙ্গে এক বাস্তব নারী চরিত্রের সান্নিধ্য ঘটেছিলো, দিল্লীতে ভ্রমণকালীন সময়ের একটি আংশিক জীবন কথা প্রকাশিত হলে, লেখকের সত্য স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পাঠকদলও এই তথ্য সম্বন্ধে জানতে পারেন।

তুষার সিংহের পদতলে : (১৯৭৬)

লেখকের এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে শারদীয় সংখ্যা, 'দেশ' পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ' থেকে ১ বৈশাখ ১৩৮৩ সালে। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে ছিল— 'নাম তাঁর যাই হোক কুন্দনন্দিনী প্রীতিনিলয়াষু।' এবারের ভ্রমণ যাত্রায় কালকূট এসেছেন উত্তরবঙ্গের মনোরম শৈল-শহর দার্জিলিংয়ে, কলকাতার এক বিশিষ্ট প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে, 'আরব সাগরের জল লোনা' গ্রন্থটি লেখার তাগিদে। যদিও এই শৈল শহরে লেখকের পদার্পণ ঘটেছে বহুবার। এবং পূর্বের স্মৃতিগুলির সাথে রয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা। যার মধ্যে একটি হল রোমান্স ও বেদনায় গড়া পাহাড়ী কন্যা 'পার্বতী'। এবারের যাত্রাতেও সেই পাহাড়ী কন্যা 'পাবর্তী' লেখকের চোখে ধরা দিয়েছে। যে পাহাড়ী কন্যার রূপের মধ্যে আছে পুরুষ সম্মোহনের রসদ, আর আছে অফুরন্ত প্রাণের জোর। কিন্তু লেখক পরে জেনেছিলেন যে অভাগী পাবর্তী কলকাতার এক অভিজাত দম্পতির স্বেচ্ছাচারিতার বলি হয়েছিল। যে অভিজাত পুরুষটি তার বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তানের জনক হতে পারেনি, কয়েক মাসের মধ্যেই তার পিতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল পাহাড়ী কন্যাটির গর্ভে। একদিকে যখন পুরুষটির আত্মপরিচয়ের দর্পিত উপলব্ধি ঘটেছিল, অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দাম্পত্য জীবনের শেষ ফয়সালাটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাহাড়ী মেয়ের সন্তানের পিতৃত্বর দায় এড়াবার জন্য অভিজাতদের অগতির গতি টাকার দারস্থ হতে হয়েছিল। আর তাতেই সমস্যাও মিটেছিল। কিন্তু পাবর্তী তার মাতৃত্বকে এড়িয়ে

যেতে পারেনি তাই তাকে সমাজচ্যুত হয়ে, পরিবার থেকে দূরে বস্তিতে মারোয়াড়ির দোকানের পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়ে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে নিতে হয়। এই ব্যাকুল, ব্যথিত জীবন লেখকের চোখেও ব্যথার রেখা এঁকে দেয়। আবার সাক্ষাতে, পার্বতীর সহজাত নিবিড় সান্নিধ্য ও মেলামেশার অন্তরঙ্গতাতে লেখক অস্বস্তিবোধ করলেও তার সরলতায় সব মেনে নেন। সম্ভবত আর্তের সান্ত্বনা ও ত্রাণের খোঁজে ছোটা লেখক, মমত্বের ক্ষমায় ও সমবেদনায় পাবর্তীর প্রতি সকরুণ হয়ে ওঠেন।

দার্জিলিং-এ স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে পার্বতীর প্রতি নিবিড় মমত্ব, জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের কটেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আতিথ্য ও আশা বৌদির হাতের রান্না সবকিছুর পাঠ চুকিয়ে, হঠাৎ দেখা পূর্বপরিচিত দওবাবুর সঙ্গে তিনি কালিম্পঙে বেড়াতে চলে আসেন। সঙ্গে রয়েছে পরিবারের সদস্যও। স্ত্রী ও দুই কন্যা। চাকরি সূত্রেই দওরা দার্জিলিং-এ বসবাস করেন। আর সেই অফিসের কাজ নিয়েই লেখক ও পরিবারকে সঙ্গী করে কালিম্পঙে ছুটে আসা। দত্তবাবুর অফিসের অস্থায়ী আয়কর ক্যাম্প বসে কালিম্পং-এ। একদিন সেই কালিম্পং-এর ক্যাম্পেই দত্তবাবু লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এক ফৌজী অফিসার মিঃ ঘোষাল ও তাঁর বোন শ্রীমতি কুন্দনন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের। যে কুন্দনন্দিনী এককথায় হলেন পরমাসুন্দরী, শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা ও মধুরভাষিণী। মেজর ঘোষাল তাঁর বোনকে নিয়ে শিলিগুড়িতে ফেরার পথে পূর্ব পরিচিত আয়কর অফিসার দত্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লেখকের সঙ্গেও পরিচয়ের সূত্রপাতে তাঁদের আলাপ জমে ওঠে। প্রাথমিক আলাপ শেষে ঠিক হয় শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে লেখকও তাঁদের সঙ্গী হবেন। তারপর কুন্দনন্দিনীকে তাঁর স্বামী মিঃ বরেন মুখার্জীর কাছে পৌঁছে দিয়ে মেজর ও লেখক কালিম্পং-এ ফেরৎ আসবেন। যাত্রা পথে লেখক জানতে পারেন কুন্দনন্দিনী তাঁর লিখিত চার-পাঁচটি গ্রন্থ পড়েছেন এবং সেই সুবাদে লেখকের সান্নিধ্যে তিনি বিশেষ রকমের উৎসাহী। কথার ফাঁকে কুন্দনন্দিনী একবার এ-কথাও বলেন—

> ''...আপনার প্রথম বইয়ের নায়িকা শ্যামাকে ছাড়া, কোনো নায়িকাকেই আমার পছন্দ হয়নি।'' লেখক অবিশ্যি জানান যে—''যদি অভয় দেন তাহলে বলি, আমি নিজের ইচ্ছেয় কারোকে নায়িকা করিনি। চরিত্ররা তাদের নিজেদের মতোই এসেছেন গিয়েছেন।''
> উত্তরে কুন্দনন্দিনী বলেন—''যেমন এখন আমি কুন্দনন্দিনী।...

এসময়ের ঘটনা যদি আপনি লেখেন, নায়িকা হবার অধিকার আমার
নিশ্চয়ই আছে?"
লেখক জানান—'একশো ভাগ।"[১৯৩]

কুন্দনন্দিনীর স্বামী মিঃ মুখার্জী হলেন কলকাতার এক প্রথিতযশা কোম্পানীর উচ্চস্তরের চাকুরে, গ্রেট জেনারেল ম্যানেজার অফ্ এ গ্রেট ইণ্ডো-ফরেন কোম্পানী। সেই মিঃ মুখার্জী এসেছেন শিলিগুড়িতে তাঁদেরই কোম্পানীর একটি সাজানো গেষ্ট হাউসে, উদ্দেশ্য হল স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় গমন। কিন্তু লেখক শিলিগুড়ি যাত্রাপথে যুবতী বধূ কুন্দনন্দিনীর কথাবার্তা ও আকণ্ঠ মদ্যপানে পেলেন এক অন্যরকম ঈঙ্গিত। ওপরের সুখের ছলনায় ভর করে আকণ্ঠ মদ্যপানে আনন্দ পায়, যে আনন্দের তলা দিয়ে অশ্রু বহে। কুন্দনন্দিনীকে তাই নিঃশ্বাস ফেলে বলতে শোনা যায়—''আঁস্তাকুড়টা আপনার থেকে আমি কম চিনি না। আমিও সেখানকার মানুষ। আপনার থেকে বেশি। ... আপনার আঁস্তাকুড়ের চেহারাটা কেমন জানি না। আমারটা দুর্গন্ধে ভরা।"[১৯৪] একথায় লেখকের মনও ব্যথায় দীর্ঘনিঃশ্বাসে টনটনিয়ে ওঠে। শিক্ষিতা রুচিসম্পন্ন এক পরিচিতার মধ্যে তিনি দেখতে পান এক শিশুসুলভ আচরণের আবেশ। যে শিশু লজ্জা ভুলে গিয়ে আকণ্ঠ মদ্যপানে রত। ভ্রাতা ও ভগ্নীর সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যের আমেজ। ভগ্নীর প্রতি মেজরের স্নেহের টান ধরা পড়েছে ইশারায় ইঙ্গিতে, মুচকি হাসির অর্থবহ লক্ষণে। শান্তিহীন স্বাধীনতার জীবনভোগী কুন্দনন্দিনীকে দেখে লেখকের মনে বিস্ময় জাগে। সে তার জীবনে কোনো শর্ত মানতে নারাজ। কুন্দনন্দিনীর কোনো কোনো আচরণ আর কথায় মনে হয়েছে, কোথায় যেন তাঁর বুকের একটা তার অতি বন্ধনে টান হয়ে আছে। সেখানে স্পর্শ লাগলেই বেজে উঠছে তীব্র ঝংকারে। তখন তাঁকে দেখে একদিকে যেমন বিদ্রোহিনী মনে হয় অন্যদিকে অপরিণত বালিকার মতো লাগে। সুন্দরীর সব লক্ষণ দেহে ধরেও, ঘর ছাড়া এক নারী যেন সুখের সন্ধানে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। তাই আকণ্ঠ মদ্যপানে ভুলতে চেষ্টা করছে নিজের বেদনার বাস্তবকে। এ-হেন নারী চরিত্রের সাক্ষাতে লেখকের বেদনার পুরোনস্মৃতি মোচড় দিয়ে ওঠে। লেখক জানান—

''... এ রমণী আমার সদ্য পরিচিতা। কিছুই তাঁর জানি না। তবু তাঁর
এই সকল রমণীয়তার মধ্যে, কোথায় যেন বেসুর বাজছে। আমাকে
মনে করিয়ে দিচ্ছে, দিল্লির রঞ্জিতা রিজ্‌ভির কথা। আর একজন

বোম্বাইগামী রেলগাড়ির কামরায়, জেসমিন নামে এক মহিলা। দৈবক্রমে তাঁরা দু'জনেই মুসলিম। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি সিন্ধি মেয়ে, ধর্মান্তরিতা ছিলেন। দু'জনের আজ কেউ বেঁচে নেই। জেসমিন আত্মহত্যা করেছিলেন সেই রেলগাড়ির নিচে। রঞ্জিতা রিজ্‌ভি ওঁর সকল জ্বালা নিয়ে বোম্বের আরব সাগরের জলে।"[১৯৫]

কুন্দনন্দিনীও যেন সেই অনুরূপ জ্বালার শরিক। লেখকের কাহিনিতে ঘটনার মোড় ঘুরে যায়, শিলিগুড়িতে পৌঁচ্ছে জানা গেল কুন্দনন্দিনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজি নন। তাঁর নির্ধারিত দার্জিলিং মেলের টিকিট ছিঁড়ে কমোডে ফেলে দিয়েছেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি দাদা ও লেখকের সঙ্গে গ্যাংটকে দাদার আবাসে রওনা দেন। যদিও কুন্দনন্দিনীর স্বামী এরূপ আচরণে তেমন বিচলিত নন, তবে বোঝা যায় কুন্দনন্দিনীর মেজাজ মর্জি এবং স্বাধীনতার বিলাসকে যেমন পছন্দ করেন না, তেমনি আবার সমালোচনাও করেন না। ফলে আবার সেই তিনজনে জীপে করে পূর্ব নির্ধারিত গন্তব্যে ফিরে আসতে হয়। সেখান থেকে মেজর ঘোষালের আমন্ত্রণে দত্ত পরিবারবর্গকে বিদায় জানিয়ে লেখক তুষারসিংহের পদতলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। পথে কর্ণেল সিপ্‌পি ও তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা সিপ্‌পিও যোগ দিলেন। সেই সুযোগে সিকিম-গ্যাংটক বেড়িয়ে নিতে চান তাঁরা। এরই মধ্যে লেখক মেজরের কাছ থেকে জেনেছেন যে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বরেনের বিবাহ বন্ধন হলেও মনের কোনো মিল হয়নি বরং তাদের মতানৈক্য জীবনের সুন্দর রূপটিকে হতাশা ও গ্লানিতে ভরে দিয়েছে। জগৎ সৃষ্টির মূলে যে নর-নারীর অপূর্ব মিলনাভূতি মিশে রয়েছে তা এই দম্পতির কাছে অধরা রয়ে গেছে। কিন্তু বেদনায় বয়ে গেলেও কুন্দনন্দিনী জীবনের মধ্যে অগ্রজের স্নেহ ও লেখক বন্ধুর সান্নিধ্য এবং আন্তরিকতা লাভ করে, একটা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা আনন্দের আবছা আলোকে আলোকিত হয়েছে। এই সূক্ষ্ম সম্পর্কের অস্পষ্ট আনন্দকে লক্ষ্য করেই লেখক, কুন্দনন্দিনীর জীবনে সাড়া জাগানোর তাগিদে একটি কথা শুনিয়েছেন, যে-কথা, রঞ্জিতা রিজ্‌ভির মনে 'পাপবোধ ভেসে যাওয়া'-র কাজ করেছিল, সেই কথাই ভাষান্তরে প্রকাশ পায় লেখকের মুখে—"...এমন মানব জমিন্ রইলো পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা।"[১৯৬] এই সূত্র ধরে লেখক বোঝাতে চান পরের ক্ষতি করে নিজের স্বাধীনতা খাটানো, অন্যের ক্ষতি না-হোক, নিজের ক্ষতিতে কিছু যায় আসে না এমন দুটি কথা মূল্যহীন ও নিরর্থক। কুন্দনন্দিনীর

এই উক্তি দুটি লেখক মেনে নিতে পারেন না। তাঁর মনে হয়, অবস্থা যেমনই হোক মানুষ সবার থেকে বেশি নিজেকেই ভালোবাসে আর তাই ভালোবাসার পাত্রের কাছ থেকে আঘাত বা অবহেলা তাকে প্রতিপদে ভীষণ কষ্ট দেয়। এই সত্যকে লেখক গভীর জীবন দর্শনের মাধ্যমে অনুভব করেন এবং তা কুন্দনন্দিনীর জীবনে প্রোথিত করার জন্য সচেষ্ট হন। কুন্দনন্দিনী তার স্বামীর দ্বারা মনের খোরাকে অবহেলিত হলেও, কুন্দনন্দিনীর মধ্যেকার রোমান্টিকতাকে লেখক অনুভব করেন। তাই তিনি জীবন ধারার পথে কুন্দনন্দিনীর বেদনায় ব্যথিত হয়ে, অবহেলিত জীবনকে একটা সুস্থতার পথে নিয়ে আসার জন্য ভালোবাসাকে বিস্তার করেন, তাঁর নায়িকা চরিত্রের মধ্যে। প্রেম-ভালোবাসাই যে, মানব-জমিন আবাদের সোনার ফসল তোলার একমাত্র পন্থা। মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করার ব্যাপারে লেখক এখানে অতি কৌশলেই অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সাহিত্যের শিক্ষাকে সূক্ষ্ম ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হতাশার গ্লানিতে যে মানুষ জীবনে বিপথগামী, তার মনুষ্যত্বের আবরণে থাকা গোপন সত্তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলাই মানবিকতা।

কুন্দনন্দিনীর জটিল চরিত্র বিশ্লেষণ ও অপর ক্ষেত্রে পার্বত্য সৌন্দর্যের অনুভব, এই উভয়ের ভারসাম্যে রচিত হয়েছে 'তুষার সিংহের পদতলে' -এর পরিপার্শ্বিকতা। যা কালকূটের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই গ্রন্থে পার্বত্য প্রকৃতির রূপকে কাজে লাগিয়েছেন, কুন্দনন্দিনীর উত্তরণ ঘটানোর জন্য। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অতি নিকট থেকে দেখতে পেয়ে লেখকের মধ্যে যে মহানুভবতার ছোঁয়া লাগে, সেই অনুভবের কথা ভেবে কুন্দনন্দিনীও সেই মহানুভবতার অনুভূতিকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে।

উত্তরে কালকূট জানান—

> ''...তুষার চূড়ার এই বিরাটত্ব আর তার মহিমা আমার কাছে এক অপার রহস্যের মতো মনে হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি কী, আমি জানি না। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওই বিশালত্বের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চাই। অথচ কেমন করে, তা জানি না। খুব আনন্দ পাচ্ছি, তবু কোথায় যেন একটা একটা কী বাজে। আসলে, আমি বোধ হয় ওই পাহাড়কে কেবল পাহাড় ভাবতে পারি না, আরো কিছু। হয়তো কল্পনা, কিন্তু মনকে ধুয়ে দেয়।''[১৯৭]

লেখকের কাছে 'মনকে ধুয়ে' দেওয়ার অর্থ হল, মনের সমস্ত রকমের গ্লানি, কপটতা, ফাঁকি, ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ ভিতরের অন্ধকারকে মুছে দেওয়া। এই প্রসঙ্গ থেকেই কুন্দনন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কালকূট কর্ণেল সিপ্‌পি ও মেজর ঘোষালের সহযোগীতায় যাবতীয় প্রশাসনিক বেড়াজাল ডিঙিয়ে সিকিমের উত্তর সীমান্তে, তিস্তার উৎসে, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে পৌঁছে যান। এবং তুারসিংহকে দেখে অভিভূত হয়ে ওঠেন। লেখকের ভাষায়—

> ''...তৎক্ষণাৎ আমার চোখের সামনে দূরের আকাশ জেগে উঠলো। আবার সেই বিশাল ঠাকুর্দালানের নিচে তুষারের বিশাল উঠোন। এবার অতি নিকটে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। পশ্চিমের পাহাড়ের কোলে বিশাল এক সাদা আর নীল জলের স্রোত, গভীর নিচে ঝরে পড়েছে। বিশাল এক জলপ্রপাত। ... সেই তুষারের শৃঙ্গের দিকে তাকালাম, বিশাল মাথা উঁচু বিগ্রহ সকল। তাদের সর্বাঙ্গ এখন ধূসর। কিন্তু দেখতে দেখতেই একপাশে লালের আভা পড়লো। দ্রুত রঙ বদলাতে লাগলো। সহসা আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠেলো। আমার চোখের সামনে বিশাল এই সিংহমূর্তি পান্না সবুজ কেশর ফোলানো। সামনের দুই পায়ের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের দুই পায়ের ওপর শরীরের ভার। বুকের তলে সুগভীর নীল। পিঙ্গল দুই চোখে এদিকে তাকিয়ে আছেন।''[১৯৮]

কিন্তু তুষার সিংহের দর্পিত সৌন্দর্য কালকূট দু'চোখ ভরে দেখলেও তাঁর মনের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মুখ গভীর মমতায় জেগে ওঠে।

আরব সাগরের জল লোনা : (১৯৭২)

১৯৬২ সালে 'জলসা' পত্রিকায় এই লেখাটি কালকূট ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে লেখাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পরে অবার কিছুটা অংশ ধারাবাহিক আকারে 'সাজঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'সাজঘর' পত্রিকা বেশি দিন টেকেনি। ফলে পুনরায় লেখা বন্ধ হয়। ১৯৭১ সালে লেখক লেখাটি শেষ করার পর

সম্পূর্ণ লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে। গ্রন্থটি লেখক উৎসর্গ করেন শ্রীঋত্বিক ঘটককে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ছিল :

> ''পূর্ণতার স্বাদ! তা কি জীবনে কখনো মেলে? আমার জীবনে তো মেলে নি। মনে করি, নিরন্তর, এই মানব জীবনের স্রোতধারায় কখনো তা মেলে না। তাই মানুষ চলেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, তার বহুতর আশা আকঙ্ক্ষা প্রার্থনা নিয়ে। কথাগুলো মনে এলো এই রচনাটির কথা ভেবে। লিখে যে শেষ করতে পারলাম না, পূর্ণতার থেকে অপূর্ণতাই যেন বেশি রয়ে গেল। আরব সাগরের কূল থেকে নিয়ে আসা আমার বক্ষপুটে আশ্রিত আরো কত মুখ, কত মানুষ, কত বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্রতর ঘটনা, বিচিত্রতম বিস্ময়।
>
> সব কথা বলা হলো না। বাঁধা বুলির মতন সেই কথাটি বলি, পরবর্তী সংস্করণে আরো সংযোজনের ইচ্ছা রইলো। তখনো কি বলতে পারবো, পূর্ণতাকে পেলাম? বোধ হয় না। তাই বলি, এই রচনার বর্তমান রূপে অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণতার একটি ছায়া টানতে চেয়েছি।''[১৯৯]

কালকূট এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে পাঠকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে পরবর্তী সংস্করণে কিছু নতুন ও বিচিত্রের সংযোজন করবেন। কিন্তু কালকূটের জীবনে পূর্ণতার স্বাদ কখনও মেলে নি। নিরন্তর এই মানব জীবনের স্রোতধারায় কখনও তা মেলে না। মানুষ চলেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, তার বহুতর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা নিয়ে। কালকূট তা বোঝেন এবং তাঁর এই উপলব্ধিই তাঁকে এই গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণের উপক্রমণিকায় পুনর্বার লিখিয়ে নেয় সেই একই অপূর্ণতার সাফাই। ফলে স্বভাবতই কালকূটেরও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না।

কালকূট চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার জন্য বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে আরব সাগরের তীরস্থিত বোম্বেতে চলেছেন ট্রেনে করে। তাঁর আপন হাতে গড়া পসরার ডাক এসেছে আরব সাগরের কূল থেকে সেই কারণেই এবারের পথ চলা। তথাপি মনের কোনে

যে কথাটা একটা ছোট কণার মতো পড়ে আছে, সেই-ই সব থেকে বেশি খুশিতে ছলছলিয়ে উঠছে। যাত্রা যে জন্যই হোক আসলে তো পথ চলা সেই নতুন দেশ ও নতুন মানুষের কাছে। যেন মনে হয় সেখানে অপেক্ষা করে আছে অনেক অজানা বিস্ময়। অনেক অচেনা মুখের চেনা হাসি। আর আছে বহু বিচিত্র রূপের ডালি।

এই মুহূর্তে কালকূটের মনে পড়ে যাচ্ছে 'কোথায় পাব তারে'-র মামুদ গাজীর কথা। ঝোলা কাঁধে সে মুরশেদের নাম নিয়ে ফিরেছে, নামেই সব। মুরশেদের নামের মজুর সে। নামেতেই তার ঝোলা ভরে, মনও ভরে। অনেকটা সেই রথ দেখা কলা বেচার মতোই। দর্শনও হচ্ছে, ঝোলাও ভরছে। নামও হচ্ছে, মহাপ্রাণী ঠাণ্ডাও থাকছে। লেখকের নিজেরও যেন মন, ঘরের বাইরে দেশান্তরি হয়ে ফেরে, নতুনের খোঁজে যায়, তাতেই তাঁর ঝোলাতে, মজুরিও জুটে যায়। যেন একের সঙ্গে আরেক বাঁধা। রঙে রঙে মেশানো, আলাদা করে চেনা যায় না। কালকূটের নিজের কথাতে—

> ''চলার নামেই মাতাল। কেন, বুঝতে পারি না। মনে হয়, যুগ-যুগান্ত চলেছি। কার ডাকে, তাকে দেখতে পাইনি, চিনতেও পারিনি। ... শুধু এইটুকু বুঝেছি, সেই ডাকের সঙ্গে, আমি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সন্ন্যাস নিইনি, আমি বৈরাগী না, বিবাগীও না, ঝোলার মধ্যে মজুরি ভরতে চেয়েছি। তথাপি জানি, মজুরির ঝোলায় যদি ফাঁক থেকে যায়, মনের ঝুলিটাকে শূন্য করে নিয়ে ফিরতে পারবো না। চলার হিসাবের অঙ্কে ... সুখ দুঃখ মান অপমান, অনেক আলোয় কালোয় সেই হিসাব ভরা। যত চলা, তত দেখা। সবই নতুন করে দেখা, নতুন আবিষ্কারের মতো। সেই আমার মুরশেদের নাম। আমার নামে কামে এক হোক।''[২০০]

বোম্বেতে যাত্রাকালে ট্রেনের কামরাতে কালকূটের সঙ্গে আলাপ হয় এক গোয়ানিজ পরিবারের। যারা ভারতবর্ষে বহুকাল থেকে কেবল নামে ভিন্ন হয়ে আছে, কিন্তু এই দেশের সাথে মিশিয়ে গেছে রেণু রেণু হয়ে। কবি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির ভাষায়—

''কৃষ্টে আর খৃষ্টে কিছু তফাৎ নাই রে ভাই/শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।''[২০১]

এই পরিবারের প্রধানা কর্ত্রী মিসেস মোনালিসা গোমেজ ধমক-ধামকে যত না বাজেন, তার চেয়ে তাঁর স্নেহশীল অন্তরটি কালকূটের মনে বাঙালি রাশভারী গৃহিণীর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। বড় ছেলে হেনরির স্ত্রী মেরী যেন এক শান্ত শ্রীময়ী মূর্তি ও নাতি বিলও শান্ত প্রকৃতির। বড় ছেলে থাকে কলকাতায়। ছোট ছেলে জোসেফ বম্বেতে। দু'জনেই চাকরি করে। স্বামী গোয়াতে থাকেন। বড় মেয়ে রোজাকে নিয়ে তিনি ছোট ছেলের কাছে বম্বেতেই বেশি সময় কাটান। ছোট মেয়ে লিজা প্রায় শৈশব থেকেই দাদার কাছে কলকাতায় থেকেছে। তবে চাকরি যোগাড় না হওয়ায় এখন সে চলেছে বম্বেতে। দু'দিনের ট্রেন সফরে চঞ্চল চপল স্বভাবের রোজাকে অবশ্য কালকূটের সিগারেটেরই প্রতি ভক্ত বলা যায়, তাছাড়া তার প্রণয়ী রয়েছে বোম্বেতে। অতএব, লিজাই ধীরে ধীরে কালকূটের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এবং দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এবং এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আরব সাগরের কূলে যাওয়ার আগে লবণাক্ত অশ্রুর স্বাদ নিয়ে কালকূট নিজেকে তৈরি করে নেন, আরও কঠোর ব্যথার জন্য। আরব সাগরের উদ্দাম উচ্ছ্বাস, আরও কতখানি লোনা, ওপরের সুখের ক্ষণিক আস্তরণ, গভীরের বেদনাকে কীভাবে জারিত করে নিবিড় ভাবে, তাকেই জানার তাগিদে লিজার ব্যথাকে আত্মসাৎ করে লেখক তাঁর গন্তব্যে পৌঁছান। তখন তাঁর মনে নতুন প্রস্তুতি; নতুন এক উপলব্ধির সৃষ্টি হয় সুখ মানুষকে ছলনা করে। দুঃখ তাকে চিনতে শেখায়।

আরব সাগরের কূলে, বোম্বাই নগরীতে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালকূট এসে ওঠেন, ভারত বিখ্যাত সুরকার সুরঞ্জনের গৃহে। তখন কালকূটের নিরাসক্ত ও উদাসীন জীবনে গোয়ানিজ পরিবারের আর কোনো ভূমিকা থাকে না। আসলে কালকূটের পথের দিশাটা এমনই, বাঁকে বাঁকে সে নানা রূপে সেজে বসে আছে। এই মুহূর্তের পথ চলাতে, যাকে চির পটে আঁকা বলে মনে হচ্ছে, বাঁকে ফিরে সে হারিয়ে যায়। তখন চির পটের ছলনায় অন্য আর কিছু আঁকা হয়ে যায়।

বাংলা ও বোম্বাইয়ের সঙ্গীত জগতের গৌরব, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির উজ্জ্বল নক্ষত্র সুরঞ্জন হলেন কালকূটের বিশেষ বন্ধু। এই সুরঞ্জনই জীবনে একসময় অনেক কষ্ট পেয়েছে। সভা-সমিতিতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি নিজে গান বেঁধে, নিজেই সুর দিয়েছে। পরখ করার দরকার হয়নি, সবাই তারিফ করেছে। সেই স্নেহের মূল্যে, জীবন-ধারণটা ছিল মিটমিটে আলোর মতো। সব থেকে বড় কথা, মিটমিটে আলোটা সুরঞ্জনের সৃষ্টিকে কখনোই

দমিয়ে রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে বম্বের নাম-করা চিত্র-পরিচালক জীবনকৃষ্ণ ডেকে এনে ছবিতে সুরকার করলেন এবং প্রথম ছবিই বিশেষ খ্যাতিতে সুরকার হিসাবে সুরঞ্জনকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সুরঞ্জনের বাড়িতেই কালকূটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আরও অনেক প্রতিভাধর বন্ধু-বান্ধবদের। তাদের মধ্যে রণবীর বা রণো হলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কালকূট প্রায় দিন দশেক সুরঞ্জন নীলার অতিথি হয়ে ছিলেন। এর মধ্যে প্রযোজক-পরিবেশক শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীর চেম্বারে গিয়ে রুপোলি জগতের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। বিখ্যাত সব তারকাদের জীবন সত্যতা তাঁর সামনে ফুটে ওঠে। আরব সাগরের ফেনিলোচ্ছল রঙের যেন আর একটি দিক এই রুপোলি জগত। প্রাণপূর্ণ তৃষ্ণা নিয়ে, এই রুপোলি ছটার অগাধ জলে চুমুক দিলে, তার স্বাদ তিক্ত লবণাক্ত। এত জল তবু যেন তৃষ্ণা মেটে না। এত রূপ, এত রূপা, এত ঝলক, চলক, তবু সুর বাজে হতাশার রাগিনীতে।

চিত্রশিল্প ও নাট্যজগতের এক বিরল ব্যতিক্রম কিংবদন্তী শিল্পী হলেন রণো। তিনি কালকূটের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই গ্রন্থের পটভূমিকায় যুগন্ধর শিল্পী বন্ধু রণোর যে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ, তা একদিকে যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে বেদনায় বয়ে যাওয়া পুরুষ চরিত্রের সত্তায় অনন্য সাধারণ এক দলিল। রণো চরিত্রটি ঋত্বিক ঘটককে স্মরণ করিয়ে দেয়, কালকূট তাঁকেই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে রণোর মতো সংগ্রামী শিল্পীর অন্তরে বাহিরে, তীব্র জ্বালাকেই কালকূট বারবার অনুভব করেছেন। বুঝেছেন যে একজন প্রতিভাশালী শিল্পীর পক্ষে নিছক ফরমায়েসি ছবি বানানোর প্রস্তাব কতোটা আপত্তিকর এবং কষ্টকর বিষয়। কালকূট রণোকে ভালোবেসেছেন এক অসাধারণ আবেগে। রণোর অসংযমী জীবনের আলেখ্যে নিয়মিত আকণ্ঠ মদ্যপান শিল্পীর বাস্তব দুঃখকে ভোলাবার জন্য অনুপান হয়ে দেখা দিয়েছে। এ যেন কলঙ্কিত সমাজের শরিক হিসাবে এক ব্যথিত শিল্পীসত্তার সঙ্কটের তাড়নায় নিঃশেষ করে দেওয়ার নীরব বিদ্রোহ। রণোর সমীক্ষায় কালকূটের একটি উক্তি—

‘‘... যে ঘাড়ে চেপেছে, তাকে তুমি ভূত বলবে কী না জানি না। আমি বলি ওটা সৃষ্টির ব্যথা। একটা আর্তি। একটা ঘোর। সে যখন বেছে শুনে, উপযুক্ত ঘাড়টিতে চাপে, তখন আর তার মুক্তি নেই। এই রণোও তাই। রণো ছুটছে।...’’[২০২]

সৃষ্টির ব্যথা বয়ে যে রণো ছুটছে, তার সৃষ্টিকে মদত দেওয়ার মতো চিন্তা চেতনার শিল্প আজ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি থেকে লোপ পেয়ে গেছে। সেই চেনার শিক্ষায়, বোম্বাইয়ে তথাকথিত গ্ল্যামার সর্বস্ব ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির রণোর প্রতি, কাজ না দিয়ে শুধু অর্থ দেওয়ার করুণাকে রণো মেনে নিতে পারে না। সে বেদনায় রিক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—

> ''...জানলি লেখক, আর এখানে থাকতে পারছি না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম।... তিলে তিলে মরে যাচ্ছি। ... আর আজ তোকে এই জুহু সী-বীজে বসে বলে যাচ্ছি, ওই মিস্টার চ্যাটার্জী কিংবা তোর ওই বিগ প্রড ডিস্ট্রিবিউটর একদিন আমার কাছে ছুটে যাবে।''[২০৩]

শিল্পী রণোর সঙ্গে কালকূটের এই কথোপকথন যে কত সত্যি হয়ে ভাবীকালের নিরিখে ফিরে এসেছিল, সে বিষয়ে লেখক জানাচ্ছেন যে—

> ''জুহু সী বীচের এ কথা আজ যখন লিখছি, তখন কি আমার বলা উচিত হবে, বেশ কিছু বছর আগে, রণো যখন সেই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিল, তা ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ওর প্রতিভা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ না, বিশ্বের দরবারে ওর প্রতিভা আজ স্বীকৃতি পেয়েছে।''[২০৪]

বোম্বাইতে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রাণীর মতো মেয়ে বা কৃষ্ণের মতো ছেলের সঙ্গে যারা রুপোলি পর্দায় আর্বিভাব হওয়ার লোভে কলকাতা থেকে বোম্বেতে পা রেখেছে ব্যক্তি জীবনে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের শিকার হয়ে। কালকূটের কাছে এ শুধু এক চরিত্র বা এক ঘটনা না। বোম্বাই নগরীতে থাকাকালীন রাণী, কৃষ্ণ, গুরুচরণ, মারাঠী তরুণী, তারকা রানা ও অভিনেতা রতনকুমারের মতো এমন আরো চরিত্র মিলেছে যারা রুপোলি পর্দার ছায়া হতে পারেনি কিন্তু হতে চেয়েছিল। রণো বা সুরঞ্জনের মতো মানুষের আশ্রয় সবার ভাগ্যে জোটে না, অতএব অন্যদের স্থান হলো সস্তা নোংরা হোটেল অথবা দরিদ্র বস্তি কিংবা পেভমেন্টে। যেখানে তারা নিজেদের ছায়াকে আর চেয়েও দেখে না। কারণ রুপোলি পর্দার স্বাদটা ওরা এক রকম পেয়েছে বা জানে। ওরা জানে এই নগরীর প্রহরিণী হাসি ফেনিলোচ্ছল সাগরের রুপোলি জলের স্বাদ যে লবণাক্ত। হয়তো অনেকেই জানে, পর্দার রূপকুমার থেকে ছবির গড়নদার পর্যন্ত। কালকূটের ভাষায়,

''মধ্যরাত্রির সুরার প্রলাপে শুনেছি, শেষ রাত্রের নির্লজ্জ নগ্নতায়, চোখের জলের দুরন্ত কাঁদনে দেখেছি। যারা পেরেছে, তাদের অন্ধকার আর আলো কোথায় যেন মেশামিশি করে আছে। শেষ পর্যন্ত, তিক্ত স্বাদের বিষে, আকণ্ঠ ভরেছে সকলের। কারোরটা হাসি আর ঐশ্বর্যে ঢাকা পড়ে আছে। কারোরটা লুকিয়ে আছে, অন্য জীবনের অন্ধকারে।''[২০৫]

আরব সাগরের কূলে আসার পথে ট্রেনে যে গোয়ানিজ পরিবারের কন্যা লিজার সঙ্গে কালকূটের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়েছিল, সেই লিজার সঙ্গে কাহিনির সমাপ্তিতে পুনশ্চ যোগাযোগে পরস্পরের বন্ধুত্বের দাবীটি স্থায়ী হয়ে ওঠে। বাঙালি, রাজনীতি-বিলাসী হিমাদ্রির সঙ্গে লিজার মিলন না হলেও লিজা তার সাময়িক বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর সেই মুক্তির স্বাদ কালকূটের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্বের দাবীর মধ্য দিয়ে মাধুর্যে মিশেছে। সেই কাহিনি কালকূট শোনাচ্ছেন তাঁর ভাষায়, লিজার বয়ানে—

''যেখানেই থাক, আমাকে ত্যাগ কোরো না। আমি জানি, তোমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না, আমি এমন উদ্ভট চিন্তাও করি না, চাইও না। যোগাযোগ রেখো। যদি কখনো ছুটে যাই, যেন দেখা পাই।''[২০৬]

যথাসময়ে লিজার দুঃখকে কালকূট বুকে নিয়ে আরবসাগরের কূল থেকে প্রথম যাত্রাপর্বের শেষে, অশ্রুর লোনা স্বাদ আর সাগরের জলের লবণাক্ততা, স্টেশনে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

মিটে নাই তৃষ্ণা : (১৯৭৬)

এই রচনাটি 'প্রসাদ' পত্রিকায় দু'বার প্রকাশ পায়। প্রথমাংশ আশ্বিন ১৩৮০ সালে (অক্টোবর, ১৯৭৩) এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে। বইটির উৎসর্গ পত্রে ছিল—'শ্রীসলিল ঘোষ প্রীতিভাজনেষু'।

এই গ্রন্থে দেখা যায় কালকূট পুনশ্চ মন চলো ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন আরব সাগরের তীরে বোম্বাই নগরীতে। যাত্রা পথে কোনো এক স্টেশনে গাড়ি থামলে ঐ প্রথম শ্রেণির কামরায় তিনজন যাত্রী ওঠে। দু'জন পুরুষ ইয়াকুব ও হাফিজ, আর একজন রমণী নাম জেসমিন, জেসমিন ইয়াকুবের স্ত্রী এবং হাফিজ হলো জেসমিনের মাসতুতো ভাই। এই তিন

সহযাত্রীর সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় সূত্রে ও আন্তরিকতার মাধ্যমে কালকূট বোঝেন যে— জেসমিনের রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে কিন্তু সুখ বা শান্তি কোনওটাই তার জীবনে নেই। বিয়ে হয়েছে ইয়াকুবের সঙ্গে। এমনকি একটি কন্যা সন্তানেরও জননী হয়েছে সে। কিন্তু মনের অজান্তে হাফিজ ও জেসমিনের মধ্যে গভীর প্রেম জন্ম নেয়। অন্যদিকে জেসমিনের সঙ্গে সম্পর্কের ফেরে হাফিজের পার্সিয়ান স্ত্রী আর একটি সন্তান ফ্রান্সে চলে গেছে। ইয়াকুবকে তালাক দেওয়ার প্রসঙ্গে জেসমিনের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে। ফলে এই ত্রিকোণ সম্পর্কের ঘূর্ণিতে এক দুঃসহ যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে থাকে জেসমিনের জীবন। জেসমিন নিজের প্রেমের ভাগ্য সম্পর্কে উর্দুতে একটি কবিতার লাইন আওড়েছে। যার অর্থ এইরকম—

''তোমরা তার মদিরাক্ষিতে কেবল হাসির ঝিলিক দেখেছ, চোখের জল দেখনি। তোমরা তাকে পেয়ালা ভরে পান করতে দেখেছ, তবু তার ছাতি ফেটে যাওয়া দেখনি।''[২০৭]

এই কবিতার লাইনটি শ্রুতিমধুর হওয়ার পাশাপাশি জড়িয়ে আছে জেসমিনের জীবন সত্যতা। এই একই যন্ত্রণার অংশীদার ইয়াকুব এবং হাফিজও, তাই তারা ফিশ খেলা ও মদ্যপানে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চায় সাময়িকভাবে।

কাহিনি বিন্যাসের ধারাপথে আমরা দেখতে পাই উক্ত তিন চরিত্রের ব্যথা-বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে কালকূট প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁর সহযাত্রীদের কবিতার ছন্দে বাঙলায় অনুদিত একটি ছোট জাপানী কবিতা শোনান। বলা চলে এই প্রতিক্রিয়াটি তাঁর জীবন চিত্রের একটি অন্যতম সত্য।—

''কী করি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই।
ভাবিলাম বনে গিয়া
জুড়াব তাপিত হিয়া।
শুনি সেথা অর্ধরাত্রে
কাঁদে মৃগী কম্পগাত্রে।''[২০৮]

কালকূটের শোনানো এই কবিতার মধ্যে যেন সকলেই নিজের জীবনকে খুঁজে পায়। ইয়াকুব, হাফেজ, জেসমিন সকলেই। হয়তো বা লেখক নিজেও। যা জেসমিনের জবানীতে ফুটে ওঠে—

''কবিতা যারই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কবি যখন লিখেছিলেন, সেই মুহূর্তে সেটি কবির অভিজ্ঞতা। পাঠকের যখন তা কোনো কারণে মনে পড়ে যায়, তখন তা পাঠকেরই অভিজ্ঞতা।''[২০৯]

লেখকের শোনানো কবিতাটি ইয়াকুবের মনে এক গভীর ছায়াপাত ফেলে। সে কবিতাটি লিখেও নেয়। তার মনে হয় যে মৃত্যুই একমাত্র, মানুষের সব যন্ত্রণার নিরসন ঘটিয়ে শান্তি দিতে পারে। কিন্তু লেখকের মতে—

> ''মৃত্যু নয়। যদি মৃত্যুই সেই শান্তি হয় তবে সেই শান্তি ভোগ করবে
> কে? মৃত্যু শীতল শূন্য অন্ধকার, তারপর আর কিছু থাকে না।...
> দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যেও একটা শান্তি আছে।... আমার মনে হয়,
> হরিণীর কান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়েই জীবনকে বুঝে নিতে হবে।
> অবিমিশ্র শান্তি বলে বোধ হয় কিছু নেই।''[২১০]

—এটাই হলো ট্র্যাজেডির প্রকৃত রূপ। ট্র্যাজেডির সাহিত্য সংজ্ঞামুখীন যন্ত্রণা এবং মৃত্যু যন্ত্রণার তারতম্যের আলোকে প্রাসঙ্গিক ভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি 'বলাকা' বিধৃত 'তাজমহল' কবিতার অংশ। কবিতাংশটি হল— 'রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে রহে না যে বিলাপের অবকাশ...' কালকূটের কথায় ইয়াকুব সাহেব যে রূপহীন মৃত্যুর কথা বলেন, তার মধ্যে মৃত্যুহীনতার অপরূপ সাজ দেখতে পাই না। 'মরণ' রূপহীন হলেও মৃত্যুহীন বা অমর 'নাম' তার সৃষ্টির স্মৃতির মূল ধন নিয়ে কালজয়ী হয়। এখানে আমরা বলতে পারি অনিবার্য ভবিতব্যের নিয়মে কালকূট একদিন জীবনের রূপহীনের আঙিনায় পৌঁছলেও, তাঁর সাহিত্য সম্ভার 'মৃত্যুহীনতার অপরূপ সাজে' চিরদিন সুশোভিত থাকবে। আর এই কারণেই তিনি হলেন জীবনে-মরণে কালজয়ী কালকূট।

লেখক এই কাহিনি লিখতে বসে অভাবনীয় ভ্রমণের সেই ঘটনাটি মনে করে নিজেও কম অবাক হননি। আসলে ট্রেনের কামরায় ত্রয়ীর আসরটাই ছিল এক মর্মন্তুদ ব্যথা ও যন্ত্রণার নাটক। অথচ বাইরের চেহারাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। ইয়াকুব সাহেব শেষ বারের মতো তাঁর দেশের বাড়ির থেকে জেসমিনকে ঘুরিয়ে রওনা দিয়েছেন বম্বের উদ্দেশ্যে। কারণ বম্বে গিয়ে শুধু একটিই কাজ, জেসমিনকে তালাক দেওয়া। উদ্দেশ্য, জেসমিন ও হাফেজ সুখী হোক। ইয়াকুব ভীরু নন, জেসমিনকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে

ত্রিকোণ নাটকের অপর দুই কুশীলব হাফেজ ও জেসমিন কেউই নিজেদের সম্পর্ক লুকিয়ে ইয়াকুবকে ঠকাতে চায়নি। হাফেজ আর জেসমিনও বুঝতে পারেনি যে, ওরা দু'জনে এত কাছাকাছি ক্ষেত্রে চলে আসছে, যখন পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারে না। অতএব উভয়পক্ষের সম্মতিতেই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্ম প্রতারণা সহ্য করতে না পেরে জেসমিন নিজের অতৃপ্তিকে হাফেজ ও ইয়াকুবের মধ্যে সংক্রামিত করে এবং কালকূটকেও বেদনার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করে, একটা স্টেশনে থেমে থাকা তাদের বোম্বাই এক্সপ্রেস থেকে নেমে আত্মনাশের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। বলা যেতে পারে জেসমিনের এই আকস্মিক বা পূর্বপরিকল্পিত মৃত্যু ইয়াকুব ও হাফেজকে নিঃসীম ট্র্যাজিক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। যে স্টেশনে এই ঘটনা ঘটেছে, তার পরবর্তী স্টেশনে ইয়াকুব ও হাফেজ আইনের প্রয়োজনে নেমে যান। আর একাকী লেখক সেই প্রথম শ্রেণির কামরাতেই বসে এগিয়ে চলেছেন আরবসাগরের কূলের দিকে। কিন্তু তবুও লেখকের মনে হয়েছে তিনিও রয়ে গেলেন পেছনে, যেখানে রক্তাক্ত জেসমিন এখনো শায়িতা। সেই নীরব একাকিত্বের যাত্রাপথে লেখকের স্মৃতি পটে জেসমিনের চরিত্র ঘিরে যে পর্যায়ে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তার ফলে এই চরিত্রটি অন্য এক স্তরে পর্যবসিত হয়। লেখকের মনে হয় সমস্ত কুশীলবরা তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা সেরে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু মঞ্চ এবং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন দর্শকরূপী লেখক নিজে। তবুও বাধ্য হয়ে এ-কামরাতে বসেই তাঁকে আগামীকাল সকালে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস পৌঁছতে হবে। লেখক স্মৃতিচারণা করে বলেছেন—

> ''কালকূট তার যাত্রার পথে, দুবার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলো। একটা ছিল করাল রোগের গ্রাসে মৃত্যু, যাত্রা ছিল 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। শুধু আমার যাত্রা না, অমৃতের যাত্রা ছিল সেই যাত্রীরও, যার বুকের উৎস থেকে রক্তধারা ছুটে এসেছিল মুখে। অস্বীকার করতে পারবো না, ভয় পেয়েছিলাম। সেকথা তখন ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করিনি। তার মরদেহ যখন কামরা থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পুবের আকাশেও তখন রক্তরেখা। সূর্যোদয়কে মনে হয়েছিল সেই অমৃত সন্ধানীর বুকের রক্ত-মাখা।... অমৃতের সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আজকের এই যাত্রায়, মৃত্যুকে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম। মৃত্যু

না আত্মনাশ।...”[২১১]

‘মিটে নাই তৃষ্ণা’-র মধ্যে লেখক আরও একটি গল্প উপহার দিয়েছেন পাঠককে। আরবসাগরের কূলে যাত্রাপথে জেসমিন কালকূটকে বিষণ্ণ করে দিলেও তাঁর বোম্বে শহরের অবস্থান মধুময় করে তুলেছিল বিস্ময়বিমুগ্ধা পাঠিকা ফুলকলি। বোম্বাইতে মূলতঃ পুরন্দর ভট্টাচার্যের আশ্রয়ে কালকূটের থাকার কথা হলেও শেষ পর্যন্ত পাঠিকা ফুলকলি ঘোষের ফ্ল্যাটেই তাঁকে উঠতে হয়। ফুলকলি, কৃষ্ণকলি ও কুন্দকলি এই তিন বোনের আন্তরিকতায় এবং তাদের মায়ের রন্ধননৈপুণ্যে কালকূটের সময় বেশ ভালোই যায়। এই মাধুর্যের সঙ্গে উষ্ণতার সংযোজন ঘটায় পুরন্দর ফুলকলির সম্মিলিত সান্নিধ্য, পানভোজন ও সংগীত সুধা পরিবেশনের রমণীয় আয়োজনে কালকূট অজন্তা-ইলোরা ভ্রমণ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা দিন সানন্দে কাটিয়ে ফিরে এলেন আপন ঘরে। ঔরঙ্গাবাদে অজন্তা-ইলোরা পরিদর্শন করে লেখক মনে করেন—

> ‘‘অজন্তা দর্শন কেবল শিল্পের বিস্ময় না, বিস্ময় সময়ের, যে সময়টাকে কল্পনার অনুভূতি দিয়েও স্পর্শ করা যায় না। ... অধিকার বর্জিত যে মুগ্ধতা, যা প্রকৃতির মতো অমোঘ এবং অনিবার্য তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। ইলোরার অপরূপ ভাস্কর্য, যা অনেকটা অকপটে ধরা দেবার একটা মরীচিকা সৃষ্টি করে রেখেছে অথচ একেবারে অন্ধকারে ফেলে রাখে না, অজন্তার গুহাচিত্র সেই অন্ধকারেই জিজ্ঞাসায় জেগে থাকে...।”[২১২]

সবশেষে বলা চলে কালকূটের এই কালজয়ী রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য এবং নিঃসন্দেহে এগুলি পাঠককে বিচিত্রতার আস্বাদন করায়। জীবনের বিস্ময়, সূক্ষ্ম মনস্তত্ব, এর প্রতি পদক্ষেপে মৃদু ও তীক্ষ্ণ স্বাদ, বৈচিত্র্য এবং মানুষ সম্বন্ধে মমতা—এ সমস্তই হল কালকূটের উদ্ঘাটনের বিষয়। যার মধ্যে তাঁর মূল লক্ষ্য হল জীবনান্বেষণ।

তথ্যসূত্র :

১. কোথায় পাব তারে---কালকূট রচনা সমগ্র---২য় খণ্ড---কালকূট---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৬১২

<u>মেলা ও তীর্থ পরিক্রমা :</u>

২. কালকূট রচনা সমগ্র---৮ম খণ্ড---কালকূট---গ্রন্থ পরিচয়---বিচিত্র---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৭০

৩. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র---১ম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—পৃ. ৬২—২০০৯

৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০১

৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০২

৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯২

৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬০

৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৪

৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২১২

১০.পূর্বোক্ত—পৃ. ২১১-২১২

১১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৬৩

১২. পূর্বোক্ত—পৃ. ২১৭

১৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮২

১৪. পূর্বোক্ত

১৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৪

১৬. পূর্বোক্ত

১৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৭

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৮

২০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫১

২১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫২

২২. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৫

২৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৬

২৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৮

২৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭০

২৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭২-৭৩

২৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ২২৯

২৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ২২২-২২৩

২৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৩৮

৩০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৩৯

৩১. পূর্বোক্ত—পৃ. ২২৭

৩২. পূর্বোক্ত

৩৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৩৫

৩৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৪০

৩৫. খুঁজে ফিরি সেই মানুষে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—১ম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৩৫

৩৬. কোথায় পাব তারে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—২য় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৫৬৮

৩৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭১০

৩৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮৯২

৩৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা—কালকূট রচনা সমগ্র—২য় খণ্ড—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬—চতুর্থ মুদ্রণ—আগস্ট, ১৯৮৮

৪০. কোথায় পাব তারে—কালকূট রচনা সমগ্র—কালকূট—২য় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী— ২০০৯—পৃ. ৫৬৮

৪১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৭৬

৪২. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৬৫-৬৬৬

৪৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৯৬

৪৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৯৯

৪৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৫৯৯

৪৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৯৯

৪৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬১০

৪৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭১৯

৪৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬২৫

৫০. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬২৫-৬২৬

৫১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৩২

৫২. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৮৭

৫৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৮২

৫৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৬৪৮

৫৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭৩৪

৫৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৭৯৬

৫৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮০১

৫৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮০৪

৫৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮০৭

৬০. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮১২-৮১৩

৬১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৮৯২

৬২. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯১৪

৬৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৩১

৬৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৩৪

৬৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৩৭

৬৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৩৯

৬৭. পূর্বোক্ত

৬৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৫১

৬৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৬৬

৭০. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৬৮-৯৬৯

৭১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৭১

৭২. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৭০

৭৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৯৭৮-৯৭৯

৭৪. কোথায় পাব তারে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১০৪৯

৭৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০৫৬

৭৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০৬৯

৭৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০৮৬

৭৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১০৯৯

৭৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১০১

৮০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১১০

৮১. গ্রন্থ পরিচয়—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৮ম খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৮১

৮২. কালকূটের রচনাশৈলী-চ—সরোজ বন্দ্যোপাদ্যায়—কালকূট রচনা সমগ্র—১ম খণ্ড—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত—আগস্ট, ১৯৭৫

৮৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩৬০

৮৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩৮৪

৮৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪০০

৮৬. পণ্যভূমে পুণ্যস্নান—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৭ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩০৩৮

৮৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩০০৭

৮৮. পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৭ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৩৯৫

৮৯. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ন—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—

পৃ. ১৮

৯০. পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র---৮ম খণ্ড---ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৩৯৫-৩৩৯৬

৯১. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩৩৯৮

৯২. পূর্বোক্ত

৯৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩৪৩৪

খ. প্রেক্ষাপট অরণ্য :

৯৪. ভূমিকা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় —কালকূট রচনা সমগ্র—৫ম খণ্ড—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—১৮ই ভাদ্র, ১৩৮৫—পৃ. খ

৯৫. কালকূট সমরেশ—ড. নিতাই বসু—জগদ্ধাত্রী পাবালিশার্স—১লা বৈশাখ, ১৩৯৪—পৃ. ২৭৭

৯৬. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ণ—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ২১৭

৯৭. গ্রন্থ পরিচয়---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র---৮ম খণ্ড---ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৮৩

৯৮. মন চলো বনে---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র---৪র্থ খণ্ড---ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৭৪১

৯৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৫৮

১০০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৬০

১০১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৭৬

১০২. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৯১

১০৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮০৫

১০৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮১১

১০৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮১৫

১০৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮২২

১০৭. বনের সঙ্গে খেলা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৮৩২

১০৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮৩৩

১০৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮৫১

১১০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৮৬৮

১১১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯১৫

১১২. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯১৭

১১৩. প্রেম নামে বন—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৫ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২০০২-২০০৩

১১৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০০৭

১১৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০৪৮

১১৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০৪৪

১১৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০৫৭

১১৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০৭৬

১১৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২০৭৭

১২০. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—দে'জ পাবলিশিং—১৯৬১—পৃ. ২৬৪

<u>গ. পুরানের জগতে মানস ভ্রমণ :</u>

১২১. কালকূটের পুরাণ অন্বেষা—পল্লব সেনগুপ্ত—পল্লীগ্রাম—বৈশাখ, ১৩৯৬—পৃ. ৩

১২২. যুদ্ধের শেষ সেনাপতি—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৭ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৯০৬

১২৩. কালকূট : অন্তহীন অন্বেষণ—স্নেহাশিস ভট্টাচার্য—পত্রলেখা—জানুয়ারী, ২০০৮—পৃ. ৬২

১২৪. শাম্ব—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৯২৮

১২৫. গ্রন্থ পরিচয়—শাম্ব—ভূমিকাংশ (কালকূট, ১ বৈশাখ, ১৩৮৫)—কালকূট রচনা সমগ্র—৮ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৮৪

১২৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ৩৬৮৫

১২৭. কালকূট : কোথায় পাবো তারে—উদিত বসু—'শব্দ'-সাহিত্য পত্রিকা—কালকূট বিশেষ সংখ্যা-বর্ষ-৩য়, সংখ্যা-৩য়—জানুয়ারী, ২০১১—পৃ. ১৯০

১২৮. শাম্ব—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৯২৮

১২৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯৩৪

১৩০. কালকূট : অন্তহীন অন্বেষণ—স্নেহাশিস ভট্টাচার্য—পত্রলেখা—জানুয়ারী, ২০০৮ পৃ. ৬২

১৩১. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ন—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ৯৩

১৩২. শাম্ব—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৯৬০

১৩৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯৬৮

১৩৪. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ন—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ১০৩

১৩৫. শাম্ব—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৯৯৩

১৩৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯৯৪-৯৫

১৩৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯৯৭

১৩৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৯৯৮

১৩৯. কালকূট : মহাকালের সারথি—মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত—পুস্তক বিপণি—এপ্রিল, ২০০১—পৃ. ১৭৩

১৪০. গ্রন্থপরিচয়—কালকূট রচনা সমগ্র—৮ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমি প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৮৮

১৪১. কালকূট : মহাকালের সারথি—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত—মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া—পুস্তক বিপণি—এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ১৭৮-১৭৯

১৪২. প্রাচেতাস—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৬ষ্ঠ খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৬৭০

১৪৩. পূর্বোক্ত

১৪৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৭২

১৪৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৭৬

১৪৬. পূর্বোক্ত

১৪৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৭৭

১৪৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৭৮-২৬৭৯

১৪৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৭৯

১৫০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৮০-২৬৮১

১৫১. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৮১

১৫২. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৮৬

১৫৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৮৬-২৬৮৭

১৫৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৬৯৫

১৫৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭০০-২৭০১

১৫৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭৯২

১৫৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭০৫

১৫৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭১৩

১৫৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭১৪

১৬০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭২০

১৬১. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭২২

১৬২. পূর্বোক্ত

১৬৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৭২৩

১৬৪. কালকূট : মহাকালের সারথি—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত—মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া—পুস্তক

বিপণি—এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ১৭৯

১৬৫. জাতীয় ইতিবৃত্ত ও কালকূট---কালকূট সাহিত্যে সন্ধানে---শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ণ—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ১২৯

১৬৬. অন্তিম প্রণয়---কালকূট---কালকূট রচনা সমগ্র---৭ম খণ্ড---নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩১৮০

১৬৭. পূর্বোক্ত

১৬৮. কালকূট : মহাকালের সারথি—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত—মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া—পুস্তক বিপণি—এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ১৮৩

১৬৯. পৃথা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৬ষ্ঠ খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৮৫৩-২৮৫৪

১৭০. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৫৭

১৭১. পূর্বোক্ত

১৭২. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৭০

১৭৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৭৫

১৭৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৭৭

১৭৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৮০

১৭৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৮৯

১৭৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৮৯১

১৭৮. কালকূট : মহাকালের সারথি—চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত—মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া—পুস্তক বিপণি—এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ১৮৩

১৭৯. উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)—অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্ব ভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ-কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত—হরফ প্রকাশনী—১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০—পৃ. ৭০৯

১৮০. পৃথা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৬ষ্ঠ খণ্ড—নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ২৮৯৪

১৮১. পূর্বোক্ত—পৃ. ২৯০২

গ. স্মৃতিপটে বিচিত্রের উদ্ভাষ :

১৮২. ভূমিকাংশ—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—১৯৭৭

১৮৩. হারায়ে সেই মানুষে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১১৭৭

১৮৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১৮৬

১৮৫. মন মেরামতের আশায়—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১১২৮

১৮৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১২৯

১৮৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১৩২

১৮৮. কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যায়ন—ডিসেম্বর, ১৯৯৫—পৃ. ১৭৪

১৮৯. অমৃত বিষের পাত্রে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৪৩৩

১৯০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৬৮

১৯১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৪৯২

১৯২. পূর্বোক্ত

১৯৩. তুষার সিংহের পদতলে—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৬৬৮

১৯৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৬৮০

১৯৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৬৮৪

১৯৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭০৩

১৯৭. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭০৭

১৯৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৭৩৩

১৯৯. গ্রন্থপরিচয়—আরব সাগরের জল লোনা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৮ম খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ৩৬৮০

২০০. আরব সাগরের জল লোনা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৩য় খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১২০৪

২০১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১১৯৭

২০২. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৮৪

২০৩. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৮৫-১২৯০

২০৪. পূর্বোক্ত—পৃ. ১২৯০

২০৫. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩০৬

২০৬. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৩২০

২০৭. মিটে নাই তৃষ্ণা—কালকূট—কালকূট রচনা সমগ্র—৪র্থ খণ্ড—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত—মৌসুমী প্রকাশনী—২০০৯—পৃ. ১৫৭১

২০৮. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৭২

২০৯. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৭৩

২১০. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৭৫

২১১. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৫৯৩

২১২. পূর্বোক্ত—পৃ. ১৬৪৬